এক যে ছিল সাগর

প্রচেত গুপ্ত

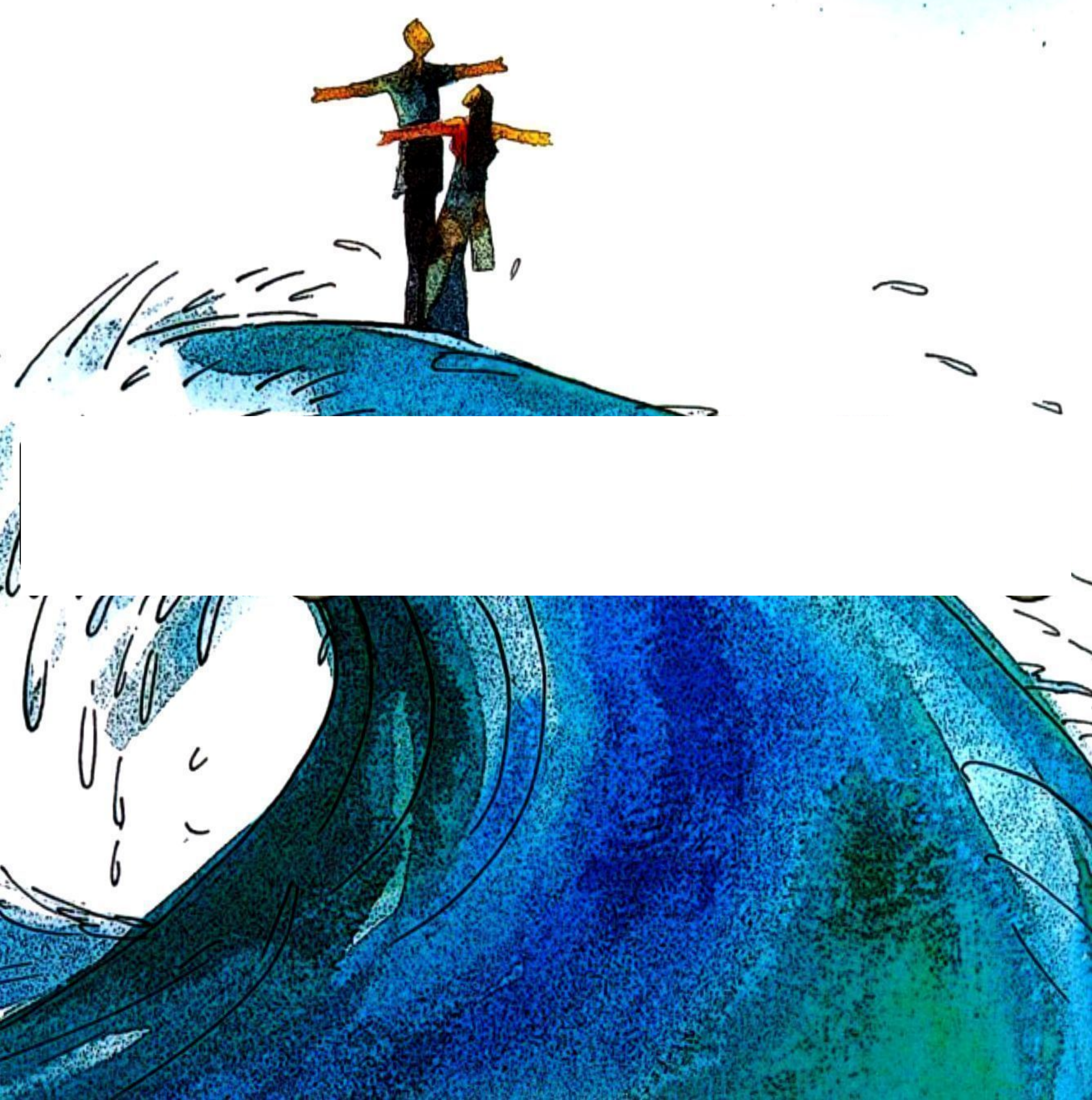

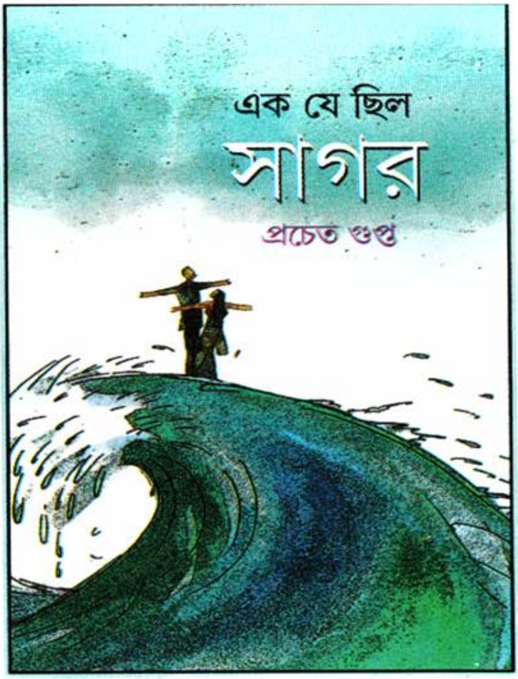

আমার নাম সাগর। আমি একজন অলস, অকর্মণ্য বেকার যুবক। ছোটো একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। সেই ঘরে বেলা পর্যন্ত ঘুমোই। ঘুম ভেঙে গেলেও উঠি না। ঘাপটি ঘুম দিয়ে পড়ে থাকি। ঘাপটি ঘুমের মতো মজা আর কিছুতে নেই। যে কখনও ঘাপটি ঘুম দেয়নি সে এই মজা কী জিনিস জানে না। উচ্চশিক্ষা, উচ্চবংশ, উচ্চযোগাযোগের মতো কোনো ডিগ্রি না থাকায় ধনী থেকে ভিক্ষুক সবার সঙ্গে অবলীলায় মিশতে পারি। বেশিরভাগ মানুষের কাছে জীবন একটা সিরিয়াস বিষয়। আমার কাছে জীবন হাসি ঠাট্টার। মাঝে মধ্যে ধারবাকি বাড়লে রোজগারের জন্য কিছু এলোমেলো কাজ করি। যাকে বলে 'অড জব'। এই মুহূর্তে তেমনই এক কাজের দায়িত্ব নিয়ে বিরাট বিপদে পড়েছি। কাজটা ভয়ংকর। কিন্তু কাজটা ঠিক কী বুঝতে পারছি না। সেটা খুন? নাকি প্রেম?

বাবা ক্ষেত্র গুপ্ত, মা জ্যোৎস্না গুপ্ত। ছোটোবেলা থেকে লেখার অভ্যেস। তবে সিরিয়াস লেখালেখির বয়স বেশি নয়। সমালোচকরা বলেছেন, অল্পদিনে যে বিপুল জনপ্রিয়তা তিনি পেয়েছেন তা চমকে দেওয়ার মতো। প্রচেত চমৎকার গল্প বলতে পারেন। বিস্ময়কর তার উদ্ভাবনী শক্তি। তার কাহিনীতে প্রেম আসে নতুন নতুন চেহারায়। রবীন্দ্রনাথের গান, বৃষ্টি, জ্যোৎস্না আর স্বপ্নে সেই ভালবাসা মাখামাখি হয়ে থাকে। প্রচেতর পাঠক কোনো নির্দিষ্ট বয়েসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বহুদিন পর বাংলা সাহিত্য এমন একজন লেখককে পেয়েছে। তিনি বহু পুরস্কারও পেয়েছেন। তাঁর মতে, পাঠকের প্রশংসা এবং নিন্দাই লেখকের একমাত্র পুরস্কার হতে পারে। সাগরকে নিয়ে লেখকের আরও তিনটি জনপ্রিয় উপন্যাস আছে।

এক যে ছিল সাগর

এক রোমাঞ্চকর ভালোবাসার কাহিনী

প্রচেত গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

এক যে ছিল সাগর

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪২০

— তিনশো টাকা—

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ দেবব্রত ঘোষ

EK JE CHHILO SAGAR
A novel by Pracheta Gupta
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan De Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 300/-

ISBN : 978-93-5020-118-3

Website www.mitraandghosh.co.in
www.golposwalpo.com

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি॥

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শব্দগ্রন্থন

টেকনোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
হইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ম্যাজিক প্রিন্টার্স, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

এই বই উৎসর্গ করবার জন্য আমি একটা নাম ভেবে রেখেছিলাম। সেই নাম লেখবার মুহূর্তে কাহিনীর প্রধান চরিত্র সাগর আমার টেবিলের পাশে এসে হাজির হয় এবং মাথা চুলকে বিনীতভাবে বলে, 'স্যার, আপনি তো অনেক বই উৎসর্গ করেছেন, এবার কি আমি একটা সুযোগ পেতে পারি?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী সুযোগ?' সাগর বলল, 'এই বই আমি আমার এক প্রিয়জনকে উৎসর্গ করতে চাই।' আমি আরও অবাক হলাম। কাহিনীর চরিত্র কখনও বই উৎসর্গ করে? সে অধিকার কি তার আছে? নিজেকে সামলে আমি বললাম, 'তুমি কাকে এই বই উৎসর্গ করতে চাও? তার নাম কী?' সাগর চকচকে চোখে নাম বলল। আমি চমকে উঠলাম। সাগর আমার মনের কথা জানল কী করে!

আধুনিক বাংলা গানের যাদুকর রূপমকে
সাগর এই বই উৎসর্গ করেছে।

কোথায় নিয়ে যাবে আমায় বল,
যেখানে নিয়ে যেতে চাও চল,
আমি তৈরি তোমার সৈন্য হতে

আমার যুদ্ধের খোঁজে পাখি
কেন লড়ে যেতে চাইছো একাকী

কোন আগুন জ্বলা ভবিষ্যতে...।

রূপম ইস্‌লাম
(জোয়ান অব্ আর্ক)

ভূমিকা নয়

ঠিক করলাম সাগরকে নিয়ে আর লিখব না। অনেক হয়েছে। তিনটে উপন্যাস লিখেছি, খান পনেরো গল্প লিখেছি। আবার কী? বোহেমিয়ান, অলস, বেকার, কিছুটা দার্শনিক, খানিকটা প্রেমিক, অনেকটা ছন্নছাড়া ধরনের যুবককে নায়ক বানিয়ে দেশে বিদেশে বহু গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে। আমি এবার কেটে পড়ি। সাগর গুডবাই।

সিদ্ধান্ত নেবার পর নিশ্চিন্ত লাগছিল। সাগরকে নিয়ে লেখা ঝামেলার কাজ। এই ছেলে কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে না। নারীবাদী—যার সঙ্গে খুশি মেলামেশা করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমার কোনো ভূমিকাই থাকে না। কাহিনীর মূল চরিত্র যদি এভাবে লেখকের হাতের বাইরে থাকে তাহলে ঝামেলা না? প্রেস্টিজেও লাগে। কাউকে বলতে পারি না। তাই সাগরকে ত্যাগ করে আমি সমস্যামুক্ত হলাম।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

এক অনুষ্ঠানবাড়িতে গিয়েছিলাম। বড় কিছু নয়, ছোটোখাটো অনুষ্ঠান। জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী ধরনের কিছু। তবে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন ছিল এলাহি। পেটপুরে খাওয়ার পর হলঘরের এককোণে একা দাঁড়িয়ে মন দিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছিলাম। আইসক্রিম, ফুচকা, তেলেভাজা ধরনের জিনস মন দিয়ে না খেলে পুরো স্বাদ পাওয়া যায় না। এমন সময় এক তরুণী সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটিকে দেখে মনে হল কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রঙ শ্যামলা। নীল শাড়ি। কপালে নীল টিপ। কানে বড় বড় নীল রঙের দুল। টানা টানা দুটো চোখও নীল বলে মনে হল। নাও হতে পারে। হয়তো অত নীল দেখে, বিভ্রম হয়েছিল।

মেয়েটি নীচু গলায় বলল, 'আপনিই সাগরকে নিয়ে গল্প লেখেন?'

অচেনা সুন্দরী যেচে এসে কথা বললে কোন্ পুরুষ মানুষ না থতমত খায়? আমিও খেলাম। কাঠের চামচে ব্যালান্স হারালাম। খানিকটা আইসক্রিম পড়ল জামায়, খানিকটা পড়ল মেঝেতে। পড়ুক। সুন্দরীর থেকে আইসক্রিম বড় নয়। মেয়েটি আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। একই রকম শান্ত ভাবে বলল, 'আপনি কি আমার হয়ে তাকে একটা কথা বলে দিতে পারবেন?'

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, 'কী কথা?'

মেয়েটি আমার দিকে আর একটু এগিয়ে আসে এবং গাঢ় স্বরে তার 'কথা' বলে। খুবই ছোট্ট 'কথা', তবু বলার সময় তার গালে লালচে আভা ফুটে ওঠে।

আমি আবার সাগরকে নিয়ে লিখতে শুরু করেছি।

প্রচেত গুপ্ত
কলকাতা
নভেম্বর, ২০১৩

এক

স্বপ্ন কেন আবার দেখা যায় না?

টিভি সিরিয়াল আবার দেখার ব্যবস্থা আছে। যাকে বলে রিপিট টেলিকাস্ট। সন্ধেরটা মিস করলে রাতে। রাতেরটা মিস করলে পরদিন সকালে। পরদিন সকালেরটা মিস করলে তারপরের দিন বিকেল। তারপরের দিনের বিকেলটা মিস, রোববার 'সন্ধে হব হব' সময়ে। আমার বিশ্বাস, আরো আছে। শুনেছি, ওরিজিনাল টিভি সিরিয়ালের থেকে রিপিট সিরিয়ালের কদর বেশি। এই ইন্টারেস্টিং খবর আমাকে দিয়েছেন, তমালের মামাতুতো জেঠিমা। দেবার সময় বাষট্টি বছরের বৃদ্ধা মুখটা এমন করে রেখেছিলেন যে মনে হচ্ছিল, ভয়ংকর গোপন কোনো সংবাদ দিচ্ছেন।

'বুঝলে সাগর, বাসি সিরিয়াল হল বাসি খিচুড়ির মতো। ও জিনিসের স্বাদই আলাদা।'

'মামাতুতো জেঠিমা' কথাটা শুনতে জটিল লাগলেও, জটিল কিছু নয়। মামাবাড়ির দিক থেকে জেঠিমা। মামাতো দাদা, মামাতো বোন হতে পারলে মামাতুতো জেঠিমা হবে না কেন? ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় তমালের পুত্রের মুখেভাতে। মানুষ যখন কাউকে নেমন্তন্ন করে গলবস্ত্র হয়ে, গদগদ ভঙ্গিতে নেমন্তন্ন করে। প্রায় করজোড়ে বলে, 'দয়া করে যাবেন। নিমন্ত্রণে ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন।' তমাল আমাকে নেমন্তন্ন করল চোখ মুখ খিঁচিয়ে, ধমক দিয়ে।

'সাগর, মনে করিস না শুধু গাণ্ডেপিণ্ডে গেলবার জন্য তোকে নেমন্তন্ন করছি। সকাল সকাল চলে আসবি। অনেক কাজ থাকবে। অত বড় ছাদ ঝাঁট দিতে হবে। সেখানে ডেকরেটরের পাঠানো চেয়ার টেবিল পাততে হবে। বড় ড্রামে করে তিনতলায় জল তুলতে হবে। খাওয়ার পর গেস্টরা তো আর এঁটো হাতে একতলায় মুখ ধুতে যাবে

না। ছাদেই ব্যবস্থা চাই। এসব কাজের জন্য লেবার থাকবে। তুইও ওদের সঙ্গে হাত লাগাবি। হাঁ করে বসে থাকবি না। কাজের পর টিফিন পাবি।'

নেমন্তন্ন করে বলছে ছাদ ঝাঁট দেওয়াবে! শুধু ঝাঁট নয়, বলছে ঝাঁট দিলে টিফিনও পাব! এটা অপমান ছাড়া আর কী? পিত্তি জ্বলিয়ে দেবার মতো অপমান। কিন্তু আমি গা করিনি। তমাল তো শুধু আমার বন্ধু নয়, আমার শত্রুও। বন্ধুর অপমানে রাগ করা যায়, শত্রুর অপমানে রাগ করা বোকামি। শত্রুর অপমান হাসিমুখে তাচ্ছিল্য করতে হয়। এ জিনিস আমি শিখেছি বিকাশকলি স্যারের কাছ থেকে। বিকাশকলি স্যার আমাদের স্কুলের ভূগোল টিচার ছিলেন। দার্শনিক প্যাটার্নের মানুষ। ক্লাসে পড়া শুরুর আগে খানিকক্ষণ তত্ত্বকথা আওড়াতেন। সেসব আমরা বুঝতে পারতাম না। মুখ টিপে হাসতাম। আড়ালে বলতাম 'পাগলা স্যার'। এখন মাঝেমধ্যে মনে হয়, সব কথা পাগলামি ছিল না। এই মান অপমান প্রসঙ্গেই 'পাগলা স্যার' আমাদের একটা দারুণ কথা শিখিয়েছিলেন।

'পড়াশোনা না করায় আমি যদি তোদের কান মুলে দিই তোরা দুঃখ পাবি, লজ্জা পাবি। কিন্তু ঘোষবাবুদের আমবাগানের পাশ দিয়ে যাবার সময় কোনো হনুমান যদি তোর কান মুলে দেয় তাহলে তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবি না। মনে রাখবি হনুমান হনুমানই। কান মুললেও সে মাস্টার হয় না।'

সেদিন এই কথায় ক্লাসসুদ্ধু ছেলেরা হো হো করে হেসেছিলাম। এখন বুঝি, কথাটা পুরোপুরি হাসির কথা ছিল না। আজকাল স্কুলের দিদিমণি মাস্টারমশাইরা ছাত্রের কান মুললে বাবা-মায়েরা থানায় নালিশ জানায়, আর পথেঘাটে 'হনুমান'রা কান মুললে হাত কচলায়। দুনিয়া খুবই ইন্টারেস্টিং হয়ে যাচ্ছে।

যাইহোক, মূল কথায় ফিরি। তমালের শত্রুতা করবার কায়দা উলটো। আমার মতো একটা বেকার, আলসে, গুড ফর নাথিং ছেলেকে সে যে কতবার চাকরিবাকরিতে ঢুকিয়ে দেবার প্ল্যান করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ শুনলে ভাববে, এ তো অতি চমৎকার কাজ! অলস, অযোগ্য বেকার বন্ধুকে কাজ জুটিয়ে দেওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার

BanglaBook.org

নাকি? আজকাল যোগ্যরাই কাজকর্ম জোটাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। আমি বলব, এটা মোটেই উপকার নয়। এটা আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা। আমি ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। সেই ঘরে বেলা পর্যন্ত ঘুমোই। ঘুম ভেঙে গেলেও উঠি না। ঘাপটি ঘুম দিয়ে পড়ে থাকি। ঘাপটি ঘুমের মতো মজা আর কিছুতে নেই। যে কখনো ঘাপটি ঘুম দেয়নি সে এই মজা কী জিনিস জানে না। উচ্চশিক্ষা, উচ্চবংশ, উচ্চযোগাযোগের মতো কোনো পেডিগ্রি না থাকায় আমি যার তার সঙ্গে অবলীলায় মিশতে পারি। শুধু মিশি না, ইচ্ছে হলে রাজা উজির মার্কা লোককে পথের ভিখিরি আর পথের ভিখিরিকে রাজা উজির মনে করে দিব্যি কথা চালাতে পারি। কিছুটা প্রুফ দেখে, কিছুটা টিউশন করে এবং বাকিটা ধারবাকিতে জীবন কাটছে। ধারবাকির মেইন সোর্স তমাল। সে প্রথমে বলে, 'একটা পয়সাও দেব না। দূর হ।' তারপর দেয়। তমালের মতো মানুষদের কাছে জীবনটা সিরিয়াস। আমার কাছে হাসি ঠাট্টার। সে অনেকবারই আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলেছে।

'হ্যা হ্যা, হি হি করেই দিনগুলো কাটিয়ে দিবি? সিরিয়াস হবি না? বয়স তো কম হল না সাগর।'

আমিও ঠাণ্ডা গলায় বলেছি, 'দেখ তমাল, কোনটা সিরিয়াস আর কোনটা হ্যা হ্যা, হি হি আমি বলতে পারব না। যে হাসি ফুর্তির মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখে সে কম সিরিয়াস তোকে কে বলল? যেমন ধর চার্লি চ্যাপলিন। তার ছবিগুলো দেখলে তোর কী মনে হয়? হ্যা হ্যা, হি হি? আচ্ছা, অতদূর যেতে হবে না। নিজের দেশে আসি। আমরা ছোটবেলায় বইতে পড়েছি, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশ শাসকদের মেরে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন। সেটা কী? ফাঁসির মঞ্চ কি কাতুকুতু দেবার মেশিন না শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প যে ওঠবার সময় হাসি পাবে?'

তমাল রাগ সামলে বলেছিল, 'তুই কুযুক্তি দিয়ে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছিস। আমি যা বলতে চেয়েছি তুই সেটা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিস। নিজেকে চ্যাপলিন বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে তুলনা করিস না। ভূত হয়ে এসে তাঁরা তোর গালে চড় কষাবেন।'

BanglaBook.org

আমি চোখ চকচক করে বললাম, 'দারুণ হবে! চ্যাপলিনের চড়ে আমার গালের দাম চড় চড় করে বেড়ে যাবে। চড় খাওয়া গাল নিয়ে গ্রামের মেলায় মেলায় ঘুরব। সার্কাসের মতো তাঁবু খাটিয়ে শো করব। তাঁবুর গায়ে দুটো বড় বড় ফটো থাকবে। চার্লি চ্যাপলিন আর শহিদ ক্ষুদিরাম। শোয়ের নাম দেব ভূতের চড়। ইচ্ছে করলে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তুই আমার সঙ্গে যেতেও পারিস। রংচঙে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে হাতে চোঙা নিয়ে চিৎকার করবি—আসুন, আসুন, আসুন। ভূতের চড় খাওয়া রোমহর্ষক গাল দেখে যান। হ্যাঁরে, তমাল, গাল কি কখনো রোমহর্ষক হয়?'

আমি থামলে তমাল এমন কটমট করে আমার দিকে তাকাল যে মনে হল আমি এখুনি ছাই হয়ে মাটিতে পড়ে যাব। অগ্নিসম দৃষ্টিতে ভস্ম।

আমি হেসে তমালের কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, 'রাগ করিস না। রসিকতা বাদ দে, যাকে কায়দা মেরে বলে জোকস অ্যাপার্ট। দেখ, একজন গম্ভীর মানুষও শেষ পর্যন্ত মারা যায়, একজন হাসিখুশি মানুষও শেষ পর্যন্ত মারা যায়। এখনো পর্যন্ত কোনো গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি গম্ভীর মানুষের আয়ু বেশি। শুনেছি চীন এরকম একটা কাজ শুরু করেছিল। ওরা এক লক্ষ উনষাট হাজার ছশো ছাপ্পান্ন জন মানুষের ওপর সমীক্ষা চালায়। স্যাম্পেল সার্ভে। গম্ভীর মানুষ এবং হাসিখুশি মানুষে ভাগ করে। তাদের গড় আয়ু হিসেব করতে থাকে। কিন্তু সমস্যা হয় মাঝেমধ্যেই গম্ভীর মানুষ এবং হাসিখুশি মানুষরা দিক বদল করতে থাকে। গম্ভীররা হাসতে থাকে, হাসিমুখেররা থম মেরে যায়। খোদ স্যাম্পেলই যদি গোলমাল করতে থাকে তাহলে গবেষণা হবে কী করে! ফলে সেই গবেষণা ফেইল করেছে। তাহলে হাসিখুশি থাকব না কেন?'

তমাল আবার কটমট চোখে তাকাল। আগের তাকানোতে সে আমাকে ছাই করেছিল। এই তাকানোতে ছাই উড়িয়ে দিল। আসলে তমাল বুঝতে চায় না। বেটা খালি আমাকে একটা পাকাপাকি কাজকর্মে ঢুকিয়ে দিতে চায়। সে চায়, আমি দশটার মধ্যে স্নান-টান করে, পাট পাট করে চুল আঁচড়ে টিফিন বাক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

BanglaBook.org

মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয়, হারামজাদার টার্গেট হল আমাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করা। পাত্রী ফাইনাল করতে নিজে যাবে। বউকে নিয়ে কাঁকিনাড়া বা মসলন্দপুরে জামাইষষ্ঠী করতে চলেছি—এই দৃশ্য দেখে তবে থামবে। শালা। একটা মুক্ত, স্বাধীন, ঘাপটি ঘুম প্রিয় তরুণ ছেলেকে যে ঠেসেঠুসে সংসারের ফুটবলে ঢোকাতে চাইছে, সে আমার শত্রু ছাড়া আর কী? ফুটবল খেলতে ইচ্ছে হলে মাঠে গিয়ে খেল। যত খুশি লাথি লাগা। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন বাপু?

যাইহোক, তমাল-পুত্রের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে গিয়ে আমি ছাদের দিকে পা বাড়াইনি। দোতলার গ্রিলে ঘেরা বারান্দায় জেঠিমা, কাকিমা, দিদিমাদের আড্ডায় ভিড়ে গেলাম। মাঝখানে এসে তমাল আমাকে একপাশে টেনে নিল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'গাধা, বুড়িদের সঙ্গে বসে কী করছিস?'

আমি সিরিয়াস গলায় বললাম, 'জেড জেনারেশন বোঝবার চেষ্টা করছি।'

তমাল ভুরু কুঁচকে বলল, 'জেড জেনারেশন! সেটা কী জিনিস?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সেকী রে, জেড জেনারেশন জানিস না! আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েরা যেমন ওয়াই জেনারেশন, তেমন বুড়োবুড়িরা হল জেড জেনারেশন। শেষ বলে জেড। তোর পুত্র যেমন এখন এ জেনারেশনের মানুষ। একেবারে শুরু বলে এ।'

তমাল আরো জোর দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'চোপ! কাজের বাড়িতে এসব হাবিজাবি কথা বলবি না।'

আমি বললাম, 'হাবিজাবি কেন হবে! দেখবি একটু বয়স হলেই অনেকে নেকিয়ে নেকিয়ে বলে, আমি ভাই ইয়াংদের সঙ্গে খুব মিশি। ওদের বোঝবার চেষ্টা করি। ওদের সুখ দুঃখ, ল্যাঙ্গুয়েজ ধরবার চেষ্টা করি। এই পর্যন্ত বলার পর এই ধরনের ন্যাকারা আরো নেকিয়ে যায়। বলে, টিনএজারদের ব্যাপারে আমার কোনো ইনহিবিশন নেই। ওদের সঙ্গে আমি খুব ফ্রি। আমিও তেমনি বয়স্ক জেনারেশন বোঝবার চেষ্টা করছি। সবাই ইয়াং জেনারেশন বুঝবে, বয়স্ক জেনারেশন কেউ বুঝবে না এটা কেমন কথা! তাদের কীসে আনন্দ, কীসে দুঃখ সেটাও তো কাউকে জানতে বুঝতে হবে। তাই না? তুই নিজে বল তমাল।'

BanglaBook.org

বলতে বলতে আমি খানিকটা কাতর ভঙ্গিতে তমালের হাতটা চেপে ধরি। ভাবটা এমন যেন সব কাজ ফেলে ওর এখন বয়স্ক জেনারেশন নিয়ে ভাবতে বসা উচিত। ঠিক এইসময় কে যেন চিৎকার করে বলল, 'তমালদা, ফার্স্ট ব্যাচ কি বসিয়ে দেব?' তমাল ঝটকা দিয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে নিল। আমার দিকে রাগ প্লাস করুণা প্লাস ঘৃণার দৃষ্টি হেনে চলে গেল গটগটিয়ে। আমি নিশ্চিন্ত মনে জেড জেনারেশনের কাছে ফিরে এলাম।

মামাতুতো জেঠিমা বললেন, 'বুঝলি সাগর, বাসি খিচুড়ি একবার যে খায় সে বারবার খেতে চায়। টাটকা খিচুড়ি তখন আর মুখে রোচে না। রিপিট সিরিয়াল যেরকম। আমাকেই ধর না কেন বাবা, আমি তো আসল এপিসোড দেখা কতদিন ছেড়েই দিয়েছি। দুদিন পরে যখন দেখায় তখন দেখি। আহা!'

আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'বাসি সিরিয়ালে ঘটনা কি বদলে যায় জেঠিমা? দুঃখেরটা আনন্দের হয়ে যায়? ধরুন ওরিজিনালে বড়বউয়ের সঙ্গে ছোটবউয়ের ঝগড়া হয়েছিল, তাই নিয়ে দত্ত বা সিংহ বাড়িতে তুমুল ঝগড়া। বাসিতে সেই ঝগড়া মিটে যাবে?'

জেঠিমা লজ্জা লজ্জা হেসে বললেন, 'দুর বোকা ছেলে, ঘটনা বদলাবে কেন! বাসি খিচুড়িতে কি চাল ডাল বদলে যায়? আসলে স্বাদ ঘন হয়ে আসে। যে না খায় সে বুঝবে না।'

সত্যি আমি বুঝব না। বাসি বা টাটকা টিভি সিরিয়ালের স্বাদ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। সিরিয়াল দেখবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে শোনবার অভিজ্ঞতা আছে। কথাটা ধোঁয়াটে লাগল? লাগবারই কথা। টিভি সিরিয়াল তো আর রেডিয়োর নাটক নয়, যে কান পেতে শুনলেই হয়ে যায়। তবে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। শুধু শোনবার। আচ্ছা, খোলসা করে বলছি। আমাদের গলির মোড়ে যে ভাত-ডালের হোটেলটা রয়েছে সেখানে আমার মাসকাবারি ব্যবস্থা। সারা মাস নিশ্চিন্তে খাও, টাকাপয়সা দেবার বালাই নেই, কেউ কিছু বলবে না। শুধু মাসের শেষে বিল মিটিয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে বাড়ি যাও। যারা ইতিমধ্যে সাগরের দু-একটা কাহিনি পড়েছে, তাদের এই হোটেল সম্পর্কে হয়তো কিছু ধারণা হয়েছে। তবু

BanglaBook.org

আবার বললে সমস্যা নেই। হোটেলের নিয়মকানুন রোজই বদলায়। হোটেল সাইজে খুবই ছোট। তবে লম্বায় অনেকটা। উঁচুতে সিলিং। উত্তর কলকাতার প্রাচীন ঘরগুলো যেমন হয় আর কি। ঘরে গুটিকয়েক কাঠের চেয়ার টেবিল। টেবিলের ওপর ফুলকাটা প্লাস্টিকের টেবিল ক্লথ। তাতে হলুদের ছোপ। কমন বাটিতে নুন, লেবু, কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ। যার যখন যেটা দরকার তুলে নাও। ব্রিটিশ আমলের ট্রাডিশন। তবে একধরনের অ্যান্টিক ভ্যালু রয়েছে। আজ হয়তো এতে অনেকে নাক সিঁটকোয়, কিন্তু একদিন আসবে যখন এসব জায়গায় খাবার জন্য স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা লম্বা লাইন দেবে। এটাই ফ্যাশন হবে। ওল্ড ইজ গোল্ড। ভাত হোটেলে যেমন মান্থলি খাবার সিস্টেম চালু তেমন বকেয়া বিল মেটানোর জন্যও নানারকম চাপ সিস্টেম চালু আছে। থাকবেই তো। কাবুলিওয়ালার ধার, ব্যাঙ্কের লোন, ক্রেডিট কার্ডের টাকা শোধ না করলে ছাড় পাওয়া যায়? যায় না। তাহলে ভাতে ডালে পাওয়া যাবে কেন? চাপের জন্য হোটেল মালিক নানা ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তারই একটা হল 'জামাই টেবিল' পদ্ধতি। হোটেলে একটা লগবগে টেবিল আছে। বাঁদিকের একটা পায়া শর্ট। বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। খেতে বসলে মালুম হয়। ভাত মাখবার সময় চাপ পড়লে এদিক ওদিক নাচে। ডাল, মাছের ঝোল গড়াগড়ি খায়। হোটেলের ছেলেরা এই টেবিলকে বলে, 'জামাই টেবিল'। এটা কোড নেম। শুনলে মনে হয়, যে টেবিলে বসিয়ে কাস্টমারকে জামাই আদরে খাওয়ানো হবে। আসল ঘটনা কিন্তু উলটো। মাসকাবারির বিল দিতে সাতদিন দেরি হলেই লগবগে টেবিলে বসানো হয়। যাতে ঝোল ডালের গড়াগড়িতে সামলাতে সামলাতে কাস্টমারের বিলের কথা মনে পড়ে যায়। বিল না দেবার কারণে আমাকেও কয়েকবার 'জামাই টেবিল'-এ বসতে হয়েছে। কিন্তু টেবিল নাচেনি! তার জন্য আমি ভাত-ডাল হোটেলের কর্মচারীদের কাছে পরম কৃতজ্ঞ। কোনো এক রহস্যময় কারণে এরা আমাকে অতিরিক্ত পছন্দ করে। সম্ভবত সিরিয়াস মানুষ নই বলে। তমালকে এনে একদিন দেখাতে হবে। মালিক যখন চোখের ইশারায় আমাকে লগবগে টেবিলে পাঠায়, কর্মচারীরা ভিজে বিড়াল টাইপ মুখ

করে অর্ডার পালন করে। কিন্তু খাবার দেবার সময় কেউ না কেউ এসে পায়ার তলায় গোঁজ দিয়ে যায়। কখনো কাঠের টুকরো, কখনো কাগজের গোল্লা। লাউ কুমড়োর খোসা দিয়েও ম্যানেজ করেছে কোনো কোনোদিন। মালিক জানতেও পারে না। সে ভাবে আমার বোধহয় খুব অসুবিধে হচ্ছে। কালই গুড বয়ের মতো বকেয়া টাকা দিয়ে দেব। আমার কোনো অসুবিধেই হয় না। আমি বানিয়ে বানিয়ে ডাল তরকারি মাছের ঝোল নিয়ে ব্যালান্সের ভান করি আর পরম তৃপ্তিতে খেতে থাকি। কখনো কখনো মনে হয়, জীবনটা আসলে এরকমই। কোনো অদৃশ্য শক্তি আমাদের নিয়ে ব্যালান্সের খেলা খেলে চলেছে। পড়ে যাওয়ার আগে তুলে ধরছে, তুলে ধরার পর ফেলে দিচ্ছে। আর আমরা বোকার মতো ভাবছি, খেলছি আমরাই। নিজেকে ফেলছি, তুলছি ওলোটপালোট খাওয়াচ্ছি ইচ্ছেমতো। ভুল, বিরাট ভুল।

ভাত-ডালের হোটেলের মালিক শেষ পর্যন্ত খেয়াল করলেন, 'জামাই টেবিল' টেকনিক আমার ওপর কাজ করছে না। বিল মেটানোর নামগন্ধ নেই। তখন উনি আমার ওপর দ্বিতীয় টেকনিক অ্যাপ্লাই করলেন। একদিন রাতে খেতে গিয়ে দেখি, হোটেলের এককোণে টেবিলে ছোট সাইজের একটা টিভি সেট রাখা। সেট নতুন নয়, পুরোনো পুরোনো দেখতে। তবে পর্দায় ছবি চলছে দিব্যি। রাঁধুনি বিশুকে জিগ্যেস করলাম, 'ব্যাপার কী বিশু? একেবারে টিভি বসিয়ে দিয়েছ! মনে হচ্ছে দেশে ডাল ভাতের ব্যবসায় রমরমা শুরু হয়েছে।'

বিশু গলা নামিয়ে বলল, 'মালিক এনেছে। সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস। তবে ছবির কোয়ালিটি খারাপ নয়।'

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'বাঃ। তোমাদের জন্য একটা নতুন জিনিস হল। খাটাখাটনির পর টিভি দেখবে।'

বিশু ঠোঁট উলটে বলল, 'আমাদের নয়, কাস্টমারদের জন্য। মালিক বলেছে, কাস্টমাররা খেতে খেতে টিভি দেখবে।'

আমি বললাম, 'ভালই হল, আমার ঘরে তো আর টিভি নেই, খেতে এসে এখানেই খানিকক্ষণ দেখে নেব।'

বিশু এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'পারবেন না।

BanglaBook.org

যাদের টাকা বাকি পড়ে আছে তাদের টেবিল টিভির পিছনে। আপনাকেও ওখানে গিয়ে বসতে হবে। বিল মেটালে সামনে আসতে পারবেন।'

ওই একটা ফেজ গেছে আমার। রোজ খেতে গিয়ে টিভির পিছনে বসতে হত। টিভিতে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যেত, আমি শুধু আওয়াজ শুনতাম। কখনো কথা, কখনো বাজনা, কখনো চুপচাপ। ডাল রুটি মুখে তুলতে তুলতে শুনতে পেতাম শাশুড়ির হাহাকার—

'পারলে বউমা! তুমি এমন কাজ করতে পারলে! আমাদের বংশপরিচয়, মানমর্যাদা এভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারলে! আজ যদি তোমার শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতেন...।'

শুধু হাহাকার নয়, ঢ্যাঁড়শের তরকারি খেতে খেতে প্রেমিক প্রেমিকার দুষ্টু মিষ্টি ভালবাসার ডায়লগও শুনেছি। সে সব ডায়লগ গা ছমছমে।

'অ্যাই কী হচ্ছে? দুষ্টু একটা! হি হি। মারব কিন্তু! হি হি।'

'দুষ্টুমি তো করবই, আমি তোমার মনের মানুষ না? মনের মানুষরা দুষ্টুমি করে। উ উ।'

'মনের মানুষ না ছাই। খালি ইয়ের মানুষ। অ্যাই পাজি ছেলে, মুখ সরাও বলছি। নইলে কিন্তু ভাল হবে না। হি হি।'

'তুমি কি বিয়ের পরও এমনটা করবে? হাত সরাও, আর মুখ সরাও? উ উ।'

'করবই তো। আমার ঘরেই ঢুকতে দেব না। হি হি। লক করে রাখব। হি হি।'

সন্দেহ নেই, বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য শাশুড়ি, বড়বউ, প্রেমিকার পিছনে বসে ডায়লগ শোনানোর শাস্তি বেশ কঠিন শাস্তি। শকের মতো লাগে। চমকে চমকে উঠতে হয়। এই ডায়লগ টাটকা হলেই বা কী? বাসি হলেই বা কী? সবই মারাত্মক!

তবে তমালের মামাতুতো জেঠিমার রিপিট টেলিকাস্ট সংক্রান্ত সংবাদ আমার মনে ধরেছে। স্বপ্নের বেলায় রিপিটের কোনো ব্যবস্থা নেই কেন? আমাদের মাথার ভেতরে যদি একটা রেকর্ডিং মেশিন

BanglaBook.org

থাকত চমৎকার হত। সেই মেশিনে স্বপ্নগুলো সব ধরে রাখতাম। পরে ইচ্ছেমতো মেশিন চালিয়ে বার বার দেখতাম। তবে কোন স্বপ্নটা দেখব তা নিয়ে সমস্যা হত। সাধারণ নিয়ম হল, স্বপ্ন মনে থাকে না। ফলে রেকর্ডিং মেশিন চালিয়ে দশটা খারাপ স্বপ্ন ঘাঁটার পর হয়তো একটা ভাল বেরোত। ক-দিন হল একটা চমৎকার স্বপ্ন আমার খুব মনে পড়ছে। বছর কয়েক আগে দেখেছিলাম। আধো ঘুম আধো জাগার মধ্যে এক রাজকন্যা এসেছিল আমার ঘরে। ভোরের আলো সবে ফুটব ফুটব করছে। এই আলো মায়ায় ভরা। এই আলো শুধু জেগে থাকলে দেখা যায় এমন নয়। আধো ঘুমের অবচেতনে ঢুকে পড়ে। সেদিনও পড়েছিল। স্বপ্নের রাজকন্যা সেই মায়া আলোয় মাখামাখি হয়ে আমার সত্যিকারের ভাঙা তক্তাপোশের পাশে এসে বসেছিল। তাকে মনে হচ্ছিল, আলো কন্যা। তার চোখ মুখ নাক, তার পোশাক, তার লম্বা চুল দিয়ে আলো ঝরছিল টপটপ করে। এটা সেটা বলার পর আলো কন্যা ভালবাসার কথায় ঢুকতে অমনি ফট করে গেল স্বপ্নটা ভেঙে। ইস! মনে হয়, স্বপ্নটা যদি আর একবার দেখা যেত...আর ভুল হবে না। হাবিজাবি না বকে রাজকন্যার সঙ্গে সোজা প্রেমের কথায় চলে যাব। ভাল স্বপ্নের ডিউরেশন বড্ড কম হয়। রূপকথা হলে তো কথাই নেই।

তবে আজ ভোররাতে একটা কাণ্ড হয়েছে।

আমার রূপকথার স্বপ্ন রিপিট হল। সেই আমার ছোট ঘর, সেই ক্যাঁচম্যাচ আওয়াজ তোলা ভাঙা তক্তাপোশ, সেই সকালের ফোটা না ফোটা আলো। আধা জাগা, আধা ঘুমে একজন এসে আমার মাথার কাছে দাঁড়াল। রাজকন্যা কি ফিরে এল?

খুব আশা নিয়ে চোখ খুললাম। খুলে আঁতকে উঠলাম!

BanglaBook.org

দুই

এই মুহূর্তে আমি তমালের অফিসে।

তমালের আরো পদোন্নতি হয়েছে। ম্যানেজার থেকে সিনিয়র ম্যানেজার, সিনিয়র ম্যানেজার থেকে জেনারেল ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার থেকে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার। চাকরির ব্যাপারে আমার এই বন্ধুটির হল 'ক্যাঙারু লাক্'। ক্যাঙারু যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, ওর ভাগ্যও তেমন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। শুধু নিজের চলে না, ওর ভাগ্যের পেটের থলিতে বাচ্চা ভাগ্য আছে। সেও মাঝেমধ্যে থলি থেকে বেরিয়ে লাফ মারে।

বন্ধুর এই উন্নতি দেখলে হয় খুশি, নয় ঈর্ষা হওয়ার কথা। আমার ভয় হয়। আমার ধারণা, একদিন তমালের অফিসে এসে শুনব তমাল আর কর্মচারী নেই, সে মালিক হয়ে গেছে। আর হুট বলতে তার সঙ্গে দেখা করা যাবে না। মিনিমাম তিনদিন আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইতে হবে। ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। ফর্মে পাসপোর্ট সাইজ ফটো লাগবে। লিখতে হবে, কেন দেখা করতে চাই। ফর্ম প্রথমে যাবে 'স্যার'-এর সেক্রেটারির কাছে। তিনি খুঁটিয়ে দেখে অনুমতি দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট না হয় চাইলাম, কিন্তু কারণ কী লিখব? তিনশো টাকার খুব দরকার? ভাত-ডাল হোটেলে বাকি পড়ে গেছে। কিছু পেমেন্ট না করলে কাল থেকে মিল বন্ধ। আচ্ছা, তিনশো দিতে হবে না। এখন আড়াইশো দে। আপাতত ম্যানেজ করে নেব। নাকি লিখব, পার্কস্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ খিদে পেয়ে গেল। তোর অফিসের ক্যান্টিনে বাটার টোস্ট; সিঙ্গাপুরি কলা আর অমলেট খেতে চাই? মালিককে একথা লেখা যায়? আর যদি বা লেখা যায় সেক্রেটারি সেই লেখা অ্যালাও করবে কেন?

এসির কারণে কাচের ঘর বাড়াবাড়ি ধরনের ঠাণ্ডা। শীত করছে।

এমনি শীত নয়, কাঁপুনি শীত। আমি ঘরে ঢুকে তমালকে বলেছিলাম, 'এসি বন্ধ কর।'

তমাল গম্ভীর মুখে বলল, 'সম্ভব নয়।'

আমি চেয়ারে বসে কুঁকড়ে মুকড়ে বললাম, 'ঠিক আছে তাহলে ঠাণ্ডা কমিয়ে দিতে বল।'

তমাল বিরক্ত গলায় বলল, 'বলছি তো হবে না। সিস্টেমে টেম্পারেচার মেইনটেইন করতে হয়।'

আমি অবাক হলাম। বললাম, 'কীসের সিস্টেম? এটা কি নাসার অফিস? তোর টেবিলে তো একটা মাত্র কম্পিউটার। তার জন্য ঘর এত ঠাণ্ডা করে রাখতে হবে? নাকি আমরা হলাম এক সপ্তাহের বাজার আর তোর ঘরটা রেফ্রিজারেটর?'

তমাল বলল, 'ফালতু কথা বলিস না। সিস্টেম শুধু যন্ত্রের লাগে না, মানুষেরও লাগে।'

আমি তর্কের ঢঙে বললাম, 'আমিও তো মানুষ। কই আমার তো কোনো সিস্টেম নেই।'

তমাল চাপা গলায় বলল, 'কে বলল তুই মানুষ? সিস্টেম নেই বলেই তো মানুষ হতে পারিসনি। তোর সঙ্গে এসব কথা বলা অর্থহীন। চুপ করে বোস। আমি হাতের কাজ সেরে নিই।'

আমি থম মেরে চুপ করে বসে রইলাম। তমাল ল্যাপটপে খটমট করতে লাগল। আজকাল কাজ মানেই ল্যাপটপে খটমট। আর কাজের শেষও নেই বটে! দুনিয়ার এত কাজ যে কোথায় ছিল! যেখানে যাব, দেখব কেউ না কেউ ল্যাপটপ খটখটাচ্ছে। সেদিন সন্ধেবেলা গড়িয়ার ট্রাফিক জ্যামে সাংঘাতিক দৃশ্য দেখলাম। ফুলে ঢাকা বিয়ের গাড়িতে বর বউ সেজেগুজে বসে আছে। ধুতি, বেনারসি, মাথায় টোপর। বউয়ের কোলে সিঁদুরের ডাব্বা, বরের কোলে ল্যাপটপ। বর ভুরু কুঁচকে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে আর মাঝেমধ্যে খটামট মারছে। খুব ইচ্ছে করল, গাড়ির জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিই ছোকরার কানটা মুলে। ওরে হাঁদা, ল্যাপটপ ছুঁড়ে ফেলে দে। ফেলে দিয়ে নতুন বউয়ের দিকে আড়চোখে তাকা। বউয়ের দিকে আড়চোখে তাকানোর এই শুভক্ষণ জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসবে? তবে আমি নিশ্চিত,

BanglaBook.org

এই কাজ যদি আমি সেদিন করতাম, নতুন বউ খেপে আগুন হয়ে যেত। তার কর্পোরেট বর যে অতি ব্যস্ত একজন মানুষ এটাই তার গর্বের বিষয়। কে জানে, প্রেম বা সম্বন্ধের সময়েও এই ছেলে হয়তো কোল থেকে ল্যাপটপ নামায়নি। মেয়েটি হয়তো বা সেই কারণেই বিয়েতে রাজি হয়েছে। দুদিন পরই শ্বশুরবাড়ি থেকে মাকে ফোন করবে। ছদ্ম অভিমান মাখা গলায় বলবে, 'উফ মা, তোমার জামাইকে নিয়ে আর পারা গেল না। বাড়িতে থাকলে বোঝাই যায় না, তার বউ কে? আমি না ল্যাপটপ?'

'মা' গদগদ গলায় বলবে, 'আমি জানতাম, ওই ছেলে হিরের টুকরো।'

মেয়ে খুশি হয়ে লজ্জা লজ্জা গলায় বলবে, 'হিরে নয়, বল ল্যাপটপের টুকরো।'

আচ্ছা, বিজনেস শুরু করলে কেমন হয়? গলায় ঝোলানো ল্যাপটপের বিজনেস? লোকাল ট্রেনে হকাররা যেমন গলায় ট্রে ঝুলিয়ে ছুরি, কাঁচি, চিরুনি, ঝাল লজেন্স বিক্রি করে? সেইভাবে এখনকার ছেলেমেয়েদের গলায় ল্যাপটপ ঝুলবে। তারা হাঁটতে হাঁটতে 'কাজ' করবে। ল্যাপটপের নাম হবে 'সাগর ল্যাপটপ'। বিজ্ঞাপনে লিখতাম—

'চিন্তা নেই! চিন্তা নেই! চিন্তা নেই! আশপাশে কেউ জলে পড়ুক, আগুনে পুড়ুক, পথের ধারে খাবি খেয়ে মরে যাক, আপনাকে আর ফিরে তাকাতে হবে না। কারণ এসে গেছে গলায় ঝোলানো সাগর ল্যাপটপ। এখন থেকে আপনি সর্বক্ষণ থাকবেন সাগর ল্যাপটপে।'

সন্দেহ নেই, এ জিনিস খুব চলত। ক্যাপিটালের জন্য তমালকে একবার বলে দেখব নাকি? কী আর এমন খরচ? ল্যাপটপের সঙ্গে গলায় ঝোলানো বেল্ট। সেই বেল্টও হতে পারে নানা কায়দার। যে যেমন চাইবে। চামড়া টু দড়ি। ঢোল, হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ ঝোলানোর মতোও হতে পারে। একটা লোকসংস্কৃতির ছোঁয়াও থাকবে। হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে আমি ঘাড় গুঁজে বসে রইলাম। ঠান্ডা বাড়ছে। তমালের উচিত ঘরে কম্বল রাখা। মোটা মোটা তিব্বতি কম্বল। কেউ

BanglaBook.org

এলে গদগদভাবে তার গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হবে। মঞ্চে যেমন জ্ঞানী গুণীদের উত্তরীয় পরানো হয়, এখানে তেমন কম্বল পরানো হবে। সবাই কম্বল গায়ে মিটিং করবে। ঘর থেকে বেরোনোর সময় কম্বল রেখে বেরোবে। আসলে মূল সমস্যা হল, দুনিয়াটা সিস্টেমের কাছে মাথা নুইয়ে ফেলেছে। সবাই নাট বল্টু, মাইক্রোচিপস, কনডেনসার, র‍্যাম নিয়ে চিন্তিত। তাদের ঠাণ্ডা গরম নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে। মানুষের কথা আর কারো মনে নেই। সে হারামজাদা গরমে মরল না ঠাণ্ডায় জমল কী আসে যায়?

গদি মোড়া হাই ব্যাক চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে আছে তমাল। চুপ করে বসে নেই, হালকা দোলা দিচ্ছে। ডান বাঁয়ের দোলা নয়, ওপর নীচের দোলা। আমার ধারণা, কর্মক্ষেত্রে পজিশনের ওপর চেয়ারের দুলুনি নির্ভর করে। হেঁজিপেঁজিরা চেয়ার দোলায় ডান বাঁয়ে, কখনো হাফ সার্কেলে। দেখলেই বোঝা যায়, বেটা এখনো দামি চেয়ারে বসবার উপযুক্ত হয়নি। বস মানুষেরা চেয়ার দোলায় সামনে পিছনে। মনে হয়, সমুদ্রের শান্ত ভঙ্গিতে চিতসাঁতার কাটছে। তমাল শুধু চিতসাঁতার কাটছে না, আমার দিকে আধখোলা চোখে তাকিয়েও আছে। একটা না-ছোলা আস্ত পেনসিল দিয়ে মাঝেমধ্যে নিজের চিবুকে টোকা মারছে। তাকে অনেকটা হিন্দি সিনেমার ভিলেনদের মতো দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা কী! ডেকে পাঠিয়ে মারধোর করবে নাকি?

তমাল আমাকে আসতে বলেছিল তিনদিন আগে। খবর পাঠিয়েছিল—

'একটা কাজ পেয়েছি। ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। চাকরিবাকরি কিছু নয়। চাইলে এক নিমেষে করে ফেলা যায়। পারিশ্রমিক ভাল।'

আমি পাকাপাকি কোনো কাজকর্মে যেতে না চাওয়ায় তমাল মাঝেমধ্যেই আমাকে নানা ধরনের 'অড জবস' দেয়। উদ্ভট কাজ। ফুরোনে করতে হয়। রাজি রাজি রাজি/কাজ ফুরোলে পাজি। আমি সবকটায় রাজি হই না, আবার কয়েকটায় রাজিও হই। আলসে জীবনের মধ্যে থাকতে গেলে কিছু স্বাধীন রোজগার দরকার। শুধু ধারদেনায় হয় না। বুড়ো বাবার কাছ থেকে তো টাকা চেয়ে দেশের বাড়িতে চিঠি লিখতে পারি না। মা মাঝেমধ্যে খেতের আলুটা,

মুলোটা, ঝিঙেটা পাঠিয়ে দেয়। আমি সেগুলো ভাত-ডাল হোটেলের কর্মচারীদের কাছে চালান করে দিই। গোকুল, সনাতন, হরি, পুঁটিকুমার মাঝেমধ্যে প্রশ্ন তোলে।

'সাগরদা, আপনার লাগবে না? রেখে দিন না। নিজে রান্না করে খাবেন।'

আমি গম্ভীর ভঙ্গিতে বলি, 'না। যে জমির ওপর আমার কোনো অধিকার নেই, তার ফসল আমি ভোগ করতে পারব না। নিজেকে পাপী মনে হবে।'

গোকুল বলে, 'সে আবার কী! পাপী মনে হবে কেন! আপনার বাবার জমি মানেই তো আপনার। আইনে তো তা-ই বলে।'

আমি উদাসীন ভঙ্গিতে বলি, 'আইনে বলে আবার আইনে বলেও না। ওই জমি যেমন আইনি তেমন আবার বেআইনিও।'

সনাতন বলল, 'এ আবার কেমন কথা বলছেন সাগরদা! আমরা তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি গুছিয়ে বসে গল্প বলার ঢঙে বলি, 'তাহলে ঘটনাটা তোমাদের বলেই ফেলি। আমি আমাদের জমির দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটেছি। ঘাঁটতে গিয়ে দেখি রোমাঞ্চকর ব্যাপার! গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাওয়ার জোগাড়।'

এদের মধ্যে হরিটা বোকা। একবারে কথা বোঝে না। এক হাতা এক্সট্রা ডাল দিতে বললে, এক চামচ সুক্তো দিয়ে যায়। সে চোখ বড় করে বলল, 'বলেন কী! একেবারে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়! ভূত-টুতের ব্যাপার নাকি?'

আমি গলা নামিয়ে বলি, 'ভূত না, অনেকটা ডাকাত বলা যেতে পারে। ভদ্রবেশী ডাকাত। গিলে করা পাঞ্জাবি, লোটানো কোঁচা, হাতে ছড়ি নেওয়া ডাকাত।'

সনাতন বলল, 'সোজাসুজি বলুন দাদা।'

আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবে কেমন ডাকাত। আচ্ছা, বল তো দেশের জমিটা কার? আমার পিতৃদেবের। আচ্ছা, এবার বল, আমার পিতৃদেবের জমিটা কার ছিল? আমার প্রপিতামহের। আমার প্রপিতামহ সেই জমি কার কাছ থেকে

BanglaBook.org

পেয়েছিলেন বলতে পার? কার আবার? অবশ্যই তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে। তা-ই তো? এবার ভেবে দেখো, তাঁর পিতৃদেবের জমিটা কার দখলে ছিল? তাঁর প্রপিতামহের। ঠিক কিনা? এইভাবে পিছোতে পিছোতে আমি যে কত বছর পিছিয়ে গেলাম তার হিসেব নেই। একসময় খেলাম হোঁচট। দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটি কিন্তু হিসেবে আর পাই না। একসময় সিন্দুকে দলিলও গেল ফুরিয়ে। পড়লাম অকূল পাথারে। তাহলে জমি আসলে কার?'

সনাতন বলল, 'তারপর কী হল?'

আমি হেসে বললাম, 'তারপর তোরঙ্গ থেকে বের করলাম ইতিহাস। আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি। সেই ইতিহাসের পাতা উলটে জানতে পারলাম, আমরা হলাম শ্রী শ্রী গোকুলচন্দ্রের ডাইরেক্ট বংশধর। গোকুলচন্দ্রের নাম শুনেছ?'

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সনাতন বলল, 'একজন গোকুলচন্দ্রকে চিনি। ঝামাপুকুরে বাড়ি। আমাদের এখানে খেতে আসে। নিমপাতা ভাজা আর পুঁটি মাছের ঝোল খায়।'

আমি হেসে বলি, 'না না শ্রী শ্রী গোকুলচন্দ্র ছিলেন জমিদার। যেমন দাপুটে তেমন অত্যাচারী। তাঁর ছিল ভয়ংকর লেঠেল বাহিনী। সেই লেঠেল বাহিনী দিয়ে গায়ের জোরে তিনি যে কত গরিব মানুষের জমি দখল করেছিলেন তার হিসেব নেই। পান থেকে চুন খসলেই জমি বেহাত। তখন যদি দেশে আইনকানুন বলে কিছু থাকত তাহলে নির্ঘাত জমিদার বেটার জেল জরিমানা দুটোই একসঙ্গে হত। কী করা যাবে, সেসব তো আর ছিল না। তখন ছিল 'জোর যার মুলুক তার'-এর যুগ। কিন্তু তা বলে এখন তো আর তা নয়। দেশে আইনকানুন বলে একটা জিনিস হয়েছে। জোর করে দখল নেওয়া জমির ভাগ আমি নিই কী করে? তোমরাই বল না।'

হরি বলল, 'আহা! তারা তো সব কবে মরে হেজে গেছে।'

আমি বললাম, 'তারা মরে গেলে কী হবে জমিটা তো রয়ে গেছে। ভগবান তো আর আমার জন্য স্বর্গ থেকে ফ্রেশ জমি পাঠাননি। তাহলে না হয় একটা কথা ছিল। সেই জমিতে অতীতের কালি লেগে থাকত না।'

সনাতন বলল, 'কথাটা ভুল বললেন না দাদা।'

আমি বললাম, 'শুধু জমি রয়ে যায়নি, জমিদার যাদের কাছ থেকে লাঠি দেখিয়ে জমি বাড়ি পুকুর হাতিয়েছিলেন, তাদের বংশধররাও তো রয়ে গেছে। বলা যায় না, হয়তো তোমাদের মধ্যেই সেই লোক আছে। বল না, বলা কি যায়? এই জমি হয়তো তোমাদের কারো পূর্বপুরুষের। সামান্য কয়েকটা টাকা খাজনা দিতে পারোনি বলে আমার জমিদার ঠাকুর্দা কেড়ে নিয়েছিলেন। হতে পারে না?'

কথা পুরো শেষ না করে আমি হালকা হাসলাম। আড়চোখে দেখলাম গোকুল, সনাতন, হরি সকলের চোখ একেবারে ছানাবড়ার মতো হয়ে গেল। তারা এর তার মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। এরকম উদ্ভট কথা আগে কখনো শুনেছে বলে মনে হয় না। মনে হবে কেন? নিশ্চয় শোনেনি। আমি নিশ্চিত হলাম, পুরোপুরি ঘাবড়ে দিতে পেরেছি। লম্বা করে শ্বাস ছেড়ে বললাম, 'তবেই বল, এই জমিতে আমি ভাগ বসাই কী করে? বাবাকে কিছু বলিনি। দুঃখ পাবেন। তিনি তো আর দলিল-টলিল ঘাঁটেননি। তবে আমি মনে মনে ওই জমির অধিকার ছেড়ে দিয়েছি বহুকাল। দিব্যি আছি। বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াই। নইলে সবসময় সিঁটিয়ে থাকতাম। গরিব মানুষ দেখলেই মনে হত, নিশ্চয় বেচারির জমি মেরেছি। আমায় গাল দেবে। তার থেকে এই ভাল।'

এরপর আর কথা বাঁড়ায়নি কেউ। মায়ের পাঠানো আনাজপাতি নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আমিও খুশি হই। বেচারিরা রোজ আমাকে খাওয়ায়, আমি কিছুই করতে পারি না। সামান্য কিছু করা গেল।

ঠাণ্ডা খানিকটা গা সওয়া হয়ে গেছে। আশ্চর্য! একেই বোধহয় বলে, যেখানে যেমন। তমালের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভিলেনের মতো হাবভাব করে কী দেখছিস?'

তমাল সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'তোকে।'

'আমাকে আগে দেখিসনি?'

তমাল বলল, 'দেখেছি, সে-দেখার ওপর-ডিপেন্ড করলে চলবে না। দেখছি কাজটা পারবি কিনা।'

BanglaBook.org

আমি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললাম, 'আবার তোর ছেলে হয়েছে নাকি? আবার অন্নপ্রাশন? ছাদ ঝাঁট দিতে হবে? পারব না ভাই। আমাকে ছেড়ে দে।'

তমাল একথার জবাব না দিয়ে বলল, 'কী খাবি? চা না কফি?'

আমি বললাম, 'শরবত বল। শরবতে বরফ কুচি দিয়ে আনতে বলবি।'

তমাল ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি এনে বলল, 'সে কী! এই যে বললি ঠাণ্ডা লাগছে! গরম কিছু খা।'

আমি নির্লিপ্ত গলায় বললাম, 'শরীর তোদের সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডায় আর কষ্ট হচ্ছে না।'

ইন্টারকমে শরবতের কথা বলে তমাল আবার চুপ করে গেল। একইভাবে ভুরু কুঁচকে দেখতে লাগল আমাকে। আগে কথার মাঝখানে এইভাবে চুপ করে যাওয়ার অভ্যেস ছিল না তমালের। নিশ্চয় এটা পদোন্নতির স্টাইল। উঁচুতে উঠলে কথার মাঝখানে চুপ করে যেতে হয়। কিন্তু আমার তো চুপ করে থাকলে চলবে না। আমাকে চট করে কাজের কথা শুনে বেরোতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা কলেজ স্ট্রিট যাব। সাড়ে তিনটে পর্যন্ত মেঘলা ইউনিভার্সিটিতে থাকবে। তারপর আমরা দুজনে মিলে হাঁটাহাঁটি করব। হাঁটাহাঁটিটা মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য অন্য।

মেঘলা মনস্তত্ত্বের ছাত্রী। নর্মাল ছাত্রী নয়, মেধাবী ছাত্রী। পরীক্ষায় দেখ না দেখ ফার্স্ট হত। তবে ফার্স্ট হওয়ার বিষয়টিকে সে কখনোই আলাদা করে গুরুত্ব দেয়নি। এই বিষয়ে তার নিজস্ব থিয়োরি আছে। সেই থিয়োরি আমাকে বলেছে। 'পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড বা লাস্ট হওয়াটা একটা আপেক্ষিক বিষয়। এটা নির্ভর করে বিষয়ের ওপর। ধরা যাক, আমি অঙ্কের ছাত্রী। ভাল অঙ্ক পারি। স্বাভাবিক ভাবেই, আমি অঙ্ক পরীক্ষায় ভাল ফল করব। কিন্তু পরীক্ষা যদি অঙ্ক বিষয়ে না হয়ে ভরতনাট্যম বা কথাকলি নাচ বিষয়ে হয়, তখন আমার কী রেজাল্ট হবে? আমি তো নাচের কিছুই জানি না। নাচের একশো হাতের মধ্যে যাই না। তখন হয় আমি নাচের পরীক্ষা অ্যাভয়েড করব, নয় আমি সেই পরীক্ষায় লাস্ট হব। আচ্ছা, অঙ্ক আর নাচের কথা

বাদই দিলাম। আমার দিদিমা ক্লাস এইটের পর আর লেখাপড়া করেননি। স্কুল ড্রপ। বিয়ে হয়ে গেল। তিনি দারুণ বড়ি বানাতে পারেন। সাদা কাপড়ের ওপর নাক তুলে তুলে যখন বড়ি শুকোতে দেন তখন মনে হয়, ছাদে আলপনা দিয়েছেন। বড়ি দেবার কোনো পরীক্ষা যদি থাকত, তাহলে আমার ক্লাস এইট পাস দিদিমা হতেন ফার্স্ট গার্ল। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙালিরা বড়ি খেতে ভালবাসে, বড়ির ভালমন্দ নিয়ে খুঁতখুঁত করে, দোকান থেকে কেনবার সময় হাজার প্রশ্ন করে, কিন্তু বড়ি দেওয়ার কাজটাকে হতচ্ছেদ্দার চোখে দেখে। পরীক্ষা বা স্বীকৃতির প্রশ্নই ওঠে না। অতএব ফার্স্ট, সেকেন্ড, লাস্ট কোনোটা নিয়েই লাফালাফির কিছু নেই।'

এই মুহূর্তে মেঘলা মানবমনের বিবিধ জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে পড়াশোনা করছে। তার খুব ইচ্ছে, স্বপ্ন নিয়ে গবেষণার জন্য বাইরে যাবে। সত্যি কথা বলতে কী, এই কারণেই মেঘলার সঙ্গে আমি মিশি। স্বপ্ন ভালবাসে এমন বহু মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কিন্তু স্বপ্ন নিয়ে সিরিয়াস কাজ করতে চায় এমন কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার আগে কখনো পরিচয় হয়নি। পঁচিশ বছরের এই হাসিখুশি মেয়েটিকে দেখলে মনেই হয় না সে এই ধরনের জটিল কাজ করতে পারে। সারাদিন এই লাইব্রেরি সেই লাইব্রেরিতে ঘুরে পড়াশোনা করছে। কোনো কোনোদিন হাঁপিয়ে উঠলে আমাকে খবর পাঠায়।

'সাগরদা, একবার আসবেন?'

আমি জিগ্যেস করি, 'কেন?'

'আপনার সঙ্গে অনেকদিন ঝগড়া করিনি। মন কেমন করছে।'

আমি আগ্রহ নিয়ে বলি, 'কার জন্য মন কেমন করছে মেঘলা? আমার জন্য?'

মেঘলা খিলখিল করে হেসে বলে, 'বয়ে গেছে আপনার জন্য মন কেমন করতে। আমি কি পাগল? আমার মন কেমন করছে ঝগড়ার জন্য। দেরি না করে ঠিক তিনটের সময় ইউনিভার্সিটির গেটে চলে আসুন। আপনার সঙ্গে ঠিক এক ঘণ্টা থাকব, এক ঘণ্টাই ঝগড়া করব।'

আমি হেসে বলি, 'ঝগড়ার সাবজেক্ট কিছু ভেবেছ?'

মোবাইলের ওপাশ থেকে মেঘলা উদাসীন গলায় বলে, 'ভেবেছি, তবে বদলাতে পারে। কথা না বাড়িয়ে আপনি চলে আসুন তো।'

আজ মেঘলা আমাকে ডাকেনি। আমি নিজেই তার কাছে যাব। যাব সেদিনের আঁতকে ওঠা স্বপ্নের মানে জানতে। আধা ঘুম আধা জাগরণে এই স্বপ্ন দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। চেয়েছিলাম, স্বপ্ন রিপিট হোক। রাজকন্যা ফিরে আসুক। চোখ খুলে দেখলাম, রাজকন্যা নয়, তক্তাপোশের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জল্লাদ! ছেলেবেলায় রূপকথার বইতে যেমন ছবি দেখেছিলাম। খালি গায়ে কোঁচা মেরে ধুতি পরা, দশাসই চেহারা। মাথায় পাগড়ি। মোটা গোঁফ। কানে ইয়া বড় মাকড়ি। আমি চোখ খুলতেই সে গোঁফ চুমরিয়ে বলল, 'কীরে বেটা এখনো ঘুমোচ্ছিস?'

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, 'স্যার, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।'

জল্লাদ ধমক দিয়ে বলল, 'চেনবার দরকার কী? তোর কাছে একটা জিনিস রাখতে এসেছি।'

আমি থতমত খেয়ে বললাম, 'কী জিনিস স্যার?'

জল্লাদ এক টানে কোমর থেকে তরোয়ালটা বের করল। ঠিক তরোয়াল নয়। অনেকটা খাঁড়ার মতো। ভোরের কম আলোতেও চকচক করছে। আমার তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়। এ কী হল! দেখতে চেয়েছিলাম, নরম সরম রাজকন্যা, তার বদলে স্বপ্নে এল জল্লাদের খাঁড়া!

'হাঁদার মতো তাকিয়ে আছিস কেন? নে ধর। সাবধানে রাখবি। দরকার মতো কাজে লাগাবি। তারপর ধুয়ে-টুয়ে রেখে দিবি যত্ন করে। আমি ফেরত নেব।'

ধুয়ে-টুয়ে। কী ধুয়ে? রক্ত? ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। তক্তাপোশের ওপর হাঁটু গেড়ে, কাঁপা হাতে ভয়ংকর জিনিসটা নিলাম। স্বপ্নটাও গেল ভেঙে।

আমি আজ মেঘলার কাছে জানতে চাইব, স্বপ্নে জল্লাদ দেখার অর্থ কী?

BanglaBook.org

তমালের কথায় আমার সম্বিৎ ফিরল।

'আমার মনে হয়, তুই কাজটা পারবি। ডাউন লেভেলে তোর অনেক চেনা জানা আছে।'

আমি বললাম, 'ডাউন লেভেল মানে!'

তমাল তার দামি চেয়ারের দুলুনি বন্ধ করেছে। বলল, 'ডাউন লেভেল মানে ছোটলোক, চোর ডাকাত, গুণ্ডা মস্তান এইসব।'

অপমানের কথা। গায়ে মাখলাম না। আমি বললাম, 'কাজটা তোর?'

তমাল ঝুঁকে পড়ে বলল, 'না, আমার নয়। আমার পরিচিত একজনের।'

আমি বললাম, 'তোর পরিচিতর কাজ করব কেন?'

তমাল গালে জিব ঠেলে বলল, 'করবি, কারণ টাকা অনেক। কাজটা করতে পারলে আগামী এক বছর আর তোকে আমার কাছে ধার চাইতে আসতে হবে না। এখন বেলা পর্যন্ত ঘুমোস, তখন বিকেল পর্যন্ত ঘুমোবি।'

আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। তমাল এত হেঁয়ালি করছে কেন? গোলমালের কিছু? চোর ডাকাত গুণ্ডা মস্তান চায় কেন? টেবিলের ওপর হাত রেখে বললাম, 'কাজটা কী?'

তমাল ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে আমাকে জানাল, কাজটা কী।

আমি চমকে উঠলাম। ঠাণ্ডা একটা স্রোত আমার শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে গেল নিমেষে! তমালের ঠাণ্ডা ঘরের থেকে সেই ঠাণ্ডা অনেক বেশি ভয়ংকর।

BanglaBook.org

তিন

আলাপের পর থেকেই আমার কৌতূহল ছিল, এই মেয়ের নাম মেঘলা কেন?

নিশ্চয় জন্মের সময় আকাশে মেঘ ছিল। ঘন মেঘ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'বাদল-মেঘে মাদল বাজে গুরুগুরু গগন মাঝে'র মতো কোনো এক মেঘের দিনে জন্ম বলে নাম হয়েছে মেঘ দিয়ে। যদি দিনে জন্ম হত, নাম হত দিবস। রাতে জন্মালে রাত্রি। রোদে জন্মালে রোদ্দুর। যদিও ঘটনা সেরকমটা নয়। মেঘলার কাছেই গল্প শুনেছি, তার জন্ম কাঠফাটা গরমের বৈশাখ মাসে। সেদিন মেঘ বৃষ্টির কোনো বালাই ছিল না। একবারে ভরদুপুর তখন। ঠা ঠা পোড়া রোদ। এইসব সময়ে সাধারণত হবু সন্তানের পিতা টেনশনে নার্সিংহোমে মেটারনিটি ওয়ার্ডের বাইরে পায়চারি করে। মেঘলার বাবা অতিরিক্ত টেনশনের মানুষ। নার্সিংহোমের ভিতরেই থাকতে পারেননি। ছিলেন বাইরের ফুটপাতে। আগুন রোদে একবার এদিক, একবার ওদিক যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছাতা ছিল, কিন্তু খোলবার কথা মনে ছিল না। ভিতর থেকে এসে কেউ একজন খবর দিল, মেয়ে হয়েছে এবং সে হইহই করে কাঁদছে। এত কাঁদছে যে ডাক্তার, নার্সরা সব পালিয়ে গেছে। মেঘলার বাবা খুব খুশি হলেন। গনগনে রোদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরম তৃপ্তিতে তাঁর মনে হল, চারপাশে ছায়া নেমেছে। শীতল, স্নিগ্ধ ছায়া। দিন হয়ে গেছে মেঘলা। তিনি ওই রাস্তাতে দাঁড়িয়েই মেয়ের নাম রাখলেন, মেঘলা।

মেঘলার জন্মের সময় আকাশে রোদ থাকলেও, আজ কিন্তু বেশ মেঘ মেঘ। আমি আর মেঘলা উত্তর কলকাতার পথ দিয়ে হাঁটছি। ঢুকে পড়েছি একটা সরু পথে। একেই বোধহয় 'অলিগলি'র 'অলি' বলে। দুপাশের বাড়িগুলোর মাঝখানে পথ চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে চলেছে।

BanglaBook.org

আমাদের নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নেই। আমরা কোথাও যাচ্ছি না। যখন আর হাঁটতে ভাল লাগবে না, মেঘলা দুম করে হাঁটা বন্ধ করে দেবে। প্রায় কিছু না বলে হয়তো একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়বে। প্রথম দিকটায় হতভম্ব হয়ে যেতাম। এভাবে দুম করে কেউ চলে যায়? না বলে কয়ে? পরে বুঝলাম, মেঘলা এরকমই। মেঘের মতোই। ডাক-টাক দিয়ে আসে বটে, কিন্তু চলে যায় না বলে কয়ে। কড়া রোদে ভেসে যায় চারপাশ। প্রথম দিকে ধাক্কার মতো লাগলেও ধীরে ধীরে এই আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

মেঘলা আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো সাগরদা! হঠাৎ স্বপ্ন নিয়ে পড়লেন কেন?'

'কারণ আছে।'

মেঘলা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী কারণ জানতে পারি?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই পারো। প্রথমে একটা কারণ ছিল। খানিক আগে এক বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম, সেখানে আরেক কারণ বেড়েছে। আমি তোমাকে দুটো কারণই জানাব। তার আগে বল স্বপ্নের কি সত্যি কোনো মানে আছে মেঘলা?'

মেঘলা নীল জিন্‌সের ওপর সাদা শার্ট পরেছে। চামড়ার ব্যাগ কাঁধের ওপর ঝুলিয়েছে ক্রস করে। অন্যদিন ব্যাগ বইতে ঢাউস হয়ে থাকে। আজ সেরকম কিছু লাগছে না। ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ানো চুল ক্লিপ করে আটকানো। পায়ে স্নিকার। তাকে দেখে কে বলবে, এই মেয়ে একজন ভবিষ্যতের স্বপ্ন বিশারদ। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, এক্ষুনি টেনিস খেলতে যাবে। সাধারণত অতিরিক্ত লেখাপড়ার কারণে গবেষিকাদের চোখ খারাপ হয় এবং চশমা থাকে। কালো ফ্রেমের চশমা। সেই চশমা নাকের ওপর নেমে এসে এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি করে। মেঘলার তাও নেই।

মেঘলা বলল, 'আমি তো বলব, স্বপ্ন বলেই কিছু হয় না।'

এই মেয়ে বলে কী! স্বপ্ন বলে কিছু হয় না। তাহলে ও কী নিয়ে পড়াশোনা করবে? যা নেই তা-ই নিয়ে?

আমি বললাম, 'মানে! স্বপ্ন বলে কিছু নেই মানে? কী বলছ মেঘলা?'

মেঘলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'বললাম তো, নেই মানে নেই।'

'তুমি যে ঠিক করেছ স্বপ্ন নিয়ে পড়তে বাইরে যাবে। বিদেশে। একটা নেই জিনিস নিয়ে পড়তে বাইরে চলে যাবে?'

মেঘলা হেসে বলল, 'সেটাই তো বেশি ইন্টারেস্টিং। যেকোনো কাজই তো নেই থেকে শুরু হয়। যাকে বলা হয় ফ্রম জিরো। আমিও তা-ই করব ভেবেছি। নেই ধরে এগোব। এগোতে এগোতে একটা সময় অনেক কিছু পেয়ে যাব। কেমন হবে? মজার না?'

আমি খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। বললাম, 'ও তাহলে হেঁয়ালি করছিলে বল। তুমি খুব ভাল করেই জানো স্বপ্ন অবশ্যই আছে। আমরা সকলেই স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন ছাড়া দুনিয়া অচল।'

মেঘলা বলল, 'আমি আপনি তো কোন ছার। বড় বড় দার্শনিকরাও তা-ই জানতেন। সক্রেটিস বলেছেন, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আদেশ পাঠান। ভবিষ্যতের নির্দেশ। স্বপ্ন আসলে দৈববাণী। আকাশ থেকে ভেসে আসা কথা। আবার দেখুন প্লেটোর মত ছিল, স্বপ্ন দিয়ে মানুষ তার আত্মার উন্মোচন ঘটায়। ঠিক আত্মা নয়, আত্মার মধ্যে যে নানা ধরনের রহস্য আছে তার প্রকাশ। জীবনের মূল সত্য জানা যায়।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'এই থিয়োরিটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে মেঘলা। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আমি মাঝেমধ্যেই গাধার স্বপ্ন দেখি। হেলতে দুলতে চলেছে। অতি নিশ্চিন্ত হাবভাব। আমি আমার জীবনের মূল সত্য বুঝতে পারি।'

মেঘলা দিদিমণিদের মতো কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠাট্টা তামাশা বন্ধ করে মন দিয়ে শুনুন। আমি লেকচার দেবার মুডে এসেছি।'

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'সরি। আমি তো আজ শোনবার জন্যই তোমার কাছে এসেছি।'

'আবার দেখুন, দার্শনিক ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন, মস্তিষ্কের কর্মতৎপরতার অভিব্যক্তিই হল স্বপ্ন। অ্যাকটিভিটিসের আউটকাম বলতে পারেন। ঘুমের মধ্যে আমাদের সব ইন্দ্রিয় থাকে থম মেরে। নিষ্ক্রিয় হয়ে। যাকে বলে নো ওয়ার্ক। মাথার কাজকর্মও সব বন্ধ হয়ে

BanglaBook.org

যায় তখন। কিন্তু সব কি বন্ধ হয়ে যায়? মোটেই না। কিছু কিছু কাজ অটোমেটিক চলতে থাকে। আর তাতে মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি, ভাবনাও কিছু কিছু থাকে। ফলে বাড়াবাড়িও ঘটে। মানুষ উদ্ভট উদ্ভট স্বপ্ন দেখে। যেমন আপনি দেখছেন গাধা।'

আমি বললাম, 'গাধা দেখা কোনো উদ্ভট স্বপ্ন হল!'

মেখলা বলল, 'গাধা উদ্ভট নয়, আপনার দেখাটা উদ্ভট। আপনি আপনার জীবনের সত্য বুঝতে গিয়ে যদি গাধা দেখেন তাহলে সেটা ভুল। কোনো গাধাই আপনার মতো বেকার বা অলস নয়। তাহলে "গাধার খাটুনি" কথাটা ডিকশনারিতে থাকত না। যাক থিয়োরিতে আসুন। স্বপ্ন সম্পর্কে হিপোক্রেটিসও মত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, স্বপ্ন আর কিছুই নয়, মস্তিষ্কের ক্রিয়া। অ্যারিস্টট্‌ল বলেছিলেন, আমরা জেগে থাকার সময় ইন্দ্রিয়ে এবং অনুভূতিতে যা গ্রহণ করি স্বপ্ন তারই খানিকটা প্রতিধ্বনি। স্বপ্নের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা বা অলৌকিকতা নেই। স্বপ্ন স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক ঘটনা।'

আমি বললাম, 'বাপরে এ তো বিরাট ব্যাপার! এত বড় বড় মানুষ স্বপ্ন নিয়ে ভেবেছেন?'

মেখলা সুন্দর হাসল। যেন স্বপ্নে পাওয়া হাসি। বলল, 'আপনিও বড়মানুষ। আপনিও ভেবেছেন।'

কলকাতার গলি বেনারসের গলির মতো নয়। বেনারসের গলিতে দুজন পাশাপাশি যাওয়াও কঠিন। শুনেছি, ওখানে এমন গলিও আছে যেখানে সোজা হাঁটা যায় না, পাশ ফিরে হাঁটতে হয়। মাস কয়েক হল এক বেসরকারি শিক্ষা কোম্পানি, কাশীর গলিতে হাঁটবার কোর্স খুলেছে। ওদের অফিস দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে, একটু এগিয়ে বাঁ দিকে। তিনদিনের ক্র্যাশ কোর্স। কীভাবে মানুষ, ঠেলা, ষাঁড়, জর্দা, কচুরি, ম্যানেজ করে পৃথিবীর সংকীর্ণতম শহুরে পথ দিয়ে চলতে হবে তার প্রশিক্ষণ। প্র্যাকটিক্যাল, থিয়োরিটিক্যাল্‌ দুধরনের ক্লাসই ওরা নেয়। মধ্যে একদিন নাইট ট্রেনিং। কোর্স শেষে সার্টিফিকেটের বন্দোবস্ত রয়েছে। সার্টিফিকেটের কোনায় রয়েছে ষাঁড়ের ফটো। ষাঁড়ের কপালে সিঁদুরের টিপ। ষাঁড়ের ফটো কেন এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু শিক্ষা কোম্পানির মালিক জানিয়েছেন,

BanglaBook.org

গলিতে হাঁটা কোর্স চালুর প্রেরণা তিনি পেয়েছেন, মহামান্য পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় মহাশয়ের সৃষ্টি থেকে। তাঁর 'জয়বাবা ফেলুনাথ' সিনেমায় জটায়ু চরিত্রের কাশীর গলিতে ষাঁড়জয় করে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য তাঁকে উৎসাহিত করে। এই কোর্সের খবর সত্যি না মিথ্যে বলতে পারব না। আমি নিজে তো যাইনি। তাছাড়া সাগর সাংবাদিক নয়। সাংবাদিকদের সব সত্যি খবর লিখতে হয়। আমার সে-দায় নেই। যা শুনেছি, তা-ই বললাম। তবে কাশীর গলি জগৎবিখ্যাত। আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন বিদেশের ছবি তোলবার জন্য হাঁকপাঁক করে, বিদেশিরা তখন ক্যামেরা বাগিয়ে ছুটে আসছে কাশীর অলিগলির ছবি তুলতে। তবে কলকাতার গলিও কম কিছু নয়। এখানে পাশাপাশি দু-তিনজনে দিব্যি হাঁটতে পারে। মাঝেমধ্যে এর বাড়ি ওর বাড়ির রোয়াক টপকানোর মজা আছে। ব্লাইন্ড গলিতে ঢুকলে আবার ফিরে আসতে হয়। কাশীর গলিতে পায়ে পায়ে ইতিহাস, ধর্ম, জর্দা, কচুরি, শোনহালুয়া। কলকাতার গলিতে রাজনীতি, প্রেম, ফুটবল, ক্রিকেট, ছাদে ছাদে বাটি চচ্চড়ির লেনদেন। রাজনীতি করতে গিয়ে কত ছেলেকে যে অলিগলিতে পুলিশের গুলি খেতে হয়েছে তার হিসেব নেই। দুর্ভাগ্য, আমাদের পণ্ডিতরা দুনিয়াদারির অনেক বড় বড় রাজপথ নিয়ে কাজ করেছেন, কলকাতার অলিগলির ইতিহাস নিয়ে কাজ করবার সময় পাননি। যেহেতু আমি পণ্ডিত নই, আমার সবসময়েই কলকাতার অলিগলি দিয়ে হাঁটতে গা ছমছম করে। আজও করছে। আমি মেঘলার একেবারে পাশে চলে এলাম।

মেঘলা সিরিয়াসভাবে বলতে শুরু করল।

'স্বপ্ন আপনি ইচ্ছেমতো দেখতে পারেন না, স্বপ্ন দেখা না দেখা নির্ভর করে ঘুমের গভীরতার ওপর। ঘুম যত অগভীর, স্বপ্ন দেখবার সম্ভাবনা তত বেশি। পাভলভ কে জানেন?'

'অল্প জানি। ইভান পেত্রভিচ পাভলভ। দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের একজন। মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোরোগবিজ্ঞানে দু-তিনজন এক নম্বরের একজন। মনুষ্যজাতি অভাগা বলে, দেয়ালে শুধুই রাজনৈতিক নেতাদের ফটো ঝোলায়। বিজ্ঞানীদের ফটো থাকে না।'

BanglaBook.org

মেঘলা বলল, 'গুড। অনেকটাই জানেন। ভেবেছিলাম, পাভলভ ইনস্টিটিউটের কথা ছাড়া আর কিছু বলতে পারবেন না। এই ভদ্রলোক বলেছিলেন, মস্তিষ্কের ওপর বাইরের জগৎ আর শরীরের ভিতরকার কলকবজার প্রভাব থাকে। তাদের উদ্দীপনাই স্বপ্ন। স্বপ্ন পুরোপুরি মনের বিষয়। খাঁটি বাংলায় মননক্রিয়াও বলতে পারেন। কঠিন বাংলা হল? হোক। সবসময় সাগর টাইপ মাগুর মাছের ঝোলের মতো ট্যালট্যালে বাংলা বলতে হবে এমন কোনো মানে নেই। তাই না?'

আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, 'অবশ্যই। তুমি চালে মেশানো কাঁকর টাইপ বাংলায় কথা বল মেঘলা, যাতে আজ সন্ধের মধ্যেই দুটো দাঁত পড়ে যায়।'

মেঘলা আমার ফাজলামিকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'সেই অর্থে মস্তিষ্ক যদি পুরোপুরি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে মন কাজ করবে কী করে? সেও ইনঅ্যাকটিভ, নিস্তেজ হয়ে পড়বে। গভীর ঘুমে স্বপ্নও দেখা হবে না। বুঝলেন সাগরবাবু?'

আমি বললাম, 'বাপরে! স্বপ্নের পিছনে এত থিয়োরি!'

'শুধু থিয়োরি নয়, প্র্যাকটিসও আছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর, নাথানিয়েল ক্লাইম্যাট নাম, বললেন স্বপ্ন নিয়ে শুধু ভাবের ঘরে থাকলে চলবে না। অনেক ফিলজফি হয়েছে, অনেক অনুমান হয়েছে, এবার যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। যে যন্ত্র দিয়ে স্বপ্নের খুঁটিনাটি জানতে কাজ শুরু হয়েছিল, তার নাম বার্জার ইলেকট্রো-এনসেফালাগ্রাম। যন্ত্রটা সম্পর্কে একটু শুনবেন নাকি?'

আমি উত্তেজনা বোধ করছি। তাহলে স্বপ্নযন্ত্র আছে! আরে! আমিও তো একটা যন্ত্রের কথাই ভেবেছিলাম! যেটায় রেকর্ডারের মতো ভাল ভাল স্বপ্নগুলো রেকর্ড করে রাখবে। সত্যি কথা বলতে কী যে দুটো কারণে আজ মেঘলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তার একটা ওই রেকর্ডারের সন্ধান। উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'অবশ্যই শুনব।'

মেঘলা বলল, 'এই স্বপ্নযন্ত্র বানিয়েছিলেন জার্মানির এক স্নায়ুতন্ত্রের অধ্যাপক। নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। হন্সি দিয়ে শুরু। যাক যন্ত্রটি কাজ করে ল্যাবরেটরিতে। সেখানে মানুষকে ঘুম

BanglaBook.org

পাড়িয়ে মাথার ভিতরের তরঙ্গের মাপজোক করে। এই মেশিন মাথার তরঙ্গগুলোকে দশ লক্ষ গুণ বাড়িয়েও দিতে পারে। তারপর একটা পেনসিল দিয়ে গ্রাফপেপারের ওপর তরঙ্গ কেমন করে কাঁপছে সেই ছবি এঁকে দেয়। গ্রাফ তো আপনি জানেন। ছোটবেলায় জ্যামিতি পড়েছেন।'

কয়েক পা চুপ করে হাঁটলাম। খানিকটা অন্যমনস্ক গলায় বললাম, 'মেঘলা, আমিও একটা স্বপ্নযন্ত্রের কথা ভাবছিলাম। ইনফ্যাক্ট সে-ব্যাপারে কথা বলতেই আজ তোমার কাছে এসেছি।'

মেঘলা আমার দিকে ফিরল। কৌতুক ভরা চোখে বলল, 'স্বপ্নযন্ত্র! মানে? টাইম মেশিনের মতো ড্রিম মেশিন?'

আমি বললাম, 'আমি ঠিক জানি না, খানিকটা হয়তো তাই। মোদ্দা কথা হল, মেশিনে আমাদের স্বপ্নগুলো ধরা থাকবে। যখন ইচ্ছে হবে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্বপ্নগুলো দেখব। যেভাবে গান শুনি, সিনেমা দেখি। এরকম কোনো যন্ত্র হয় না?'

মেঘলা হেসে বলল, 'আপনার সেই বিখ্যাত মনফোনের মতো? যে ফোন দিয়ে মনে মনে সবার সঙ্গে কথা বলা যায়?'

আমি বললাম, 'হয়তো।'

মেঘলা খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'ভবিষ্যতে কখনো হবে না বলতে পারছি না, হয়তো ক্লাইটম্যানের মতো কোনো বিজ্ঞানী দুম করে একটা যন্ত্র বানিয়ে ফেলবেন। শব্দ বা ছবি ধরবার আগে কেউ কি ভেবেছিল এমন ব্যবস্থা হবে? সাউন্ড রেকর্ডার বা ক্যামেরার কথা কে জানত? বিজ্ঞানে এটাই মজা। যেটা একসময়ে উন্মাদের চিন্তা বলে সবাই ভাবে, সেটাই পরে সত্যি হল। আপনার ওই যন্ত্রও হয়তো হবে।'

আমি জানতাম মেঘলা আমার কথা সিরিয়াসভাবে নেবে। পারলে আশার আলো দেখাবে। যাদের সত্যিকারের লেখাপড়া থাকে তারা কখনো অপরের কল্পনাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে না। সত্যিকারের লেখাপড়ার সঙ্গে 'লোকদেখানো লেখাপড়া'র অনেক পার্থক্য। স্বপ্ন রেকর্ডের কথা যদি আমি কোনো 'লোক দেখানো লেখাপড়া জানা'কে বলতে যেতাম আমাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিত।

BanglaBook.org

মেঘলা আমার গায়ে আলতো হাত রেখে অল্প হাসল। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'যদি আমি কোনোদিন স্বপ্ন ধরে রাখবার যন্ত্র তৈরি করতে পারি, তাহলে তার নাম দেব, সাগরস্বপ্ন। সেই যন্ত্র শুধু স্বপ্ন ধরে রাখবে না, সাগরের মতো স্বপ্ন দেখাতেও শেখাবে। রাজি?'

এই ভারি ভারি কথার কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘলা এমন একটা কাজ করে বসল যে আমার মনে হল আমি স্বপ্ন দেখছি। দিবাস্বপ্ন। না, দিবা নয়, বৈকালিকস্বপ্ন। যে স্বপ্ন বিকেলে দেখা যায় তাকে বৈকালিক স্বপ্ন বলা যায় না?

BanglaBook.org

চার

এবার সেই বৈকালিক স্বপ্নের কথা বলি। মেঘলার সঙ্গে আরো বেশ কয়েকটা গলিপথ পেরিয়ে থমকে গেলাম। সামনে বাধা।

শুনশান সরু গলির মধ্যে হাতে-টানা একটা রিকশা। চলন্ত নয়, দাঁড়ন্ত। পুরো পথটা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা কাশীর গলির ষাঁড়ের মতো। এবার এগোতে গেলে দুটো বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে, রিকশার হাতল টপকে, শিকের খোঁচা বাঁচিয়ে এগোতে হবে। কী করব? মেঘলা আর আমি মুখ চাওয়াচায়ি করলাম। চালক কোথায়! মাঝপথে গাড়ি রেখে বেটা পালাল কোথায়? কারো বাড়িতে ভাড়া নিতে ঢুকেছে নিশ্চয়। মালপত্র নামিয়ে দিতে গেছে হয়তো। আমি এপাশ ওপাশ তাকালাম। কোন বাড়িতে সেঁধাল? এই ভাঙা মেঘ মেঘ দুপুরে আশপাশের সব দরজা তো বন্ধ। তাহলে? আমি হাঁক দিতে যাব, মেঘলা আমার হাত চেপে ধরল। মুখ সরিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল, 'ওই যে দেখুন।' আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি পাশের রোয়াকে লুঙ্গি, গেঞ্জিপরা রিকশাচালক মহা আরামে ঘুমোচ্ছে। না, একে ঘুম বলা ঠিক হবে না। বলা উচিত গভীর নিদ্রামগ্ন। গামছার অর্ধেকটা মাথার তলায়, অর্ধেকটা মুখের ওপর চাপা দেওয়া।

BanglaBook.org

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, 'দেখেছ কাণ্ড! মাঝপথে গাড়ি ফেলে রেখে, পথ আটকে, বেটা নাক ডাকাচ্ছে! চিন্তা কোরো না, ঘাড় ধরে টেনে তুলছি।'

আমি ঘুমন্ত রিকশাচালকের দিকে দু-পা এগোতেই মেঘলা আমার গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করল। ঠোঁটে হাত দিয়ে চুপ করতেও বলল। আমি অবাক হয়ে ভুরু তুললাম। ব্যাপারটা কী! আটকাল কেন! তবে ওই লোককে কি ও-ই নিজে ঘুম ভাঙিয়ে তুলবে? মনে হয় কান ধরে তুলবে। একে বলে 'কান মেডিসিন'। এই

'মেডিসিন' সাধারণত ভাল কাজ করে। এই রিকশাচালকটির বেলাতেও নিশ্চয় করবে। এরা কলকাতা শহরটাকে মগের মুলুক পেয়েছে। আমি উচিত শিক্ষার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠলাম। মেঘলা ঠাণ্ডাভাবে কাঁধ থেকে ব্যাগ খুলল। বাড়িয়ে দিল আমায়। মারবে নাকি?

না, তারপরেই সেই ভয়ংকর কাণ্ডটা ঘটাল!

গায়ের ওপর হুমড়ি খাওয়া বাড়ির নোনাধরা দেয়াল ঘেঁষে, রিকশার হাতল টপকে, লোহার শিকের খোঁচা বাঁচিয়ে মনস্তত্ত্বের গবেষিকা চলে গেল সামনে। গিয়ে দাঁড়াল রিকশার দুই হাতলের মাঝখানে। ওস্তাদ চালকের মতো নীচু হয়ে গাড়ি টেনে তুলল। তারপর মুহূর্তখানেক নিজেকে সামলে টালমাটালভাবে দিব্যি এগিয়ে গেল কয়েক পা। আমাকে স্তম্ভিত করে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল মেঘলা। গর্বের হাসি। যেন রিকশা চালাচ্ছে না, পাহাড়ের শিখর জয় করেছে। বড় বড় চাকা ঘুরিয়ে গড়গড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল। ভাগ্যিস গলি ফাঁকা। লোকজন নেই। কেউ দেখলে নির্ঘাত শকের মতো লাগত। কলকাতার প্রথম এবং একমাত্র জিন্স শার্ট পরা মেয়ে রিকশাচালককে দেখা কি ধাক্কা নয়! মেঘলা এগিয়ে চলেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে অনেকটা ব্যালান্সও আয়ত্ত করে ফেলেছে। রিকশা এখন আর ততটা টাল খাচ্ছে না। কোথায় চলেছে? যাক, যেখানে খুশি যাক। আমি মুগ্ধ, বাক্যহারা। কে বলবে, এই মেয়েই ক-দিন পরে মিনেসোটা ধরনের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বপ্ন বিষয়ে ডক্টরেট উপাধি পাবে?

কে বলে মেয়েরা 'সব পারে না?' কোন 'শালা' বলে?

'বাবু, এ কেয়া হো রহা হ্যায়?'

রোয়াকের ওপর উঠে বসেছে রিকশাচালক। চোখ কপালে তুলে সুন্দরীর রিকশা চালনা দেখছে আর হায় হায় করছে। আমি তাকে ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেললাম। গামছা মাথার রিকশা চালক হাসি দেখে প্রায় কেঁদে ফেলল। আবার বলল, 'কেয়া হো রহা হ্যায় বাবু! দিদি, রিকশা কাঁহা লে যাতা হ্যায়?'

জবাব না দিয়ে আমি এবারও মুচকি হাসলাম। জবাবই বা কী

BanglaBook.org

দেব? আমি কি ছাই জানি মেঘলা কোথায় যাচ্ছে? জানতেও চাইছি না। আমি নারীশক্তিতে মুগ্ধ হচ্ছি। একেই বলে কলকাতার গলি। আহা, আজ গলিতে না ঢুকলে কি এমন ঘটনার সাক্ষী হতাম?

সত্যি মেঘলা গলি ধরে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। মতলব কী? বড়রাস্তায় চালাবে নাকি? দারুণ হবে। আমি উত্তেজনা বোধ করছি। ফট করে যদি কোনো সওয়ারি তুলে বসে? ঘণ্টি বাজিয়ে বাগবাজার বা আহিরিটোলার দিকে রওনা দেয়? ইস, আমার কাছে যদি ক্যামেরা থাকত...ভালই হয়েছে। সাগরের কাছে ক্যামেরা মানায় না।

রিকশাচালক লুঙ্গি সামলে রোয়াকের ওপর উঠে দাঁড়াল। দুহাত সামনে তাক করে বলল, 'দিদিকো রোকিয়ে। রোকিয়ে।'

আমি দুপাশে ঘাড় নাড়িয়ে মধুর হেসে বললাম, 'ঘাবড়াও মত ভাই। ইয়ে সচ নেহি হ্যায়। ইয়ে খোয়াব হ্যায়। খোয়াব সমঝতা? ড্রিম।'

দূর থেকেই দেখতে পেলাম এক সুবেশা মহিলা গলি দিয়ে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন। মহিলার কাঁধে কায়দা করা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। তিনি হাঁ হয়ে তাকিয়ে আছেন সুন্দরী রিকশাচালকের দিকে। বেশিক্ষণ নয়, পুরো এক মিনিটও হবে না, তারপরই মাথা নামিয়ে হাঁটা লাগালেন দ্রুত। পালালেন বলাই ভাল। মেঘলাকে নিশ্চয় মানসিকভাবে অসুস্থ ভেবেছেন। আমার গলা ফাটিয়ে, না না গলা নয়, গলি ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে করছে।

মেঘলা রিকশা ঘুরিয়ে ফিরে আসছে। যথেষ্ট সাবলীল ভঙ্গি। গোড়ার জড়তা কয়েক মিনিটেই কেটে গেছে! কে বলবে, এই মেয়ে আজ প্রথম...হাতের কালো হয়ে যাওয়া ঘণ্টি দিয়ে হাতলে দুবার ঘা মারল। পাকাপোক্ত আওয়াজ না হলেও, রিকশার ঘণ্টি বোঝা যায়। মেঘলার মুখে একইসঙ্গে হাসি এবং মেঘ বিকেলের মায়াবি আলো। মায়ার মতোই লাগছে, আমি এগিয়ে গেলাম। ইস, হাতে একটা ফুলের তোড়া থাকলে এই নাটকীয় মুহূর্ত পূর্ণ হত। 'হাই হাই' চিৎকারে আমাকে ধাক্কা মেরে ছুটে গেল চালক। মেঘলা গলির পাশ ঘেঁষে সযত্নে রিকশা নামাল। 'এ আর এমন কী?' ভঙ্গিতে হাত ঝাড়তে লাগল। আর তখনই শুনতে পেলাম কচিহাতের করতালির শব্দ।

BanglaBook.org

চমকে মুখ তুলি। বাঁ পাশের তিনতলার বারান্দায় ফ্রক আর হাফ প্যান্ট পরা এক জোড়া বিচ্ছু 'খিল খিল' আওয়াজে হাসছে আর চটাপট হাততালি দিচ্ছে। মেঘলা ডান হাত তুলে নাড়ল। যেন অলিম্পিকে সোনা জিতে এইমাত্র দেশে ফিরেছে!

রিকশা চড়লে ভাড়া দেওয়ার নিয়ম, মেঘলা চালককে দশটা টাকা দিল। রিকশা চালানোর ভাড়া। বেচারি এমনিতেই এত ঘাবড়ে ছিল যে অকারণে টাকা পেয়েও ঘাবড়াতে ভুলে গিয়েছিল।

'আমি যদি টিভি সাংবাদিক হতাম এখনই তোমার একটা ইন্টারভিউ নিতাম মেঘলা।'

মেঘলা ছদ্ম অবাক হয়ে বলল, 'সত্যি? কী প্রশ্ন করতেন?'

আমি অদৃশ্য মাইক্রোফোন এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'কলকাতার রাস্তায় রিকশা চালিয়ে আপনার কেমন লাগল?'

মেঘলা পাকা অভিনেত্রীর মতো হাত দিয়ে কপালে ঝুঁকে পড়া চুল কানের পাশে তুলে বলল, 'খুবই ভাল। ছোটবেলা থেকেই আমার রিকশাচালক হবার শখ। হাতে-টানা রিকশা। মানুষ হয়ে মানুষকে বইতে কেমন লাগে জানবার বিষয়ে আমি কৌতূহলী ছিলাম। আশাকরি খুব শীঘ্রই আমার কৌতূহল পূর্ণ হবে।'

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, 'চলো এগোই। চা খেতে ইচ্ছে করছে।'

আমরা মহাজাতি সদনের পাশের গলিতে ফুটপাথের ওপর বসে চা খাচ্ছি। বড় দোকান। কাস্টমারকে চা দেওয়ার নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। কাচের কাপ, কাগজের গ্লাস, মাটির ভাঁড়। আমরা মাটির ভাঁড় বেছেছি।

আমার হাতে ভাঁড়। চা শেষ হয়ে গেলেও ভাঁড় ফেলতে ভুলে গেছি। আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। কালবৈশাখী হবে মনে হয়। হলে ভাল। গুমোট গরম কিছুটা কাটবে। কুটিকুটি সাইজের ক-টা বাচ্চা মেয়ে সেজেগুজে চলেছে। সাজগোজ মানে এমনি সাজগোজ নয়, ফাংশনের জন্য সাজগোজ। পায়ে ঘুঙুর বাজছে। লাল হলুদ শাড়ি গাছকোমর করে পরা। মুখে গাদাখানেক করে পাউডার, লিপস্টিক, চন্দনের টিপ। চুলে কাগজের ফুল। নিশ্চয় মহাজাতি সদনে পঁচিশে

BanglaBook.org

বৈশাখ জাতীয় কোনো প্রোগ্রাম। ঘুঙুরে ঝমঝম করে আওয়াজ হচ্ছে। সেই আওয়াজকে ছাপিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাগুলোর হাসি। সেজেগুজে খুব মজা পেয়েছে। মেঘলা চিৎকার করে বলল, 'অ্যাই, তোরা আজ কী নাচবি?' সাত আট বছরের একটা মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে মেঘলার দিকে তাকাল, তারপর ভেংচি দিল। সবাই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। আমিও হাসলাম। মেঘলা চিৎকার করে বলল, 'কবিগুরু রবিঠাকুরের ভেংচি নৃত্য নাচবি বুঝি? হি হি।'

আমি বেঞ্চ ধরে মেঘলার দিকে এগিয়ে গেলাম। এখন কলকাতা শহর অনেক আধুনিক হয়েছে। শার্ট প্যান্ট পরা মেয়েরা পথের ধারের চায়ের দোকানে বসে থাকলে কেউ ঘুরেও তাকায় না। জিনস্ শার্ট তো জলভাত। আমি সরে আসতেই মেঘলা উঠে দাঁড়াল। চায়ের দাম মেটালাম। আমার কাছে দশ টাকা পড়ে রইল। কাল দুপুরের মধ্যে কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করতে না পারলে সমস্যা। তিন জায়গায় ধার। টিউশন বাড়ি থেকে কাল মাইনে পাবার কথা ছিল। ছাত্রীর মা এসে কাঁচুমাচু গলায় জানালেন, 'হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় টুনি অঙ্কে সতেরো পাওয়ার কারণে টুনির অঙ্ক স্যার দুম করে তিনশো টাকা বেতন বাড়িয়ে নিয়েছেন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী! স্টুডেন্ট কম নম্বর পেলে টিউটর মাইনে বাড়াবে কেন! বরং লজ্জা পাওয়ার কথা।'

টুনির মা হেসে বলল, 'কী যে বলেন মাস্টারমশাই, পরীক্ষা তো টুনির অঙ্ক টিউটর দেয়নি, টুনি দিয়েছিল। সে যদি মাস্টারের পড়া না বুঝতে পারে মাস্টারের কী দোষ?'

আমি আরো অবাক হয়ে বললাম, 'দোষ নয়! আলবাত দোষ। মাস্টারমশাই তো ছাত্রছাত্রীকে শিখিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।'

টুনির মা আমার দিকে করুণার চোখে তাকিয়ে বলল, 'পুরোনো দিনের কথা বলছেন মাস্টারমশাই। রামায়ণ মহাভারতের আমলে ওসব হত। এখন ছাত্রছাত্রীদের নিজেদেরই শিখে বুঝে নিতে হয়। তাছাড়া...তাছাড়া অঙ্কের এই মাস্টারের নাম কি আপনি জানেন?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'না তো। কে উনি?'

টুনির মা উজ্জ্বল মুখে বলল, 'উনি সি কে পি।'

'সি কে পি! তিনি কে? ইউনিভার্সিটির ভিসি-টিসি কেউ?'

টুনির মা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী যে বলেন! ইউনিভার্সিটির মাস্টার হতে যাবেন কেন? সি কে পি শুধুই প্রাইভেটে পড়ান। ওঁর কাছে ছেলেমেয়েকে পড়ানোর জন্য বাবা মায়েদের পাগলপারা অবস্থা। ভর্তির জন্য ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে বাড়ির সামনে লাইন পড়ে। পাড়ার ছেলেরা সেই লাইন মেইনটেইন করে। ওই সকালে ঝালমুড়ি বিক্রি হয়।'

আমি ঢোক গিলে বললাম, 'নিশ্চয় সিকেপি না টিকেজির কাছে অঙ্ক শিখলে ছেলেমেয়েদের রেজাল্ট ভাল হয়।'

টুনির মা আবার কাঁচুমাচু মুখে ফিরে গেল। বলল, 'ভাল যে হবেই এমনটা বলা যায় না। খারাপও হতে পারে। খারাপ হলে মাইনে বাড়াতে হয়। নইলে উনি তাড়িয়ে দেন। বলেন, খারাপ ছেলেমেয়ে রেখে নিজের নাম ডোবাব না। হয় টিউশন ফিজ বাড়াও, নয় কেটে পড় বাপু। অনেকে হাজার, দুহাজার টাকা বাড়িয়েও সিকেপির কাছে ছেলেমেয়েকে রেখে দিয়েছে। সিকেপির কাছে ছেলেমেয়ে পড়ানো একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। পড়াটাই তো জীবনের সব নয়, প্রেস্টিজটাও তো দেখতে হবে। বলুন মাস্টারমশাই, দেখতে হবে কিনা?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

টুনির মা আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আচ্ছা মাস্টারমশাই, বাংলা হল মাতৃভাষা, ইংরেজি বিদেশি ভাষা তাহলে অঙ্কটা কোন ভাষা হল?'

আমি সামান্য হেসে বললাম, 'মনে হয় মঙ্গলগ্রহের। চিন্তা করবেন না, আগে মঙ্গলগ্রহের মাইনে ক্লিয়ার করুন।'

যাই হোক, সিকেপি না টিকেজির কল্যাণে আমার পকেট ফাঁকা। মেঘলা শান্ত গলায় বলল, 'সমস্যা কী সাগরদা? কোন স্বপ্ন ধরে রাখতে চান?'

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কোথাও ঝড় শুরু হয়ে গেছে। সন্ধে নামছে। যেটুকু আলো আছে মনে হয় ঝড়ের জন্য অপেক্ষা করছে। ঝড়ের সঙ্গে দেখা করে চলে যাবে। মেঘলার কথায় আমি একটু লজ্জা

BanglaBook.org

পেলাম। মেয়েদের কাছে অন্য মেয়েদের কথা বলতে নেই। বললাম, 'সে আছে একটা।'

আকর্ষণীয় হলেও ছিপছিপে মেঘলার গায়ের রং ফর্সা নয়। একে কী বলে? শ্যামলা? ফর্সা নয় বলেই বেশি ভাল। ঝোড়ো হাওয়ায় চুল উড়ছে। মেঘলা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমিও হেসে বললাম, 'এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন।'

মেঘলা বলল, 'কী?'

আমি বললাম, 'স্বপ্নের কি কোনো মানে হয়?'

'হয় না বলাই উচিত।'

ঝড় শুরু হয়েছে। গমগম আওয়াজ হচ্ছে। আমি চোখ সরিয়ে বললাম, 'সেদিন ঘুমের মধ্যে একজন রাজকন্যাকে দেখতে চেয়েছিলাম; দেখলাম এক জল্লাদকে। হাতে তরোয়াল। এর মানে কী?'

মেঘলা থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ডান হাত দিয়ে আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'এর মানে রাজকন্যাকে ফের দেখতে চাইলে ঘ্যাঁচ করে আপনার মুণ্ডু কাটা হবে। হি হি।'

ধুলো উড়িয়ে, আঁধার জড়িয়ে হুড়মুড়িয়ে ঝড় উঠল। মেঘলা তার স্বভাবসিদ্ধ আচরণ মতো আমাকে একটি কথাও না বলে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামল। হেডলাইট জ্বলা গাড়ির ফাঁকফোকর দিয়ে, ধুলো ওড়া পথে হেঁটে গেল উলটো দিকে। আমি ডাকতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। মেঘলা ঠিক বলেনি। স্বপ্নে অস্ত্র হাতে জল্লাদ আসবার কারণ আছে। পরদিনই তমাল আমাকে তার অফিসে ডেকে যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিতে চেয়েছে সেটা একটা খুনের। কায়দা করে যাকে বলে মার্ডার। আমার ধারণা ওই স্বপ্ন ছিল তারই ইঙ্গিত।

সাগর কি তবে এবার খুন করবে?

পাঁচ

তমালের খুনের বরাত নিয়ে পাকা কথা বলার মাঝখানেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সেই কাণ্ডে আমি জড়িয়ে পড়লাম। যদিও না জড়ালেও দিব্যি চলে যেত। সাগর হয়ে জন্মানোর এটাই অসুবিধে। যা 'দিব্যি চলে যায়' তার বেশিটাই মানা হয়ে ওঠে না।

যাইহোক ঘটনাটা বলি—

সেদিন পুঁটিকুমার আমার সামনে ভাতের থালাটা খটাস করে নামিয়ে লম্বা করে নাক টানল।

এগারো বছরের পুঁটিকুমার সবসময়েই নাক টানে। তার বারোমাসই সর্দি। এই কারণে তার আরেকটা নাম হল সর্দিকুমার। অবশ্য পুঁটিকুমার বা সর্দিকুমার কোনোটাই এই ছেলের ওরিজিনাল নাম নয়। ওরিজিনাল নাম কান্তি। রেস্টুরেন্টে বয় বেয়ারার এই কাজ পাওয়ার পর সে নতুন নাম পেয়েছে। এই রেস্টুরেন্টে এরকমই নিয়ম। যারা কাজ করতে আসে তারা একটা করে নতুন নাম পায়। কর্মচারীরা সবাই মিলে এই কাণ্ড করে। বলতে লজ্জা করছে, গত কয়েক বছর হল নামকরণের গুরুদায়িত্ব আমার ঘাড়ে পড়েছে। কী ঝামেলা! আমি কি এদের কর্মচারী? একেবারেই না। আমি এদের খদ্দের। কাস্টমার। তাও জেন্টলম্যান কাস্টমার নয়, ধারবাকির কাস্টমার। তবু এখানকার কর্মচারীরা আমাকে পছন্দ করে। সম্ভবত ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশার কারণে। কে জানে। জেনে বিশেষ লাভও নেই। অর্থনীতির নানান ধরনের মডেল আছে। কেইনস মডেল, মার্কস্ মডেল, সেনস মডেল। কিন্তু ভালবাসার ব্যাপারে কোনো মডেল নেই। কে কেন ভালবাসে বোঝা দুরূহ। আমার বিশ্বাস একটা দিন আসবে যখন, নিশ্চয় এই বিষয়েও ফর্মুলা তৈরি হবে। সেই ফর্মুলাতে লাগিয়ে বুঝতে পারব রাঁধুনি, জোগানদার, বয় বেয়ারা, বাজারসরকার,

BanglaBook.org

গ্যাস সাপ্লাইয়ের ছেলে, সাফাইকর্মী এমনকী গড়িয়াহাটা মোড়ের যে ভিখিরি পরদিন গুছিয়ে বাসি এঁটোকাঁটা নিয়ে যায় তারা সকলে কেন আমাকে পছন্দ করে।

এরা একদিন আমাকে চেপে ধরল।

'সাগরদা, নাম ঠিক করবার ভার এবার থেকে আপনার। না বললে হবে না। আমাদের দেওয়া নাম মোটেও জুতের হচ্ছে না। বগ্গাস, ফগ্গাস, খট্টাসে গিয়ে আটকে যাচ্ছি। এগুলো কোনো নাম হল? ভদ্রলোকদের সামনে বলা যায়? আমরা তাই ঠিক করেছি, এবার থেকে আপনি এই কাজ করবেন।'

আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। বললাম, 'সে কী! আমি কী করে করব! আমি কি তোমাদের এখানে কাজ করি?'

'কাজ করতে হবে না। কাজ না করলেও আপনি আমাদের লোক।'

আমি কাতরভাবে বললাম, 'নাম দিতে গেলে লেখাপড়া জানতে হয়। পণ্ডিত হতে হয়। নিদেনপক্ষে কবি সাহিত্যিক তো বটেই। তোমরা বরং স্কুল কলেজের মাস্টারমশাইদের ধর। বাংলার মাস্টারমশাইরা নাম দেওয়ার ব্যাপারে ভারি দক্ষ হন। আমি একজন মাস্টারমশাইকে চিনি যিনি বছরে এক ডজন করে নাম সাপ্লাই দেন। হাসপাতাল, নার্সিংহোমের সঙ্গে তার কনট্যাক্ট আছে। যদি বল ঠিকানা জোগাড় করে দিতে পারি।'

এদের বাংলার মাস্টারমশাইয়ের কথা বললেও আমার নামের বেলায় ঘটনা অন্যরকম ঘটেছিল। সে এক কেলেঙ্কারি ঘটনা। বড় হয়ে আমি শুনেছি আমার নাম দিয়েছিলেন পতিতপাবন সমাজদার। তিনি বয়েজ স্কুলে বাংলা পড়িয়েছেন টানা সতেরো বছর। আমার জন্মের পর বাবা তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন, 'মাস্টারমশাই, অনুগ্রহ করে আমার ছেলের একটা নাম ঠিক করে দিন। আপনার মতো বাংলা ভাষার পণ্ডিতের হাতে নামকরণ হলে আমার পুত্র ধন্য হবে।'

পতিতপাবনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এ তো তোমরা বিরাট ঝামেলা কর হে। দু-পাতা বেঙ্গলি লিটারেচার নিয়ে লেখাপড়া করেছি

BanglaBook.org

বলে আজীবন ছেলেমেয়েদের নাম দিয়ে বেড়াতে হবে? উফ, বাংলায় বি.এ. এম.এ. পাশ করাটাই দেখছি ঝকমারি হয়েছে। এমন হবে জানলে আমি ভূগোল পড়তাম। যারা ভূগোল পড়াঁয় তাদের এসব ঝামেলা নেই।'

বাবা ধমক খেয়েও হাত কচলাতে লাগলেন। বাবা বিশ্বাস করতেন, মূর্খের ধমকে ক্ষতি আছে, পণ্ডিতের ধমকে ক্ষতি নেই। তার ওপর তিনি পুত্রের নাম সংগ্রহে বেরিয়েছেন। দু-একটা ধমকধামক তো শুনতেই হবে।

মাস্টারমশাই রাগ রাগ গলায় বললেন, 'ঠিক আছে দেখব'খন। সাতদিন পরে এসো।'

সাতদিন পরে বাংলা ভাষার পণ্ডিত পতিতপাবন সমাজদার আমার নাম রাখলেন। সাগর। বাবা তো বিরাট খুশি। সাগর নামের জন্য খুশি নন, বাংলা ভাষার একজন পণ্ডিত তাঁর ছেলের নাম রেখেছেন এই কারণে খুশি। সবাইকে ডেকে ডেকে তিনি বলতে লাগলেন। বাংলায় গভীর ব্যুৎপত্তি এবং অধ্যয়ন না থাকলে এ জিনিস সম্ভব নয়। পরে কেলেঙ্কারি ফাঁস হল। জানা গেল, ব্যুৎপত্তি, অধ্যয়ন তো দূরের কথা পতিতপাবনবাবু বাংলা নিয়ে পড়াশোনাই করেননি। তিনি বাংলার মাস্টারমশাইও নন। তিনি ভূগোলের মাস্টারমশাই। বয়েজ স্কুলে বাংলা শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন শূন্য থাকার কারণে তিনি প্রক্সি দেন। গোলমালের আশঙ্কায় ঘটনা কেউ প্রকাশ করে না। পাছে চাকরি চলে যায়। এসব এখন চলে না। আমার জন্মের সময় হয়তো চলত। শুনেছি, ঘটনা জানার পর বাবা খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। একজন ভূগোল শিক্ষককে দিয়ে পুত্রের নাম রাখা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। সবাই বলল, 'তাতে কী হয়েছে? উনি তো লেখাপড়া জানা মানুষই।'

বাবা বললেন, 'প্রশ্নটা লেখাপড়ার নয়, প্রশ্নটা সাবজেক্টের। ভূগোলের পণ্ডিত জায়গার নাম দেবেন, মানুষের নাম দেবেন কেন? আমি কোনো কলম্বাস নই যে নতুন জায়গা আবিষ্কার করে তাঁর কাছে গেছি।'

যুক্তি ঠিক নয়। নড়বড়ে। কিন্তু বিশ্বাস বলে একটা কথা আছে।

আমাকে কে টলায়? তবে আমি কিন্তু খুব খুশি। সাগর নাম পেয়ে গর্বিত। চমৎকার নাম। ভূগোলের টাচ আছে, আবার সাহিত্যের টাচও আছে। সাগর নিয়ে কত গান কবিতা লেখা হয়েছে। ভূগোল মাস্টারমশাই তো আমার নাম কর্কটক্রান্তি রেখা বা মৌসুমী বায়ু রাখেননি। যাইহোক, আমি এ গল্প রেস্টুরেন্টের কর্মীদের বলিনি। শুধু নিজে সরে পড়তে চেয়েছিলাম। ওরা কিছুতেই ছাড়ল না।

'আমরা শুনব না। আমরা আপনাকেই চাই সাগরদা। এবার থেকে যে নতুন লোক এখানে কাজ করতে আসবে আপনি তার নাম ঠিক করে দেবেন। আপনিই আমাদের পণ্ডিত, আপনিই আমাদের দাদা।'

হেসে ফেললাম। আমি পণ্ডিত! ফাঁকিবাজ এবং গাধা ছাত্রদের লেখাপড়ার বই দেখলে হাই ওঠে। আমি ছিলাম হাইয়ের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। বই দেখলে হাইয়ে সময় নষ্ট না করে আগেভাগে ঘুমিয়েই পড়তাম। ছাত্রাবস্থায় আমার স্লোগান ছিল, 'আগে ঘুম পরে হাই।'

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে যেটুকু পড়বার পড়ে কলেজ পাশ করেছি। তারপর বেকার। নর্মাল বেকার নয়, স্বেচ্ছাবেকার। স্বেচ্ছাবেকার হল স্বেচ্ছা অবসরের মতো। চাকরি পাইনি বলে চাকরি করি না এমন নয়। নিজের ইচ্ছে হয়েছে তাই চাকরি করি না। বেলা পর্যন্ত ঘুমোই। ঘুম ভেঙে গেলে আরো বেলা পর্যন্ত বিছানায় গড়াই। গড়ানো পর্ব শেষ হলে আরো আরো বেলা পর্যন্ত বিছানা ছাড়ব কিনা ভাবি। ভাবা কমপ্লিট হলে আরো আরো বেলা পর্যন্ত ভাবি, এতক্ষণ যা ভাবলাম সবই তো ভুল ভাবলাম। নতুন করে ভাবতে হবে। জীবন হল ভাবনার ভেলা। সেই ভেলায় শুয়ে উথালপাতাল সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোই জীবনযাপন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই দার্শনিক চিন্তার তুলনা হয়? সামান্য রোজগার আর বেশিটাই ধারবাকিতে একার চমৎকার জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে চাকরি হল খাদের মতো। হাতির মতো বড় মানুষরা যখন ওই খাদে পড়ে, ব্যাঙের মতো অকিঞ্চিৎকররা লাথি কষায়। হাতিকে মরমে মরতে হয়। কিন্তু হায়রে! তখন আর করবারও কিছু থাকে না। ততক্ষণে বউ, ছেলেমেয়ে,

সংসার, বাড়ির লোন, দুধের বিল, গ্যাসের দাম, অম্বলের ওষুধ নিয়ে ল্যাজেগোবরে সিচুয়েশন। তাই খাদ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের। বহু হাতছানি, বহু হুমকির পরও ওদিকে পা বাড়াইনি আমি। টিউশন, কলেজ স্ট্রিটের প্রুফ, মাঝেমধ্যে হাবিজাবি দু-একটা উদ্ভট কাজ এবং ধারবাকি—এই আমার উপার্জন। এতেই সকাল রাতে খাওয়া, এক কামরার বাসার ভাড়া জোগাড় হয়ে যায়। কখনো আবার হয়ও না। ব্যস, আর কী চাই? আমি যেমন পণ্ডিত নই, তেমন কবি সাহিত্যিকও নই। আমার লেখালেখি বলতে চিঠি। চিঠিও না, চিরকুট। তার বেশিরভাগই বন্ধু তমালের কাছে ধার সংক্রান্ত।

'ভাই তমাল, তুই শুনলে সবিশেষ দুঃখিত হবি। গত তিনদিন যাবৎ, ছোট একটা সমস্যার মধ্যে আছি। সমস্যার নাম দারিদ্র্য। পকেটে একটি পয়সা নেই। এই চিরকুট পাওয়া মাত্র আমাকে শ দুয়েক টাকা পাঠিয়ে নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত কর।'

সাধারণত এই ধরনের চিরকুটের উত্তর আসে কড়া।

'সাগর, তোর টাকাপয়সা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা, সুচিন্তা কিছুই নেই। অলস, ছন্নছাড়া, কোনো আহাম্মককে নিয়ে আমি কোনো ধরনের চিন্তা করতেই রাজি নই। গত এক বছরে আমার বলে দেওয়া তিনটে চাকরির একটাতেও তুই জয়েন করিসনি। গো টু হেল।'

এই উত্তর পাওয়ার পর আমি নিশ্চিত হই। এই গালির অর্থ পরদিনই টাকা চলে আসা। 'বন্ধু' এমনই হয়। তারা ভালবাসার কথা গালি দিয়ে বলে।

যাইহোক, লেখালিখির এই বিদ্যে দিয়ে আমাকে কবি সাহিত্যিক বলা যায়? কখনোই না। এরপরেও ওরা নাছোড়বান্দা। বাধ্য হয়ে নামকরণের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিতে হয়েছে।

যেহেতু সকলেই রেস্টুরেন্টের কর্মী তাই আমার নামও আনাজপাতি, মাছ, ডাল, তরিতরকারির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তবে নামকরণে কাউকে ছোট করার ব্যাপার নেই। কেউ যাতে দুঃখ না পায় তার জন্য শ্রী, শ্রীমান, কুমার, মহাশয়, মাননীয় যুক্ত করে দিই। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের 'নাথ', অতুলপ্রসাদের 'প্রসাদ', শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্র'ও লাগাই। যেমন এখানকার হেড রাঁধুনির নাম

মিষ্টি লঙ্কা মহাশয়। জোগানদার শ্রীমান উচ্ছে। একজন বেয়ারা পালানাথ, আরেকজন মুসুর প্রসাদ। একইভাবে কান্তি নাম পেয়েছে পুঁটিমাছের। পুঁটিকুমার।

পুঁটিকুমার আবার নাক টানল। মাথা নামিয়ে খেলেও এবার আমার কানে লাগল। এ তো ঠিক সর্দি ধরনের নাক টানা নয়!

গত তিন বছর ধরে আমি এই 'ভাত-ডাল' রেস্টুরেন্টের কাস্টমার। বেশ কয়েকবার রেস্টুরেন্টের মালিক বদলেছে। আমি বদলাইনি। আমার হল বাই মান্থলি সিস্টেম। দুমাস অন্তর বিল মেটাই। দুমাস অন্তর খাওয়ার বিল মেটানোর ব্যবস্থা ভূ-ভারতে আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। পুরোনো মালিককে এই সিস্টেমে রাজি করিয়েছিলাম। এখন এসেছেন অভয়পদবাবু। বয়স্ক মানুষ। নাকের ওপর চশমা পরেন। চশমার ফ্রেম গোল এবং সোনালি। ডাঁটি তামার। একপাশে লাল রঙের সুতো ঝুলছে। সেটা টেবিল ফ্যানের বাতাসে ফরফর করে ওড়ে। এই সুতো চশমার, না, বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা, বলতে পারব না। অনেক সময় চাদর-টাদর থেকে চশমার খোঁচায় সুতো আটকে থাকে। আর খোলা হয় না। নতুন মালিকের চরিত্র হল তিনি সারাক্ষণ একটা 'মালিক, মালিক' ভঙ্গির মধ্যে থাকবার চেষ্টা করেন। হাবেভাবে অহংবোধের মতো মালিকবোধ। সম্ভবত এটাই ওঁর প্রথম ব্যবসা। মালিক হয়ে তিনি গর্বিত। মানুষটাকে আমি এড়িয়ে চলি। সেদিন ধরা পড়ে গেলাম।

খাওয়া শেষ করে ক্যাশ কাউন্টার থেকে মৌরি তুলতে গিয়েছিলাম। অভয়পদবাবু একগাল হেসে বললেন, 'বসুন সাগরবাবু। আছেন কেমন?'

প্রমাদ গনলাম। লক্ষ করে দেখেছি, যারা আমাকে খাতির যত্ন করে বসতে বলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আমাকে ধমক দেয়, বিপদে ফেলে। এটা প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতি এক একজনকে এক একটা বিষয়ের জন্য তৈরি করেছে। কাউকে লাথি ঝাঁটার জন্য তৈরি করেছে, কাউকে বসিয়ে জল-বাতাসা খাইয়ে আদর যত্নের জন্য তৈরি করেছে। লাথি ঝাঁটার মানুষকে জল-বাতাসা দিয়ে যত্ন করলে প্রকৃতির প্রেস্টিজে লাগে। সে প্রথমে চুপ করে থাকে। নিয়মের বাইরে খেলতে

দেয়। কিন্তু কিছুটা পরেই প্রতিবাদ করে। আমার বেলাতেও তা-ই হয়। খাতিরের পরই গলাধাক্কা।

চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'আমি ভালই আছি। আপনি?'

অভয়পদবাবু চোখের চশমা নাকের ওপর আরো খানিকটা নামিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'ভাল তো ছিলাম ভাই, খানিক আগে থেকে বিগড়ে গেছি।'

আমি সহানুভূতির গলায় বললাম, 'কেন? হলটা কী?'

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মালিক হিসেবে এখানকার নতুন দায়িত্ব পেয়েছি। বোঝেনই তো মালিকের দায়িত্ব কত কঠিন। মালিক না হলে সবদিকে নজর রাখার দরকার নেই, কিন্তু মালিক হয়ে গেলে আপনি খতম, তখন সবদিকে নজর দিকে হবে। এখন সব আমার। এই দোকান আমার, চেয়ার টেবিল আমার, কর্মচারীরা আমার, হিসেব খাতা আমার, লাভ লোকসান আমার। সবের ওপর শুধু আমার দখলদারি। ঠিক কিনা?'

আমি সবিনয়ে বললাম, 'ঠিকই স্যার।'

অভয়পদবাবুকে 'স্যার' সম্বোধনের কারণ ধারবাকি। এ ব্যাপারে আমি কোনো ঝুঁকি নিই না।

অভয়পদবাবু আমার সম্মতি চাইলেন বটে, কিন্তু পেয়ে খুশি হলেন বলে মনে হল না। একইরকম বিরক্ত গলায় বললেন, 'সেই নজর দিতে গিয়েই চমকে উঠেছি। হিসেবের খাতা ঘাঁটতে গিয়ে দেখি আপনার নামের মাসে লেখা দ্বিমাসিক। সাগরবাবু, দুমাসের ধার বলে তো আমি কখনো কিছু শুনিনি। ধার খুব বেশি হলে একদিন, দুদিন। বড়জোর হপ্তাখানেক। খাবার রেস্টুরেন্ট কোনো মুদিখানা নয় যে সেখানে ধারের খাতা থাকবে। ধারবাকি নিয়ে এসব কী চলছে! এ তো ব্যবসা লাটে উঠবে! মালিক হিসেবে আমি কি তা মেনে নিতে পারি?'

যা আঁচ করেছিলাম তা-ই ঘটল। বিপদ শুরু হয়ে গেল। নিজেকে সামলে হাসলাম। এই লোককে গুলিয়ে দিতে হবে। আমার ধারবাকির সিস্টেম বন্ধ হলে জলে পড়ব। না খেয়ে থাকতে হবে। বললাম, 'কী যে বলেন স্যার ধারবাকিতে কখনো ব্যবসা লাটে ওঠে। ধারবাকিই তো এখন ব্যবসা। যত ধার তত লাভ। ধার শোধের কত

BanglaBook.org

নতুন নতুন প্যাটার্ন বেরিয়েছে। মান্থলি, বাই মান্থলি, হাফ ইয়ারলি, ইয়ারলি। ব্যাঙ্ক আর ক্রেডিট কার্ডগুলো মাথায় ঝুড়ি নিয়ে "ধার নেবেন গো, ধার নেবেন গো" বলে গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ধার শোধের ব্যবস্থাপনা শুনলে মাথা ঘুরে যাবে স্যার। কোনো কোনো স্কিমে আবার ধার নিয়ে শোধ দিতেও হয় না। শুধু নিলেই হয়।'

নতুন মালিক আমার চোখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে রইলেন। এই তাকানো যেমন ভাল তেমন আবার বিপজ্জনকও। পলকহীন চোখে মানুষ যেমন ভালবাসার কথা বলে, তেমন আবার খুনও করতে পারে। খুনের প্রসঙ্গে তমালের কথা মনে পড়ছে। থাক, ও প্রসঙ্গে পরে আসব। রেস্টুরেন্টের মালিক নিশ্চয় আমাকে ভালবাসার কথা বলবে না।

'সাগরবাবু, আমি ব্যাঙ্ক নই, ক্রেডিট কার্ডও নই। সামান্য ভাত ডাল বেচে খাই। আমি এই ধারবাকির ব্যবসা আর করব না বলে স্থির করেছি। আগের মালিক যা করেছেন তার ইতি টানব। এবার আপনার সিদ্ধান্ত। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দুদিন ভাববার সময় নিন। আচ্ছা, দুদিন নয়, তিনদিনই সময় দিলাম। আপনি পুরোনো লোক। এখানে যদি খেতে হয়, তিনদিন পরেই টাকাপয়সা যা বাকি আছে মিটিয়ে দেবেন। তারপর আমরা রোজকার রোজ হিসেবে যাব। ফেল কড়ি খাও তেল সিস্টেম। খাও তেল কেন বুঝতে পারলেন? খাবার দোকান বলে। আমার এই অনুরোধ কি আপনার মনে থাকবে?'

আমি হাসলাম। চিন্তায় পড়ে গেছি বুঝতে দিলে চলবে না। তিনটে দিন তো চলবে। তারপর একটা কিছু ভাবা যাবে। আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'খুব মনে থাকবে।'

অভয়পদবাবু ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসলেন। গোল চশমা নিজেই খানিকটা ঝুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'না থাকবে না। ভুলে যাবেন। কঠিন কথা মানুষ সহজে মনে রাখতে চায় না। ধারবাকি-শোধের কথা তো একেবারেই নয়। মালিক হলে জানতেন। সেই কারণে আমি একটা পথ ভেবেছি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'পথ! কী পথ? পুলিশে দেবেন?'

BanglaBook.org

অভয়পদবাবু হাসলেন। গোল চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'ছি ছি, ও কী বলছেন! পুলিশে ধরিয়ে দিলে আপনি তো ফুড়ুৎ করে গারদে ঢুকে যাবেন সাগরবাবু। তাতে আমার লাভ কী হবে? গারদ থেকে আপনি কি আমার ধার শোধ করতে পারবেন? পারবেন না। যদি চেষ্টাও করেন, মাঝপথে পুলিশ কমিশন খাবে।'

আমি হালকা ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, 'তবে কি মারধোরের কথা ভাবছেন?'

'না, আপনার মতো মানুষকে মেরে লাভ নেই। মার তো দূরের কথা। নিঙড়োলেও টাকাপয়সা পড়বে না। আমার সব খোঁজখবর নেওয়া হয়ে গেছে সাগরবাবু। আপনি হলেন ব্যাড ফর এভরিথিং ধরনের মানুষ। মারধোরের জন্যও ব্যাড। গালমন্দের জন্যও ব্যাড। আমি ছেলেদের বলে দিয়েছি, কাল থেকে আপনার ওপর ধাপে ধাপে অ্যাকশন শুরু হবে। কারণ আপনি আমাদের পুরোনো খদ্দের। ব্যবসা যদি লক্ষ্মী হয়, পুরোনো খদ্দের হল তার বাহন। প্যাঁচা। তাই পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা। আপনার খাবার মেনু থেকে একটা একটা করে আইটেম স্টপ করতে বলেছি। বড় কোনো আইটেম দিয়ে শুরু করব না। শুরু হবে ছোটখাটো কিছু দিয়ে। ধীরে ধীরে 'বড়'তে যাব। কেমন হবে?'

আমার চোখ কপালে। এই মানুষ তো বিরাট খেলোয়াড়। খেলা চট করে বুঝতে দেয় না। আমি বললাম, 'ঠিক ধরতে পারলাম না।'

'পারবেন। ব্যবস্থা শুরু হলেই ধরতে পারবেন। ভাল চিকিৎসারই এই নিয়ম। চট করে ধরা যায় না। ধীরে ধীরে যায়। কাল থেকে ভাতের পাতে আপনার জন্য লেবু দেওয়া বন্ধ করতে বলেছি। লেবু বড় কিছু না। একটা ইঙ্গিত। তিনদিন পর বন্ধ হবে নুন। সল্ট। লেবু, নুনের পর আসবে মাছের ঝোল। দেন ডাল। তারপর সবজি। ধার না মেটালেও ভাত চলবে কয়েকদিন। ওনলি ভাত। আমরা কাউকে ভাতে মারতে চাই না। তবে এরপরেও যদি টাকা দেবার কথা ভুলে যান সাগরবাবু, আমাদের কিছু করার থাকবে না। বাধ্য হয়ে ভাতটুকুও বন্ধ করে দিতে হবে।'

আমি অভিভূত। আমি চমৎকৃত। ধার আদায়ের এই অভিনব

BanglaBook.org

পদ্ধতি আমাকে মুগ্ধ করল। বললাম, 'আচ্ছা, ভাত বন্ধ হলে কি আমি খালি থালা নিয়ে বসতে পারব?'

'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

আমি মুচকি হেসে আড়মোড়া ভাঙলাম। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললাম, 'স্যার, আপনার চশমাটা কি ইংরেজ আমলের? মনে হচ্ছে, চার্লস টেগার্টের ফটোতে এরকম একটা চশমা দেখেছিলাম।'

আমার ওপর ধাপে ধাপে অ্যাকশন শুরু হয়েছে। আজ তৃতীয় দিন। ভাতের পাতে লেবু বন্ধ।

আমি থালা সামনে টানলাম। থালার ওপর ঢিবি করা ভাত। ভাতের গা ঘেঁষে দুটো বাটি। তাতে ডাল আর মাছের ঝোল। মাছের ঝোল নয়, মাছের জল। বাটির দিকে তাকালে মনে হবে, কিছুক্ষণের মধ্যে চকোলেট সাইজের পোনা মাছের টুকরো প্রাণ পাবে এবং বাটির জলে মহানন্দে সাঁতার কাটবে। আমায় যদি ছিপ দেওয়া হয়, আমি বাটিতে সেই ছিপ ফেলে পোনা মাছের টুকরো শিকার করব। থালার কোনায় নুন, ভাতের আড়াল থেকে উঁকি মারছে টসটসা লেবুর টুকরো। পাতিলেবু। মালিকের ব্যবস্থা অনুযায়ী লেবু আমার প্রাপ্য নয়। পুঁটিকুমার স্মাগল করে দিয়েছে। রান্নাঘর থেকে হাতসাফাই। গতকাল আমি আপত্তি করেছিলাম।

'পুঁটিকুমার কাজটা ঠিক হচ্ছে না।'

পুঁটিকুমার নাক টেনে বলল, 'কোন কাজটা?'

'এই যে তুই আমাকে লেবু চুরি করে দিস এই কাজটা। ধার মেটাতে পারিনি বলে তো আমার লেবু বন্ধ থাকার কথা। আমি তো আর লেবুর জন্য এনটাইটেলড নই। এনটাইটেলড মানে জানিস? এনটাইটেলড মানে হল...।'

পুঁটিকুমার আমাকে থামিয়ে ধমক দেওয়ার ঢঙে বলল, 'ইংরাজি শেখাবেন না। আমি লেবু চুরি করি না। চোরাপথে আপনার থালায় চালান করি।'

এই কথায় আমি থ' মেরে যাই। বলি, 'চোরাপথে চালান করিস মানে!'

'তরিতরকারি কাটাকুটির পর পাতিলেবু আর পাঁচটা আনাজের

BanglaBook.org

খোসামোসার সঙ্গে দরজা দিয়ে রান্নাঘরের বাইরে চলে যায়। একটু পরেই আবার হাত ঘুরে জানলা দিয়ে ফিরে আসে।'

আমি চমকে উঠি। এ তো রীতিমতো স্মাগলিং! আমার জন্য এরা এতটা ভাবে!

পুঁটিকুমার আবার নাক টানল। এই আওয়াজ আবার কেমন যেন ঠেকল! অন্যরকম। ঠিক সর্দির মতো তো নয়! আমি ডাল মাখা ভাতে লেবু কচলাতে গিয়ে থমকে গেলাম। মুখ তুললাম।

হাফ প্যান্ট, ছেঁড়া স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আমার টেবিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সর্দিকুমার। সে কাঁদছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কীরে কাঁদছিস নাকি?'

পুঁটিকুমার উত্তর না দিয়ে নাক টানল। আমি বললাম, 'কীরে কেউ মেরেছে? মালিক? অন্য কেউ?'

পুঁটিকুমার দুপাশে মাথা নাড়াল।

'তাহলে!'

পুঁটিকুমার ছেঁড়া স্যান্ডো গেঞ্জির ভেতর থেকে একটা ঘামে ভেজা পোস্টকার্ড বের করল। এগিয়ে দিল আমার দিকে। পোস্টকার্ডে মেয়েলি হাতে মাত্র একটা লাইন লেখা—

'ভাই, আমি ঠিক করেছি, বিষ খাব। আমার দিব্যি একথা তুই কাউকে জানাবি না। মা-বাবা কাউকে না। ইতি তোর প্রাণের দিদি।'

মেয়েলি হলেও হাতের লেখা সুন্দর এবং একটা বানানও ভুল নেই।

BanglaBook.org

ছয়

আমি আর পুঁটিকুমার বসে আছি ফুটপাথের ধারে। একটা চকচকে শহিদবেদির ওপর। পুঁটিকুমার পা দোলাচ্ছে। তার পা দোলানোর কায়দা অদ্ভুত। বসে বসে লেফট রাইট। প্রথমে বাঁ, পরে ডান, শেষে ডান বাঁ দুটো একসঙ্গে।

কলকাতা শহরে শহিদবেদির চেহারা বদলে গেছে। আগে হত কালো, লম্বাটে। আখাম্বা দাঁড়িয়ে থাকত। গায়ে সাদা মার্বেল পাথরে খোদাই থাকত 'শহিদ'-এর নাম। এখন কালো রং উঠে গেছে। বিভিন্ন রঙের মোজাইক দিয়ে বেদিতে কারুকার্য এসেছে। বেদির আকারও বদলেছে। লম্বার জায়গায় হয়েছে চওড়া। চৌবাচ্চা ধরনের। চৌবাচ্চা মাটি দিয়ে ভর্তি। তাতে ফুলের গাছ। নেতারা যেদিন বেদি 'উদ্বোধন' করতে আসেন সেদিন ফুল সুদ্ধু গাছ এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেই গাছ কিছুদিনের মধ্যেই ভ্যানিশ। হয় গোরু ছাগলে খায়, নয়তো জলের অভাবে শুকিয়ে মরে। সবথেকে বড় কথা, শহিদবেদিতে এখন আর শহিদের নাম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয় না। ছোট করে কোথাও একটা লেখা হয়। চোখে পড়তে পারে, আবার নাও পারে। অসুবিধে নেই। যিনি শহিদ হয়েছেন তার থেকে বেদি যিনি 'উদ্বোধন' করেন, সেই নেতার নাম থাকে বড় আকারে। ঠিকই হয়। মরে যাওয়া মানুষের দাম কী? কিছুই না। এই বেদিরও অবস্থা তা-ই। শহিদের নাম বোঝা যাচ্ছে না। পাথরের লেখা ঘষে গেছে। শুধু পড়া যাচ্ছে—

'তিনি ছিলেন নারী মুক্তির প্রজ্জ্বলিত শিখা...।'

আমি সহজভাবে বললাম, 'তোর দিদির নাম কী?'

পুঁটিকুমার নাক টানছে, কিন্তু কান্নার নাক টানা নয়। তাকে নিয়ে আমি যে বেড়াতে বেড়িয়েছি, এতে সে খুশি। কান্না বন্ধ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

ভাত-ডালের দোকানে বিকেলের দিকে ঘণ্টাখানেকের ছুটি। নতুন মালিকের নিয়ম। আমার কর্মচারীকে আমি ছুটি দেব, কার কী?

'দিদির নাম বিন্তি।'

'বাঃ, ভাইয়ের নাম কান্তি, বোনের নাম বিন্তি। ভারি সুন্দর অন্ত্যমিল আছে। আমি যদি ছড়া লিখতে পারতাম তাহলে লিখতাম কান্তি বিন্তি ভাই বোন/দুজনেরই একটা মন।'

পুঁটিকুমার বলল, 'সাগরদা, তুমি আমার দিদির একটা নাম দাও।'

আমি অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, 'তা কী করে হবে! আমি তো শুধু খাওয়ার দোকানের লোকদের নাম দিই। তোর দিদি তো আর সেখানে কাজ করে না।'

পুঁটিকুমার বলল, 'না করলেও দাও। দিদি খুব মজা পাবে।'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'সে না হয় দেওয়া যাবে, কিন্তু পুঁটিকুমার, তোমার দিদি নাম নিয়ে করবেটা কী? সে তো বিষ খেতে চায়। বিষ খেলেই ফিনিশ।'

পুঁটিকুমার চুপ করে রইল। আমিও চুপ করে রইলাম। যদি বেশি উৎসাহ দেখাই এই ছেলে গুটিয়ে যেতে পারে। তারওপর চিঠিতে দিদি 'দিব্যি' কেটে রেখেছে। তার আত্মহত্যার পরিকল্পনা যেন ফাঁস না হয়। আমরা যতই হাইফাই জীবনে ঢুকি, আমেরিকা, লন্ডন করি, ভাই বোনের এইসব দিব্যি-টিব্যি খুব সিরিয়াস ব্যাপার। লেখাপড়া করলে দিব্যির কথা মুখে বলতে লজ্জা করে, মনে মনে বলে। মুখেও বলে। আমি এক বোনকে চিনি, বিয়ের পর মিশর চলে গেছে। কেমিস্ট্রিতে তুখোড় ছাত্রী। মমির ওপর গবেষণা করছে। মৃতদেহ মমি করে রাখতে কোন ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছিল তাই নিয়ে গবেষণা। নিউইয়র্কের 'পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার' নামের অতি বিখ্যাত সায়েন্স জার্নালে এই মেয়ের লেখা ফটো দিয়ে বেরিয়েছে। আমি শুনেছি, কিছুদিন আগে এই মেয়ে তার হরিদেবপুরের ভাইকে ফোন করে বলেছে—'এবার ভাইফোঁটায় তোর কাছে যাবই যাব। কেউ ঠেকাতে পারবে না। ফ্যারাওয়ের দিব্যি কাটছি।'

পুঁটিকুমার বলল, 'সাগরদা, আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে।'

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, 'আমারও করছে। চল দুজনে মিলে

BanglaBook.org

আইসক্রিমওলা খুঁজে বের করি। কতদিন কাঠি আইসক্রিম খাওয়া হয় নি।'

পুঁটিকুমার বলল, 'খুঁজতে যাব না। রাস্তা দিয়ে যখন যাবে ডেকে খাব।'

'ঠিক বলেছিস। আইসক্রিম, ঝালমুড়ি, ঝুরিভাজা খুঁজে খেতে মজা নেই। টেস্ট কমে যায়। ডেকে খেতে মজা।'

পুঁটিকুমার একটু চুপ করে থেকে খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আমার দিদির কী হয়েছে তুমি কি শুনতে চাও?'

আমি উদাসীন ভাব দেখিয়ে বললাম, 'বলতে পারিস, আবার না বলতেও পারিস। তোর ইচ্ছে।'

'দিদি যে বারণ করেছে।'

'আমার কী মনে হয় জানিস পুঁটিকুমার...।' আমি চুপ করে গেলাম।

পুঁটিকুমার আমার দিকে ফিরে বলল, 'কী মনে হয়, সাগরদা?'

আমি ইচ্ছে করেই চুপ করে ছিলাম। দেখছিলাম পুঁটিকুমার নিজে শোনার জন্য আগ্রহ দেখায় কিনা। বললাম, 'সব বারণ শোনার জন্য নয়। এই যে তোদের অভয়পদবাবু, ধার শোধের জন্য আমার ওপর ধাপে ধাপে চাপ বাড়াচ্ছে, তোরা কি শুনছিস? তুই নিজেই তো লেবু পাচারের ব্যবস্থা করেছিস। বল, করিসনি?' পুঁটিকুমার মাথা কাত করল। আমি বললাম, 'আবার আরেকরকম বারণ আছে যার মানে উলটো ধরতে হয়। ধর, তুই রাগ করে বললি, আইসক্রিম খাব না। আমি তার মানে বুঝব, তুই আসলে আইসক্রিম খেতেই চাস। তেমন তোর দিদিও হয়তো তোকে বারণ করে উলটো কিছু বলতে চাইছে। নইলে এতক্ষণে চুপচাপ বিষ খেয়ে নিত। কষ্ট করে পোস্টকার্ড কিনে তোকে চিঠি লিখতে যাবে কেন?'

পুঁটিকুমার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি হাসলাম। ছেলেটাকে প্রভাবিত করতে পেরেছি। বিত্তি কেন বিষ খেতে চায় আমায় জানতে হবে। পুঁটিকুমারের কান্না আমি পছন্দ করিনি।

পুঁটিকুমার বিড়বিড় করে ঘটনা বলতে শুরু করল। আমি চুপ করে শুনতে থাকলাম। এর মাঝখানে আমরা আইসক্রিমওলার দর্শন

BanglaBook.org

পেয়েছি। বাক্সগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল ফুটপাথ ঘেঁষে। গাড়ির গায়ে রংচঙ দিয়ে লেখা 'আইজ এন্ড কোল্ট'। দুটো বানানই ভুল। এটাই ভাল। ভুল বানানের আইসক্রিম খেতে বেশি মজা। আমরা গোলাপি আর সবুজ রঙের দুটো কাঠি কিনেছি। পুঁটিকুমার সবুজ খাবে না। তার সবুজে নাকি অ্যালার্জি। গায়ে চিড়বিড় লাগে। সে নিয়েছে গোলাপি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, গোলাপি নেওয়া সত্ত্বেও অল্পক্ষণের মধ্যেই পুঁটিকুমারের মুখের রং সবুজ হয়ে গেছে। আমার হয়েছে গোলাপি! অদ্ভুত তো!

কান্তি বিন্তিদের গ্রামের নাম মন্দিরগ্রাম। পোস্ট অফিস বাণীপুর, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা, থানা হাবড়া। কান্তির বয়স দশ, বিন্তির বয়েস পনেরো। হতদরিদ্র পরিবারে এই ছেলেমেয়ে দুটি জন্মের পর থেকেই বাবা-মায়ের কাছে 'শাকের আঁটি'। শাকের আঁটি শুনে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। বাবা-মায়ের নিজেদের জীবন চালানোই এতদিন ছিল বোঝার মতো। তারওপর ছেলেমেয়েরা চাপলে তাকে শাকের আঁটি ছাড়া আর কী বলা হবে? সব মিলিয়ে বোঝার ওপর শাকের আঁটি। এইসব পরিবারে শাকের আঁটি ঝেড়ে ফেলবার জন্য বাবা-মায়ের কসরতের শেষ থাকে না। নতুন কিছু নয়। আমাদের দেশে এমনটাই স্বাভাবিক। সবথেকে আদরের জনকে পেটের কারণে সবথেকে বড় দায় বলে মনে হয়। দায়মুক্ত হবার জন্য বাবা-মা অনায়াসে ছেলেমেয়ের গলা টিপে, বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারে। ফেলেও। পেট খুব কঠিন জিনিস। স্নেহ, মায়া, মমতা তার কাছে ধূলিকণাসম। ফুঃ দিয়ে উড়িয়ে দিতে মুহূর্তমাত্র। মেয়েদের বেলায় তো আরো সহজ। জন্মালেই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দাও। খবরের কাগজে এইসব খবর আজকাল ছাপা হয় না। কত ছাপা হবে? মেয়ে মারা এখন জলভাত। গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে খবরের কাগজ কিনে পাবলিক জলভাত খেতে চায় না। কুড়মুড়ে জিনিস খেতে চায়। বিন্তিকে যে তার বাবা-মা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ে মুড়ে পুকুরের জলে ফেলে দেয়নি তাই অনেক। আমি ওই পরিবারের পয়সাকড়ির অবস্থা যা শুনলাম তাতে সেটাই উচিত ছিল। কান্তি বিন্তির বাবা-মা পুঁটিকুমারকে পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতায়। সেও একরকম জলে

ফেলাই হল। হাবুডুবু খাও। পুঁটিকুমারও হাবুডুবু খাচ্ছে। সে হয়েছে বালক শ্রমিক। মেয়েকে কলকাতায় পাঠানো সম্ভব হয়নি। মেয়ে গ্রামে। ঘর সংসারের কাজ করে। বাবা-মা অপেক্ষা করে মেয়ে কবে বড় হবে। হলেই বিয়ে।

ঘটনা এই পর্যন্ত সাধারণেরও সাধারণ। বলার মতো নয়, শোনবার মতোও নয়। পাড়াগাঁয়ে এমন মেয়ে আছে অজস্র। পিতা মাতার অনুপ্রেরণায় তারা আধপেটা খেয়ে না খেয়ে সেজেগুজে বিয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। স্বপ্ন একটাই, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আর চিন্তা থাকবে না। দুবেলা পেট ভরবে। সন্ধের পর স্বামী কাজ সেরে বাড়ি ফিরলে গা ধুয়ে, কপালে বড় করে টিপ দিয়ে বসবে পাশে। গুজুরগুজুর করে গল্প হবে। সেই গল্পে যেমন সুখ থাকবে তেমন দুঃখও থাকবে। একসময় স্বামীর কাঁধে মেয়ে মাথা রাখবে আনমনে। কষ্টের সংসারও সুখের মনে হবে। নিজের মনে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তেমনটা হয় না। শ্বশুরবাড়িতে আধপেটা খাবার জোটানোও কঠিন হয়ে পড়ে। তার থেকে অনেক সহজে গায়ে আগুন দেওয়ার জন্য কেরোসিন পাওয়া যায়। রান্নাঘর থেকে গোয়ালঘর, খাটের তলা থেকে সিঁড়ির তলা, শাশুড়ি ননদ বর যত্ন করে, শিশি সাজিয়ে রাখে। নতুন বউয়ের যেন অসুবিধে না হয়। হাত বাড়ালেই বন্ধুর মতো, হাত বাড়ালেই কেরোসিন। যাক সে আলাদা গল্প। আমরা বিন্তিতে ফিরি।

আর পাঁচটা গরিব ঘরের মেয়ের মতো আমাদের বিন্তিরও বিয়ের অপেক্ষা চলতে লাগল। একই ঘটনা। হেরফের নেই। ঘটনায় হেরফের হল হঠাৎই। ঘর সংসারের কাজের ফাঁকে বিন্তি গিয়ে একদিন নাম লিখিয়ে এল গ্রামের স্কুলে। এই ভয়ংকর খবর জানার পর মা চুলের মুঠি চেপে ধরল। বিন্তি বলল, 'ওরা দুপুরে খেতে দেয়। পয়সাকড়ি কিছু লাগে না।' বিন্তির মা আর আপত্তি করেনি। সংসারের একটা পাত তো কমল। মিড ডে মিলে বিন্তি কোনোদিন খিচুড়ি খায়, কোনোদিন ভাত, কোনোদিন আবার রুটি, আলুর দম। খায় আর এলোমেলোভাবে স্কুল থেকে পাওয়া বই খাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। খাবার পেতে হলে হাতে বই লাগে। একসময় বিন্তি খেয়াল করল, বই নাড়াচাড়া করতে তার মজা লাগছে! দুনিয়ায় এত কিছু জানার আছে!

BanglaBook.org

রাতে ঘরে আলো নেই। তাই দিনের বেলা সঙ্গে বই নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিন্তি। ফাঁক পেলে খুলে বসে। ধীরে ধীরে স্কুলের দিদিমণিদের নজরে পড়ে। তারা বুঝতে পারে, এই মেয়ে লেখাপড়ায় ভাল। গড়পড়তা ভাল নয়, বেশি ভাল। এই মেয়ের মাথায় বুদ্ধি আছে। গড়পড়তা বুদ্ধি নয়, বেশি বুদ্ধি। পরীক্ষায় বিন্তি ক্লাসের সবাইকে টপকে যেতে লাগল। এইভাবে ক্লাস টেন পর্যন্ত চলেছে। এরপরই শুরু হয়েছে গোলমাল। বিন্তির জন্য পাত্র পেয়েছে বাবা। পাত্র অতি ভাল। শক্তপোক্ত চেহারা। পাকা কাজকর্ম নেই বটে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। গভর্নমেন্টের একশো দিনের স্কিম চালু হলে কাজ জুটে যায়। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আছে। পার্টি থেকে কাজ পায়; তবে বাকি সময় ছেলে যে বাড়িতে বসে ল্যাজ নাড়তে থাকে এমন নয়। রোজের ভাড়ায় ডাকাতি খাটে। যেমন ডাক পায়। দু-তিনদিন বাইরে বাইরে থাকে। মাঝেমধ্যে পুলিশ এসে ধরেও নিয়ে যায়। তবে রাখে না বেশিদিন। জেলখানায় অত চোর ডাকাত রাখবার জায়গা নেই। সব মিলিয়ে ছেলে রোজগারি। ছেলের মা এবার ঘরে লক্ষ্মীমন্ত বউ চায়।

বিন্তির বাবা-মা হাতে পাত্র তো নয়, চাঁদ পেয়েছে। এমন পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়া বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার। জামাই সাহসী না হলে চলে? আতুপুতু জামাই হল পাড়াগাঁয়ের ভাঙা স্কুলের ভাঙা মাস্টার। চোপ বললে প্যান্টে ইয়ে। বিন্তি বোকাটা লেখাপড়া শিখলে হয়তো ওইদিকেই চলে যাবে। ল্যাগব্যাগে একটা মাস্টার জুটিয়ে ভাঙা সংসার করবে। ডাকাত পাত্র তার থেকে ঢের ভাল। সে যদি দু-পাঁচ মাস জেলে থাকে তাতেই বা ক্ষতি কীসের? বাড়ি তো আর ফাঁকা থাকবে না। শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, ভাশুর সবাই থাকবে। ভয় কীসের? বিন্তির বাবা-মা ফুল ভল্যুমে বিয়ের গোছগাছ শুরু করেছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা। তারা ভাল করেই দিতে চায়। যতটা সাধ্য ততটাই করবে। এমনকী পুঁটিকুমারকে পর্যন্ত খবর পাঠিয়েছে, মালিককে সে যেন ছুটির কথা বলে রাখে। পারে যদি মাইনের টাকা কিছু অ্যাডভান্স চায় যেন। পুঁটিকুমারও তৈরি হচ্ছিল। অভয়পদবাবুকে ছুটি এবং মাইনের কথা বলব বলব করছিল। এমন

সময়েই বিপদ হল। বেঁকে বসল বিন্তি। সে তার বাবা-মাকে জানিয়েছে, বিয়ে করবে না সে। লেখাপড়া শিখবে। আরো পড়বে। স্কুল পাশ হবে। কলেজেও নাকি যেতে চায়। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চেয়েছে গাধাটা। সরি, গাধা নয়, গাধি। তিনদিন হল বাবা-মা কঠিন মার দিয়ে মেয়েকে ঘরে আটকে রেখেছে। একেবারে বিয়ের পর ডাকাত বর এসে মুক্ত করবে। এর ফাঁকে বিন্তি তার স্কুলের কোন এক বন্ধুকে দিয়ে ভাইয়ের কাছে পোস্টকার্ড পাঠিয়েছে একটা। তাতে লেখা, বিয়ে দিলে বিষ খাবে।

ঘটনা বলা শেষ করে পুঁটিকুমার নাক টানল। আমি মুখ না ঘুরিয়ে বললাম, 'পুঁটিকুমার, তুই কি কাঁদছিস?'

'না।'

'গুড। পুরুষমানুষের কথায় কথায় কান্নাকাটি ভাল নয়। কান্নার ঠাকুর রাগ করেন। কান্নার ঠাকুরের নাম জানিস?'

'না।'

আমি বললাম, 'আমি জানি, এখন মনে পড়ছে না। মনে হয়, আইসক্রিম খেয়েছি বলে ঠাণ্ডায় বুদ্ধি জমে গেছে।'

পুঁটিকুমার বলল, 'সাগরদা, দিদি কি সত্যি বিষ খাবে?'

আমি একটু ভেবে নির্লিপ্ত গলায় বললাম, 'মনে হচ্ছে না। গাধারা কখনো বিষ খেয়েছে বলে শুনিনি। তোর দিদি অবশ্য গাধা নয়, গাধি। পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া গাধি।'

পুঁটিকুমার আমার দিকে ঘুরে কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমার দিদিকে গাধি বললে!'

'তাছাড়া আর কী বলব? অমন সুপাত্রকে বিয়ে না করে যে লেখাপড়া চালাতে চায় তার মাথায় কোনো বুদ্ধি আছে বলে মনে করিস? ক-জনের কপালে ডাকাত বর জোটে? তুই সবাইকে বুক ঠুকে বলতে পারবি, আমার জামাইবাবু কে জানো...হুঁ হুঁ...যদি চাস জামাইবাবুকে ধরে এনে তোর মালিককে দুটো ধমকও খাওয়াতে পারিস। বেটার মালিক মালিক করা বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁরে, ওই ছেলে কি মাথায় ফেট্টি, কপালে টিপ, কানে জবা ফুল গুঁজে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে?'

BanglaBook.org

পুঁটিকুমার একটু গুম মেরে থেকে বলল, 'দিদির এখনো বিয়ের বয়স হয়নি।'

আমি চমকে উঠলাম। পুঁটিকুমার এসব জানল কী করে!

'তোকে কে বলল?'

সন্ধে নামছে। সন্ধে নামবে শান্ত ভঙ্গিতে। আকাশের আলো আবার আকাশে ফিরে যাবে চুপিচুপি। গাছ তার ডালপাতা নামিয়ে বিশ্রামে যাবে নীরবে। ঘর হারানো পাখি ক্লান্ত ভঙ্গিতে উড়ে যাবে আরো ভুল পথে। ধানখেত, মাঠ, পথঘাট ও শাপলা দিঘির পাড় মুড়ি দেবে জোনাকি আঁকা আঁধার অথবা কুয়াশার ফুলছাপ কাঁথায়। সারাদিন পর চাঁদের আলোয় লম্বা ছায়া ফেলে হেঁটে যাবে মানুষ। হেঁটে যাবে প্রিয়জনের কাছে। মনে মনে বলবে, 'এবার তুমি। এবার তুমি। এবার তুমি।' এই শান্ত স্নিগ্ধভাব বড় মায়াবী লাগবে। ভাল লাগবে খুব। অথচ কলকাতায় সন্ধে নামে হইহই করে। চারপাশ ঝলসে ওঠে ঝলমলে আলোয়। চকচকে রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটতে থাকে। পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে মানুষ।

পুঁটিকুমার বলল, 'আমি জানি। আমি অনেক কিছুই জানি। রেস্টুরেন্টে টেবিল মুছি বলে কি কিছুই জানি না মনে কর? আঠারো বছর বয়স না হলে বিয়ে ঠিক নয়। আমাদের দোকানে একদিন দুটো লোক এসব বলাবলি করছিল। তার মধ্যে একটা ছিল হোঁতকা, অন্যটা চিমসে। চিমসেটা বোধহয় পুলিশের লোক। তবে গোঁফ মোটা। ডালের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়ে গোঁফে ডাল লাগিয়ে ফেলল। হোঁতকাটাকে এসব বলছিল।'

আমি বললাম, 'কী বলছিল?'

'বলছিল, মেলা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কোরো না। তোমার মেয়ের বয়স কত? হোঁতকা বলল সতেরো বছর তিন মাস। না না তিন মাস নয়, পাঁচ মাস। চিমসেটা এক ধমক দিয়ে বলল, মেয়ের বয়স জানো না? যাইহোক আঠারো বছর তো হয়নি। আঠারো বছরের আগে বিয়ে করা যায় না, বিয়ে করলে হাজতে থাকতে হয়। ছোকরাকে থানায় আনার আগে আমাকে একটা ফোন করে দিয়ো। এমন ডান্ডা মারব...। হি হি।'

পুঁটিকুমারের হাসি দেখে খুব ভাল লাগল। বেটা জোর পেয়েছে,

BanglaBook.org

মজাও। কম বয়েসে দিদির বিয়ে হলে সে যেন নিজেই ডান্ডা মারবে। কাকে মারবে এইটা খালি বুঝতে পারছে না। আমি খানিকটা দমিয়ে দেবার জন্য বললাম, 'ওসব আইনকানুন সবার জন্য নয়। আইন একেকজনের জন্য একেকরকম। তোদের মতো গরিবদের একরকম, আবার ওই যে দেখছিস গাড়ি নিয়ে সুঁই করে চলে গেল, তার জন্য আরেকরকম। এত জানিস এই আসল কথাটাও জেনে রাখ। তোর দিদির কম বয়েসে বিয়ে হলে কেউ ডান্ডা খাবে না। তাছাড়া বিয়ে না হলে তোর দিদি খাবে কী? তখনো তো বিষ খেতে হবে। বিষ আর বিয়ের মধ্যে বিয়েটাই তো ভাল অপশন। অপশন বুঝিস? অপশন হল পথ। তোর দিদির উচিত বিয়ের পথটাই বেছে নেওয়া।'

আমার কথায় পুঁটিকুমারের ভুরু কুঁচকে গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'দিদি লেখাপড়া করতে চায়।'

আমি শহিদবেদি থেকে নেমে পড়লাম। এবার ফিরতে হবে। এই ছেলে মূল জায়গায় ঢুকে পড়েছে। তাহলে আর একটু বাজিয়ে দেখা যাক।

'পুঁটিকুমারবাবু, ওটাও গরিবমানুষদের জন্য নয়। দেখিস না, গরিবমানুষ লেখাপড়া শিখলে কেমন ঢাক পেটানো হয়। টিভিতে দেখানো হয়, কাগজে ছাপা হয়। অভাবী অথচ মেধাবী। ভাবটা এমন যেন অভাবে থাকলে জ্ঞানগম্যি হওয়া বিরাট কোনো ব্যাপার।'

আমার এই লেকচারে পুঁটিকুমার গা করল না। মনে হয় বুঝতে পারেনি। বললাম, 'তোর দিদির লেখাপড়া শিখে হবেটা কী বল তো? বরং স্কুল-টুল পার হয়ে গেলে বিপদ হবে। তখন আর বিয়ের জন্য ছেলে পাওয়া যাবে না। তার থেকে এই ভাল। চল, এবার ফিরবি। অভয়পদবাবু তোকে না দেখলে খেঁচামেচি লাগাবে। মালিক বলে কথা।'

পুঁটিকুমার চুপ করে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। সে নীল রঙের চেক একটা হাফ শার্ট পড়েছে। তাকে বেশ দেখাচ্ছে। নাক টেনে বলল, 'সাগরদা, তুমি আমাকে কী করতে বল?'

'দিদিকে চিঠি লেখ। হয় বাবা-মায়ের কথামতো বিয়ে কর, নয়তো বিষ খাও।'

BanglaBook.org

পুঁটিকুমার থমকে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'কী হল?'

'আমি দিদিকে বিষ খেতে বলব! সাগরদা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

আমি পুঁটিকুমারের কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'আমার মাথা খারাপ হবে কেন! বিন্তি তো নিজেই বিষ খেতে চেয়েছে। আমার কী দোষ?'

পুঁটিকুমার মাথা নামিয়ে ব্যথিত গলায় বলল, 'ছি ছি।'

আমি মনে মনে হাসলাম। মুখে চিন্তার ভাব নিয়ে বললাম, 'তুই কী চাস?'

পুঁটিকুমার হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। বলল, 'আমি কিছু চাই না। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতেও চাই না।'

আমি এই রাগটাই চাইছিলাম। এই ছেলের বয়স যতই কম হোক, ভেতরে আগুন আছে। আমাকে লেবু পাচার করে দেবার ঘটনাতেই আঁচ করেছিলাম। যত কথা বলছি, ছেলের ভেতরের আগুন সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছি। আমার একটাই দায়িত্ব এই আগুন আরো বাড়িয়ে দেওয়া।

'আচ্ছা, পুঁটিকুমার একটা কাজ করলে কেমন হয়?'

পুঁটিকুমার এতটাই রেগে আছে যে আমার দিকে তাকাল না।

'তুই নিজে গিয়ে যদি বিন্তিকে খানিকটা বিষ পৌঁছে দিয়ে আসিস?'

পুঁটিকুমার আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। চারপাশের দোকানের আলো তার চোখে এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, জ্বলছে। আমি খানিকটা থতমত খাওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, 'না, মানে, তুই তো জানিস কলকাতায় তোদের গ্রামের থেকে অনেক ভাল বিষ পাওয়া যাবে। টক করে খেয়ে ফট করে মরে যাওয়া যায়। তাছাড়া রকমারিও পাবি। বেছেবুছে কিনতে পারবি। শুনেছি শিয়ালদার কোন দোকানে যেন বিষের হোলসেল হয়। হোলসেল জানিস? পাইকারি। দুপুরের দিকে কাজ কম থাকলে চলে যাবি না হয়। একেকটা কারণে একেকরকম বিষ কাজ করে। খেতে না পাওয়ার কারণে মরতে চাইলে একরকম বিষ, শ্বশুরবাড়িতে মারধোর করলে একরকম বিষ, মা বকলে

BanglaBook.org

একরকম, পরীক্ষায় ফেল করলে অন্যরকম। আমার মনে হয় লেখাপড়া করতে না পেরে যেসব মেয়ে কষ্ট পায়, মরতে চায় তাদের জন্যও আলাদা জিনিস পাওয়া যাবে।'

আমি বলছি আর আড়চোখে পুঁটিকুমারের চোখের দিকে বার বার তাকাচ্ছি। চোখ জ্বলছে ধকধক করে। পুঁটিকুমার ঘন ঘন নাক টানছে। না সর্দি, না কান্না। এখন সে নাক টানছে রাগে। বাঃ রাগেও নাক টানা যায়! জানতাম না তো। পুঁটিকুমার তাহলে এখন রাগকুমার। আমি এই রাগ পাত্তা দিলাম না। মুচকি হেসে বললাম, 'যদি বলিস, ওই দোকানে আমি তোকে নিয়ে যেতে পারি। চল কালই নিয়ে যাব।'

পুঁটিকুমার আমার দিকে সরু চোখে তাকাল। তারপর হাফপ্যান্টের দুটো পকেট হাতড়ে খানিকটা খুচরো পয়সা বের করল। এগিয়ে ধরে বলল, 'এটা ধরেন।'

আমি নার্ভাস হেসে বললাম, 'কী এটা!'

জবাব না দিয়ে পুঁটিকুমার গোঁ দেখিয়ে মুখ নামিয়ে থাকল। আমি আবার বললাম, 'আরে বাপু, বলবি তো পয়সাগুলো কেন দিচ্ছিস! আচ্ছা ফ্যাচাং তো।'

পুঁটিকুমার নাক টেনে বলল, 'আপনার আইসক্রিমের দাম। আপনার পয়সায় আইসক্রিম খাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। গুনে দেখেন, কম পড়লে কাল যখন দোকানে খেতে আসবেন দিয়ে দেব।'

আমি খুশি হয়ে পয়সা গুনতে শুরু করলাম। আমি পেরেছি। বারো বছরের এই বালকের ভেতর যে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছিল, তাকে দাউ দাউ করে দিতে পেরেছি। আমার শুধু ছোট্ট একটা কাজ বাকি রইল।

'পুঁটিকুমার, আমি কি তোর সঙ্গে যেতে পারি?'

'না।'

পুঁটিকুমার হন হন করে হেঁটে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে আমার মনে হল, বেটা হাঁটছে না। ঘোড়ায় চেপে ছুটছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, সে যাচ্ছে মন্দিরগ্রাম। তার দিদির কাছে।

BanglaBook.org

সাত

'রেবা, কেমন আছ?'

'তুমি আবার ফোন করেছ!'

'রাগ করছ কেন?'

'তোমার ওপর আমার যে রাগ বা খুশি কোনোটাই হয় না তা তুমি ভাল করেই জানো।'

'বাঃ তোমার অবস্থা তো দেখছি শঙ্খ ঘোষের কবিতার মতো রেবা। ওই যে কবিতাটা আছে না? কোনো গুপ্তঘর নেই। অজ্ঞাতবাসেও নিরাশ্রয়।/দেয়ালে দেয়ালে লেগে বারে বারে ফিরে আসে স্বর।'

রেবা চুপ করে রইল। সে এরকমই। মাঝেমাঝেই চুপ করে যায়। যখন কলকাতায় ছিল তখনো কথা বলতে বলতে থেমে যেত, অন্যমনস্ক হয়ে যেত। সম্ভবত যে বহু কারণে আমি তার প্রেমে পড়েছিলাম তার একটা এই হঠাৎ থেমে যাওয়া স্বভাব। আজও তার এই স্বভাব। আর তাই আজও তাকে ভালবাসি। আমার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারেও সে হঠাৎ থেমে গেছে। আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে 'না' শুনেছিল। শুনে ভেঙে পড়েনি। আমাকে দোষ দেয়নি। বরং খুশিই হয়েছিল। বলেছিল, 'আমি জানতাম, তুমি না বলবে। সাগর, তুমি বাঁধা পড়বার মানুষ নও। আর সেই কারণে তোমাকে আমি এত ভালবাসি।'

রেবা তার রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার বাবার সঙ্গে লামডিং চলে গেছে। জঙ্গল আর কুয়াশা নিয়ে থাকে। বাবার তৈরি করা ফার্মে ম্যানেজারি করে। সেখানে দুঃস্থ, অসহায় মেয়েরা কাজ করে। ছোট ছোট পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলও খুলেছে। তাদের পড়া শেখায়, গান শেখায়, নাটক শেখায়। লামডিং-এর পাহাড়ি মেয়েরা নাকি এখন বাংলাতেও চমৎকার গান করছে! রেবা মাসে দুমাসে

BanglaBook.org

আমায় ফোন করে, চিঠি লেখে। মাঝেমাঝে আবার স্বভাবমতো চুপ করে যায় দিনের পর দিন। আমি ফোন করলে কেটে দেয়। চিঠি পাঠালে ছিঁড়ে ফেলে দেয় কুচি কুচি করে। কোনো কোনো ঝড়ের বিকেলে রেবার জন্য মন কেমন করে। গড়িয়াহাটার কংক্রিটে বোনা মোড়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পাই কে যেন বলছে—'আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায় আয় আয় আয়/জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তা-ই—যাই যাই যাই।' ইচ্ছে করে, ছুটে চলে যাই। আমি রেবাকে কয়েকবার বলেওছি।

'আমি যদি তোমার কাছে যাই তুমি রাগ করবে? খুব মন কেমন করছে রেবা।'

রেবা গাঢ় গলায় বলে, 'রাগ করব না। তবে তুমি এসো না। আমার জন্য তোমার মন কেমন তোমার আসার থেকেও আমার কাছে অনেক বেশি দামি। প্লিজ, তুমি এসো না।'

রেবাকে ফোন করতে একবারেই ধরল। আশকারা দেওয়া গলায় বলল, 'কবিতা না বলে, কেন ফোন করেছ বল। শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী শুনিয়ে আমাকে মুগ্ধ করতে পারবে না। ওই স্টেজ আমি পার করে এসেছি।'

'তাহলে কি আমি অন্য কারো কবিতা শোনাব? আজকাল অনেকেই খুব সুন্দর কবিতা লিখছে। যদি বল শোনাতে পারি। সেদিন কলেজস্ট্রিটে গিয়ে শুনলাম এদের নাকি শূন্য দশকের কবি বলা হয়।'

রেবা বলল, 'তুমি আমাকে এইসব হাবিজাবি বলতে ফোন করেছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি ছাড়া আমার হাবিজাবি কে শুনবে?'

রেবা হেসে বলল, 'আচ্ছা আমিই শুনব। দাঁড়াও এক কাপ কফি নিয়ে আসি। আজ এখানে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। কাল রাত থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।'

আমি হলফ করে বলতে পারি, কফি আনবার নাম করে আজকের মতো বিদায় নেবে রেবা। আমি সারাদিন মোবাইল কানে নিয়ে বসে থাকলেও তাকে পাব না। মোবাইল ছেড়ে যদি ল্যান্ড ফোনে ধরতে চেষ্টা করি তাতেও লাভ হবে না। ফোন বেজে যাবে সে

BanglaBook.org

ধরবে না। একাজ রেবা আগেও করেছে। পরে যখন জিগ্যেস করেছি, বলেছে, 'তোমার কথা খুব শুনতে ইচ্ছে করছিল। তাই ফোন রেখে পালিয়ে গেলাম। মনে হল, কথা শোনার থেকে কথা শোনবার ইচ্ছেটা অনেক বড়। কথা বারবার শোনা যায়, ইচ্ছে বার বার আসে না। ভাল করিনি?'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, 'ভাল করেছ। ফিলজফি হিসেবে চমৎকার। রিয়েলিটির বদলে ইচ্ছে।'

তবে আজ ফিলজফি করলে চলবে না। আজ আমি সত্যি সত্যি কাজের জন্য ফোন করেছি। সুতরাং ওকে আটকাতে হবে।

'দাঁড়াও রেবা, পরে কফি খাবে। জরুরি একটা দরকারে তোমাকে ফোন করেছি।'

রেবা একটু থমকাল। আমি প্রমাদ গনলাম। এই রে, পুরো চুপ করে না যায়। হড়বড় করে বললাম, 'একটা চোদ্দো পনেরো বছরের মেয়ে বিষ খেতে চলেছে...।'

রেবা এক মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে বলল, 'কী হয়েছে? মেয়েটা কে?'

'মেয়েটার নাম বিন্তি। চমৎকার মেয়ে। আমার ধারণা এই মেয়ে বিষ না খেয়ে যদি বেঁচে যায় তাহলে একদিন তোমার বাবার মতো মস্ত বড় পুলিশ অফিসার হবে।'

BanglaBook.org

রেবা অবাক গলায় বলল, 'পুলিশ অফিসার! কেন পুলিশ অফিসার কেন?'

'বুদ্ধি আর সাহস দুটোই এই মেয়ের আছে। সাময়িকভাবে সেই সাহসে চিড় খেয়েছে। ঘাবড়ে গেছে বলতে পারো। ওর সাহস যদি ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে দেখতে হবে না, বিন্তি অনেক দূর যাবে।'

'এবার ঘটনাটা বল। আমি কী করতে পারি সেটা বল।'

আমি সংক্ষেপে এবং দ্রুত কান্তি বিন্তির ঘটনা বললাম। কীভাবে মেয়েটা লেখাপড়া শিখেছে, কীভাবে মেয়েটাকে বিয়ের জাঁতাকলে ফেলে পিষে মারবার প্ল্যান হয়েছে।

'ক-দিনের জন্য বিন্তিকে তোমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় রেবা? লামডিং-এ থাকবে হপ্তাখানেক। কিছুদিন থাকার পর

এদিকটা যখন শান্ত হবে তখন না হয় ফিরিয়ে আনা গেল। হস্টেলে রেখে কোনো স্কুল-টুলে যদি ভর্তি করে দেওয়া যায়। তমালের এক মামাতো না মাসতুতো বোন বারাসতে এরকম একটা স্কুল বানিয়েছে। গরিব মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর স্কুল।'

রেবা একটু ভেবে বলল, 'আমার এখানে পাঠানো ঠিক হবে বলে মনে হয় না। মেয়ের বাবা মা বা ভাবী বর কিডন্যাপিং আর পাচারের অভিযোগ করতে পারে। বলবে গ্রাম থেকে নাবালিকা অপহরণ কবে পাচার করে দিয়েছে।'

এবার আমি হাসলাম। বললাম, 'সেটা সম্ভব নয়। তাহলে ভাইয়ের বিরুদ্ধে দিদিকে অপহরণের মামলা করতে হবে। সেই কারণেই তো আমি নিজে গেলাম না। পুঁটিকুমারকে রাগিয়ে, তাতিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি জানি ও ঠিক দিদিকে নিয়ে চলে আসবে। আমি সঙ্গে গেলে এত সহজে হত না। অনেক ঝামেলা করতে হত।'

রেবা বিরক্ত হল। গলায় সামান্য ঝাঁঝ নিয়ে বলল, 'কী ঝামেলা হত? হলে হত। ওই গ্রামে তোমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল। তুমি যে এত ভীতু হয়ে গেছ আমি জানতাম না। এত বড় একটা অন্যায় হচ্ছে...একটা মেয়ে লেখাপড়া করতে চায়, অথচ বয়স হয়ে যাবার আগেই বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে দেবে? তোমার পুলিশে যাওয়া উচিত ছিল। বাবা-মায়ের নামে ডায়েরি করা উচিত ছিল।'

আমি একটু ভেবে, বানিয়ে হাই তোলার আওয়াজ করে বললাম, 'ওসবে বড্ড পরিশ্রম রেবা।'

'কী বলছ! পরিশ্রম? ছি ছি। এটা তুমি কী বলছ? একটা মেয়ে বিষ খেতে চলেছে জেনেও তুমি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে!'

আমি মিথ্যে অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, 'হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলাম কোথায়! পুঁটিকুমারকে যে উত্তেজিত করলাম।'

'এসব তোমার ফাঁকিবাজির কথা। ওইটুকু ছেলেকে এরকম একটা সিরিয়াস বিষয়ে উত্তেজিত করে লাভ কী? আমি হলে নিজে চলে যেতাম।'

আমি মুখ দিয়ে তাচ্ছিল্যের আওয়াজ করে বললাম, 'তারপর আমি গেলাম আর ওই মেয়ে বলল, আপনি কে? আপনি কি আমার

BanglaBook.org

বিয়ে দিচ্ছেন? নাকি আপনি আমায় বিয়ে করবেন? মেয়ে যদি পালটি খায়? আমার কী হত একবার ভেবে দেখেছ?'

রেবা আর সহ্য করতে পারল না। এবার ধমকে উঠল।

'স্টপ ইট। মেয়েদের সম্পর্কে এই ধরনের বিশ্রী কথা বলবে না। বিন্তি মত বদলাবে কেন? আজকাল প্রায়ই খবরের কাগজে বেরোয়, মেয়েরা রুখে দাঁড়িয়েছে। বিন্তিও তা-ই করত। সাপোর্ট পেলে রুখে দাঁড়াত।'

রেবার এই রাগ, এই তেজ আমার দারুণ লাগল। আরো খোঁচা মারলাম।

'আমি সাপোর্ট দেবার কে? আমাকেই কেউ সাপোর্ট দেয় না।'

রেবা বলল, 'চুপ কর তো, আমাকে ভাবতে দাও।'

আমার উদ্দেশ্য সফল। একজন দুঃখী মেয়ের ভাবনার দায়িত্ব একজন দুঃখী মেয়ে নিয়ে নিয়েছে। এর থেকে খুশির খবর আর কী আছে?

আমি গলা নরম করে বললাম, 'শান্ত হও রেবা। তুমি ঠিকই বলেছ, এই মেয়ের বাবা-মাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তারপর? দুদিন খবরের কাগজে বিন্তির ছবি-টবি না হয় বেরোবে। বাবা-মাকে জেলে পুরে সাহসিনী পুরস্কারও জুটে যেতে পারে। কিন্তু তারপর? সে কার কাছে থাকবে? কোথায় পড়বে? কীভাবে বড় হবে? একটা অলটারনেটিভ ব্যবস্থা করতে হবে না? আর একটা সত্যি কথা বলব, আমি বিন্তির বাবা-মায়ের কোনো দোষ দেখি না। হতদরিদ্র এই পরিবার মেয়ের বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে? দোষটা আমাদের সকলের। তাই দায়িত্ব আমাদের। তাৎক্ষণিক কোনো সমাধানে লাভ হবে না।'

রেবা মনে হয় আমার লেকচারে সামান্য শান্ত হল। বলল, 'আজকাল এরকম তো হচ্ছে। মেয়েরাই প্রতিবাদ করছে।'

'বললাম তো। এই মুহূর্তে বিন্তির প্রতিবাদ করার সাহস নেই। সে নিজে পুলিশের কাছে যেতে পারবে না। সেই কারণেই বিষ খাবার পরিকল্পনা করেছে। অন্তত ঘটনা শুনে আমার তো সেরকমই মনে হয়েছে। যদি বা এখন কিছু না করে, বিয়ের পর করবেই।'

BanglaBook.org

রেবা একটু চুপ করে থেকে চিন্তিত গলায় বলল, 'তুমি ওর ভাইকে পাঠালে কেন? ওইটুকু ছেলে কী পারবে?'

'আমি তো পাঠাইনি। সে নিজেই যাবে। আমি পাঠালে না হয় একটা কথা ছিল। যে নিজের জোরে যুদ্ধে যায় তার পরাজিত হবার সম্ভাবনা কম থাকে।'

কথা শেষ করে আমি হাসলাম। রেবা বলল, 'আমার টেনশন হচ্ছে। মেয়েটা এর মধ্যে কিছু করে না বসে। এই বয়েসের ছেলেমেয়েরা খুব সেনসেটিভ হয়। মেয়েরা বিশেষ করে।'

আমি শেষ খোঁচাটা মারলাম। বললাম, 'তুমি বিষ খাওয়ার কথা বলছ রেবা? অত চিন্তার কী আছে? খেলে খাবে। ধেড়ে মেয়ে। তাছাড়া বললাম তো, এখন না খেলে, পরে খাবে। আমাদের যতটুকু করবার করলাম। এর বাইরে যা ঘটবার তা-ই ঘটবে। আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই।'

রেবা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তুমি আবার কী করলে? কিছু তো করোইনি। একটা এগারো-বারো বছরের ছেলেকে উসকে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে আছ। গ্রামের নাম কী, কোন থানা? দাঁড়াও কাগজ পেন নিয়ে এসে টুকি।'

আমি অবাক গলায় বললাম, 'গ্রাম থানার নাম জেনে কী করবে রেবা? তুমি যাবে?'

রেবা থমথমে গলায় বলল, 'হ্যাঁ। যাব।'

রেবা কাগজ পেন আনতে গেল। আমি নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রেবা ফিরে আসবে। কাগজে গ্রামের নাম লিখে নেবে। সুদূর লামডিং-এ বসে সে মন্দিরগ্রামের কান্তি বিন্তিদের দুঃখের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যে বহু কারণে রেবাকে এত ভালবাসি তার একটা আগেই বলেছি। আর একটা হল, অসহায়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া। এত ভালবাসা কি শুধু মেয়েদেরই থাকে!

BanglaBook.org

আট

অভয়পদবাবু তাঁর গোল চশমা নাকের ওপর আরো নামিয়ে বললেন, 'আপনি সত্য বলছেন!'

আমি খানিকটা মৌরি মুখে দিয়ে বললাম, 'অবশ্যই সত্যি বলছি। আপনি খোঁজ নিন। আপনার পুঁটিকুমারকে ওরা ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখেছে।'

অভয়পদবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'এতবড় সাহস! আমার পুঁটিকুমারকে বেঁধে রেখেছে! ওরা কারা বাঁধবার? যদি বাঁধবারই হয় আমি বাঁধব। কে ওরা বলুন তো সাগরবাবু? আমার কর্মচারীকে বাঁধছে! মারছে! হারামজাদাদের দাঁত ভেঙে দেব।'

আমি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বললাম, 'যতদূর খবর পাচ্ছি, একটা ভাড়া খাটা ছেঁদো ডাকাত আর তার কিছু চেলাচামুণ্ডা এই ব্যাপারে জড়িয়ে আছে।'

অভয়পদবাবু গলায় হুংকার দিলেন, 'ডাকাত! আমার কর্মচারীকে ডাকাত ঘরে বন্দি করে রাখে কোন সাহসে?'

আমি বললাম, 'কোন সাহসে সে আপনি জানেন স্যার। আজকাল তো এমনই হয়। ভাল লোককে ডাকাত বন্দি করে রাখে, আর ডাকাতরা ট্যাঙ ট্যাঙ করে ঘুরে বেড়ায়। আপনার মতো ভদ্রলোকরা পাত্তাও পায় না। কালে কালে দেশটার পজিশন খুবই খারাপ দিকে যাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় রসাতলে যেতে আর কত দেরি?'

আমার কথা শুনে অভয়পদবাবু মুখে 'হুম্‌মম...' শব্দে চাপা গর্জনের মতো করলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর আমি একটা চান্স নিয়েছিলাম। ঢিল ছুঁড়েছিলাম বলা যায়। পুঁটিকুমারের মালিককে খেপিয়ে তুলতে পারলে

BanglaBook.org

কেমন হবে? খেপিয়ে যদি ঘটনায় জড়িয়ে নেওয়া যায়? ভেবেছিলাম, হবে না, তবু ভাবলাম, ট্রাই নিতে দোষ কী? কোনো দোষ নেই। মানুষের গোটা জীবনটাই তো ট্রাই, ট্রাই এবং ট্রাই! লেবু ছাড়া ডাল ভাত খেতে খেতে প্ল্যান করছিলাম। এর আগেই অন্য কর্মচারীদের কাছ থেকে খবর নিয়ে নিয়েছি। পুঁটিকুমার দিদির বিয়ের নাম করে ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে গেছে কাল রাতেই। যাবার আগে তার মুখ ছিল থমথমে। কে যেন আমার নাম করে তাকে কী একটা বলতে গিয়েছিল, পুঁটিকুমার তাকে বলেছে, খবরদার, ওই লোকের নাম তার সামনে যেন কেউ না করে। শুধু ভাত খেতে এলে পাচার করা লেবুর টুকরো যেন পাতে দেওয়া হয়। লেবুর টুকরো যেন বড় সাইজের হয়। সেই লেবু মেখে ডাল ভাত খেতে খেতে প্ল্যান ঠিক করে নিলাম। অভয়পদবাবুর মালিকানাবোধে টোকা মারতে হবে। মালিকানাবোধ একটা স্পর্শকাতর বিষয়। যারা মালিক তারাই কেবল বুঝতে পারে। খাওয়া শেষ করে হাসি মুখে গিয়ে অভয়পদবাবুর সামনে গিয়ে বসলাম। তারপর টকাস...। ঢিলটা যে এত সহজে লেগে যাবে ভাবতে পারিনি। আসলে যাবতীয় লক্ষ্যভেদের এটাই নিয়ম। ফিফটি ফিফটি চান্স। অর্জুন যে মাছের চোখে তীর মেরেছিল তাও একই তত্ত্বে। আচ্ছা, লক্ষ্যভেদ ফিফটির বদলে যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট ফিফটি কাজ করত? তাহলে মহাভারত কি অন্যভাবে লেখা হত?

চশমার লাল সুতো উড়িয়ে অভয়পদবাবু আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন। বললেন, 'আচ্ছা, আমার কী করা উচিত বলে আপনার মনে হয় সাগরবাবু?'

আমি পায়ের উপর পা তুলে বসলাম। চেয়ারে হেলান দিলাম আয়েশ করে।

'সেটা নির্ভর করছে আপনি কতটা মালিক তার উপরে। যদি হাফ মালিক হন তাহলে একরকম কথা। তখন আপনি শুধু ধার বাকি নিয়ে ভাববেন। যেমন ধরুন আমার এক মামা ছিলেন, তিনি সারাক্ষণ সেপটিক ট্যাঙ্ক নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতেন। তাঁর ভয় হত, এই বুঝি ট্যাঙ্ক উপচে কেলেঙ্কারি ঘটবে। বাড়ির অন্য কোনো সমস্যায় তাঁর মনই ছিল না। মামী রেগে গিয়ে বলতেন, তুমি কি শুধু বাড়ির

গু'য়ের মালিক? বাড়ির অন্য কিছুর মালিক নও? আসল ব্যাপারটা হল তা-ই। মালিক যদি আপনি শুধু গু'য়ের হন তাহলে একরকম কথা, আর যদি গোটা বাড়ির হন তাহলে আরেকরকম কথা। যদি ওনলি গুয়ের হন তাহলে খুব একটা মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমার মতো কোন ছ্যাঁচড়া ধারবাকিতে চাট্টি ভাত ডাল খায় তাই নিয়ে মাথা ঘামালেই চলবে, আর যদি গোটা বাড়ির হন তাহলে স্যার, আপনাকে নিজের কর্মচারী পুঁটিকুমারকে নিয়েও ভাবতে হবে। তাকে আটকে রাখলে গিয়ে উদ্ধার করতে হবে।'

কথা শেষ করে আমি দুহাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলাম। অভয়পদবাবুর অবস্থা ঢিলা। সুতো চশমা নিজে থেকেই ঝুলে গেছে। ইয়ের মতো অমন একটা শব্দ যে কেউ এমন অবলীলায় বারবার উচ্চারণ করতে পারে তাতেই তিনি বিহ্বল। অপমানিতও বটে। আমি দুহাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙলাম। অভয়পদবাবু পিঠ সোজা করে বসলেন। চোখ দেখে মনে হচ্ছে, মানুষটার রাগ বাড়ছে। বাড়ারই কথা। মালিকানার প্রশ্ন খুব কঠিন প্রশ্ন। এড়ানো মুশকিল।

অভয়পদবাবু বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি যাব। আমি এখনই যাব। দেখব কোন হারামজাদা আমার কর্মচারীর গায়ে হাত দেয়।'

আমি উঠে পড়ে বললাম। বললাম, 'সাবধানে যাবেন। আজকাল চোর ডাকাতরা ভদ্রলোক দেখলেই পেটাচ্ছে।'

অভয়পদবাবু চোখ কটমট করে বললেন, 'পেটালে পেটাবে। আমাকে ওসব ভয় দেখাবেন না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন।'

আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'খেপেছেন? আমি এসবে নেই। বিয়ে ভাঙচির কেসে ঢুকে মরব নাকি? তাছাড়া আমাকে আপনার ধারবাকির টাকা জোগাড় করতে হবে না?'

অভয়পদবাবু হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'আমাকে ধারবাকির ভয় দেখাবেন না সাগরবাবু। খবরদার ভয় দেখাবেন না। আপনার মতো ফুটো পার্টিকে আমি সারাজীবন বসিয়ে খাওয়াতে পারি। আমাকে বলে কিনা গুয়ের মালিক। এত বড় সাহস। অ্যাই কে আছিস, ট্যাক্সি ডাক...।'

অভয়পদবাবুর হম্বিতম্বির মধ্যেই আমি গুটি গুটি বেরিয়ে এলাম। আমার ডিউটি শেষ। বিন্তি উদ্ধারের কর্মকাণ্ডে বারো বছরের পুঁটিকুমার, লামডিংবাসী রহস্যময়ী রেবা, সুতো বাঁধা চশমা পরা অভয়পদবাবু (সঙ্গে ভাত-ডাল হোটেলের কর্মীবৃন্দ) নেমে পড়েছে। আমার কাজ ছিল একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে খানিকটা ক্রোধ ছড়িয়ে দেওয়া। আশাকরি আমি তা পেরেছি। এর বেশি আমি কী করব? কী বা পারি আমি? অলস, বেকার, অকর্মণ্য এক যুবক। সাহসও নেই, ক্ষমতাও নেই। চেহারাও রোগা পটকা। শুধু অনেকটা ধারবাকি আর খানিকটা বিশ্বাস নিয়ে টিঁকে আছি। যেমন বিশ্বাস করি, বিন্তির মতো মেয়েদের বাঁচাতে হলে জ্ঞানগর্ভ লেকচার, পত্রপত্রিকার মুখ টেপা প্রবন্ধ, টিভি চ্যানেলের পাউডারের থেকে আগে দরকার 'রাগ'। গনগনে রাগ। সেই রাগ বিন্তিদের বাঁচবার পথ আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে দেবে। আমি পুঁটিকুমার, রেবা, অভয়পদবাবু সবাইকে রাগাতে পেরেছি। ওরা মাঠে নেমে পড়েছে। সমস্যা একটাই। ওরা সবাই আমার ওপর রেগে গেছে। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। রাগে আমার অভ্যেস আছে। বরং রাগ না দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি হয়।

দুপুরের খাওয়াটা একটু বেশির দিকে হয়ে গেছে। বেটারা ডবল ভাত খাইয়ে দিয়েছে। একটু গড়িয়ে নিলে ভাল হত। গড়াব কোথায়? আমার জন্য খাট পালঙ্ক কে সাজিয়ে রেখেছে?

শুয়ে আছি চৌবাচ্চা শহিদবেদির ওপর। বেদির গায়ে অস্পষ্টভাবে লেখা 'তিনি ছিলেন নারী মুক্তির প্রজ্বলিত শিখা...।' কে তিনি? যে-ই হোন, আমার ঘুম পাচ্ছে। আহা! শহিদবেদিতে ঘুমোতে এত আরাম!

ঘুমের মধ্যে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখলাম। লামডিং-এর পাহাড়ের ধারে আমি আর রেবা দাঁড়িয়ে আছি মুখোমুখি। আমাদের পিছনে পাহাড় উঠে গেছে। সামনে গিরিখাদ। রেবা আমার ওপর রেগে আছে খুব। বলছে, 'ছি ছি, বিন্তিকে উদ্ধার না করে তুমি আমার কাছে চলে এলে! ছি ছি।'

ফিসফিস করে বললাম, 'আমি কি চলে যাব?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, চলে যাবে। এখনই চলে যাবে। যাবার আগে আমার কাছ থেকে শাস্তি নিয়ে যাবে। পানিশমেন্ট।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'শাস্তি! পানিশমেন্ট! কী শাস্তি রেবা?'

রেবা এগিয়ে এসে গাঢ় স্বরে বলে, 'আমি তোমাকে চুমু খাব। অনেক লম্বা একটা চুমু। যতক্ষণ আমি চুমু খাব তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি দেখতে চাই মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে একজন পচা মানুষকে চুমু খেতে কেমন লাগে।'

এবার দ্রুত পুঁটিকুমারকাণ্ড শেষ করি।

মন্দিরগ্রামে পুঁটিকুমারকে কেউ বেঁধে রাখেনি ঠিকই, কিন্তু তাকে আটকে রেখেছিল। আটকে রেখেছিল তার বাবা-মা। আটকে রাখাটাই স্বাভাবিক। যে বালক তার কিশোরী দিদিকে বিয়ের মুখ থেকে ছিনিয়ে রাতের অন্ধকারে কলকাতা পালিয়ে আসতে চেষ্টা করে তাকে আটকে রাখা ছাড়া আর কী বা পথ থাকে? অভয়পদবাবু তাঁর রেস্টুরেন্টের লঙ্কা মহাশয়, শ্রীমান উচ্ছে, পটলনাথ, মুসুরপ্রসাদকে নিয়ে মন্দিরগ্রাম পৌঁছোলে বড় গোলমাল শুরু হয়। বিন্তির ভাবী ডাকাত বর লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ করে। রেবা আসেনি। লামডিং থেকেই রেবা তার রিটায়ার্ড পুলিশ বাবাকে দিয়ে আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। হাবড়া থানার পুলিশ ঠিক সময় ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যায়। বিন্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই মুহূর্তে বিন্তি তার ভাই এবং বাবা-মায়ের সঙ্গে লামডিং। রেবার ওখানে বেড়াতে গেছে। বিন্তিকে নাকি রেবার খুব মনে ধরেছে। ঠিক হয়েছে আপাতত সে ওখানে থেকেই লেখাপড়া করবে। গোটা ফ্যামিলির যাতায়াতের খরচ দিয়েছে রেবা। শুধু পুঁটিকুমার বাদ। শুনলে বিশ্বাস হবে না, পুঁটিকুমারের খরচ ভাত-ডাল হোটেলের মালিক অভয়পদবাবু রেবার কাছ থেকে নিতে দেননি। বলেছেন, 'আমার কর্মচারী, আমি যাতায়াতের ভাড়া দেব। আমার কর্মচারীর বেড়াতে যাবার পয়সা অন্য কেউ দেবার কে? মনে রাখবেন আমি মালিক। কী ভাবেন আমাকে, আমি কি শুধু ইয়ের মালিক?'

আমি রেবাকে ফোন করে খুব বিনয়ের সঙ্গে জিগ্যেস

BanglaBook.org

করেছিলাম, 'আমি কি বিন্তিদের সঙ্গে লামডিং যেতে পারি? অনেকদিন কলকাতার বাইরে যাওয়া হয় না। পকেটে পয়সা নেই। তোমার খরচে বেড়িয়ে আসতাম।'

রেবা বলেছে, 'না, আসবে না। তোমাকে দেখার থেকে, না দেখতে পাওয়ার মন কেমন আমার কাছে অনেক বেশি দামি। তুমি আসবে না।'

আমি কি ছাই তখন জানতাম, কিছুদিনের মধ্যেই রেবা নিজে কলকাতায় এসে যাবে আর আমাদের জীবনে একটা ভয়ংকর রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটবে?

BanglaBook.org

নয়

'তোমার নাম সাগর?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তুমি করে বললে অসুবিধে আছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার। এখন অসুবিধে হচ্ছে না, তবে পরে কী হবে বলতে পারছি না। বাংলা ভাষায় সম্বোধন বিষয়টা সময়ের সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তনশীল। ডাইরেক্টলি প্রোপরশনেট।'

'যেমন?'

'যেমন ছেলেমেয়ের পরিচয়তে আপনি। সেই ছেলেমেয়েদের যখন প্রেম হয় তখন সম্বোধন হয়ে যায় তুমি। বিয়ের পর তা-ই চলতে থাকে। হঠাৎ একদিন ঝগড়া মারামারির সময় সম্বোধন নেমে যায় "তুই" পর্যন্ত। এটা হল অবনমন। উত্তরণও আছে স্যার। যেমন ধরুন পাড়ার গুণ্ডা গোল্লা। গুণ্ডামির সময় পুলিশের কাছে গোল্লা সম্বোধন পায় তুই, ইলেকশনে দাঁড়ালে গোল্লার জোটে তুমি, মন্ত্রী হলে আপনি।'

'তোমার থিয়োরি ঠিক কিনা জানি না সাগর। তবে ইন্টারেস্টিং। ঠিক আছে, অসুবিধে হলে জানাবে, সম্বোধন পালটে নেব।'

'আচ্ছা।'

'তমাল কি তোমাকে জানিয়েছে কাজটা কী?'

'পুরোটা বলেনি। বলেছে, একটা খুনের ব্যাপার আছে। কিন্তু কাকে খুন, কেন খুন সেসব কিছু বলেনি।'

'হুঁ। সাগর, তুমি আগে কখনো খুন করেছ?'

'না স্যার, আমি আগে কখনো খুন করিনি।'

'বড় কোনো ক্রাইম করেছ?'

BanglaBook.org

'মনে পড়ছে না। তবে মনে হয় করেছি। রেবা আমাকে মাঝেমধ্যে বলত, তুমি একজন ক্রিমিনাল।'

'রেবা! সে কে? তোমার স্ত্রী?'

'না স্যার, রেবা আমার স্ত্রী নয়।'

'গার্লফ্রেন্ড?'

'বুঝতে পারি না। কখনো মনে হয় ফ্রেন্ড, কখনো মনে হয় এনিমি। বারবার দেখা হলে, বেশি কথা হলে বিরক্ত লাগে। আবার বেশিদিন দেখা না হলে মন কেমন করে। সম্পর্কে গোলমাল আছে মনে হয়।'

'কীরকম গোলমাল?'

'রেবা আমাকে একবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি সেই প্রস্তাবে না বলায় সে খুবই খুশি হয়। বলেছিল, সে নাকি জানত প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করব। এই কারণে সে আমাকে এত ভালবাসে...আমি রাজি হয়ে গেলে বিয়ে তো করতই না, আমাকে আর ভালওবাসত না। এটাকে গোলমাল ছাড়া আর কী বলব?'

'এটাও ইন্টারেস্টিং। তোমার ওই রেবা কি বিয়ে করেছে?'

'এখনো করেনি। তার পুলিশ অফিসার বাবা চাকরি থেকে অবসর নিলে তাঁর সঙ্গে লামডিং চলে গেছে। সেখানে ফার্ম চালায়। গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ায়।'

'সাগর, তোমার বাড়িতে কে আছে? বাবা-মা?'

'আমার বাড়িতে কেউ নেই। আমার বাড়িও নেই। বাবা-মা দেশের বাড়িতে থাকেন। সত্যি কথা বলতে কী তাঁরা থাকেন শ্রী শ্রী গোকুলচন্দ্রনাথের জমি বাড়িতে।'

'গোকুলচন্দ্রনাথ! তিনি কে! তুমি তো দেখছি একটার পর একটা নাম বলতে শুরু করেছ।'

'তিনি একজন দাপুটে জমিদার স্যার। ডাকাতও বলতে পারেন। বেশিরভাগ জমিদাররাই আসলে ডাকাত। দেড়শো বছরের কিছু আগে এই ডাকাত জমিদার আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন বলে জানতে পেরেছি। সেই অর্থে আমার মধ্যে ক্রিমিনালের রক্ত আছে। খুন ডাকাতির জিন খুব মারাত্মক স্যার। শুনেছি চট করে মরে না।'

BanglaBook.org

'তোমাকে এত প্রশ্ন করছি বলে রাগ হচ্ছে?'

'এ আপনি কী বলছেন! রাগ হবে কেন? ক্যান্ডিডেটের ইন্টারভিউ নিয়ে জেনেবুঝেই তো মানুষ কাজ দেয়। বড় বড় অফিসের ম্যানেজার হতে গেলে যদি ইন্টারভিউ দিতে হয়, খুনি হতে গেলেও ইন্টারভিউ দিতে হবে। সহজ হিসেব। আমি তো আর বিনিপয়সায় খুন করব না। এর মধ্যে রাগের কী আছে?'

'তোমাকে কখনো পুলিশ ধরেছে?'

'একবার ধরেছে। অনেক রাতে পাঁচিল টপকে চিড়িয়াখানায় ঢুকেছিলাম। চিড়িয়াখানার গার্ডেরা ধরে থানায় চালান করে দিয়েছিল।'

'চুরি করতে ঢুকেছিলে?'

'না স্যার। বাঘ দেখতে গিয়েছিলাম।'

'রাতে বাঘ দেখতে চিড়িয়াখানায়! কেন?'

'রাতে জঙ্গলে জিপে চেপে বা ওয়াচ টাওয়ারে বসে বাঘ দেখা আইনি, কিন্তু চিড়িয়াখানায় রাতে বাঘ দেখা বেআইনি, আমার জানা ছিল না। আমি মনে করি, দুনিয়ার বেশিরভাগ আইনই যুক্তিহীন।'

'আসলে কী জান সাগর, আমি বুঝে নিতে চাইছি যদি ধরা পড়ে জেলে যাও, তোমার পরিবার কতটা সমস্যায় পড়বে?'

'আমার কোনো পরিবার নেই।'

'গুড।'

আমি যে মানুষটার সামনে বসে আছি তার নাম মন্মথ। মন্মথ তালুকদার। মন্মথ, জগন্ময়, অমলেন্দু ধরনের নাম অবসোলিট হয়ে গেছে। এখন সব কায়দা করা সুন্দর সুন্দর নাম। সৌহার্দ্য, কুষগ্রধী, দেবায়ুধ। ডাকতে গেলে আগে ক-বার রিহার্সাল দিয়ে নিতে হবে। ধরা যাক রাস্তা দিয়ে হন হন করে দেবায়ুধ নামে কোনো তরুণ হেঁটে যাচ্ছে, তাকে এখনই ডাকা দরকার। কিন্তু ডাকা যাবে না। আগে মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে কয়েকবার 'দেবায়ুধ', 'দেবায়ুধ', 'দেবায়ুধ' বলে অভ্যেস করে নিতে হবে। তারপর গলা তুলে ডাকতে হবে। রিহার্সালের ফাঁকে ওই ছেলে চোখের আড়ালে চলে যেতে পারে। ফট করে বাসে উঠে পড়তে পারে। পড়লে পড়বে। মনে রাখতে হবে, এখন ডাকাডাকির থেকে নামটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'মন্মথ' ধরনের নাম

BanglaBook.org

আঁকড়ে আজও যেসব মানুষ টিঁকে আছেন, তাঁদের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। প্রাচীন নাম, প্রাচীন মানুষ। এই নামের মানুষদের চেহারা হয় ভারিক্কি। টাক, ভুঁড়ি, সরু গোঁফ। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। এটাই নিয়ম। যদিও এই মুহূর্তে আমি যে মন্মথ তালুকদারের সামনে বসে রয়েছি তার বয়স মেরেকেটে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। লম্বা, ফর্সা। টাক তো দূরের কথা, এক মাথা ঘন চুল। ক্লিন শেভড। গালে হালকা সবুজ আভা। চোখে দামি চশমা। সেই চশমার ফ্রেম, কাচ কিছুই দেখা যায় না। কালো ট্রাউজারের ওপর আকাশি নীল রঙের একটা ফর্মাল শার্ট। কথাবার্তা, চেহারায় ঝকঝকে। আমাদের ধারণার মন্মথ আর আসল মন্মথের মধ্যে অনেক ফারাক। এটাই ঘটে। জীবনের বেশিরভাগ ধারণার সঙ্গে আসলের মিল থাকে না। ভাগ্যিস থাকে না। ধারণার সঙ্গে আসল মিলে গেলে বেঁচে থাকবার মজাটাই নষ্ট হয়ে যেত।

আমি এখন নরেন্দ্রপুরে। মন্মথ তালুকদারের অফিসে। অফিস একবারে অন্যরকম। ঘাবড়ে যেতে হয়। তমালের মতো কাচে ঘেরা হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার অফিস নয়। বাগানে চেয়ার টেবিল পাতা খোলা আকাশের নীচে অফিস। কাচের ঘরের চেয়ার টেবিল নয়, বাগানের সঙ্গে মানানসই চেয়ার টেবিল। একপাশে গাছের ডালে বাঁধা হ্যামক ঝুলছে। মনে হয়, কাজ করতে করতে টায়ার্ড হয়ে পড়লে রেস্ট নেওয়ার ব্যবস্থা। যে কর্মচারী ছেলেটি আমাকে এই বাগান অফিস পর্যন্ত নিয়ে এসেছে সে-ই জানাল, 'এটাই স্যারের অফিস।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এই বাগানে!'

ছেলেটি গম্ভীরভাবে বলল, 'কোনো অসুবিধে নেই। রোদ বা বৃষ্টি হলে ছাতার ব্যবস্থা আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন স্যারকে খবর দেওয়া হয়েছে।'

'স্যার'কে যে খবর দেওয়া হয়েছে আমি জানি। গেট থেকেই সিকিউরিটি ইন্টারকমে ফোন করে দিয়েছে। আমি গার্ডেন চেয়ারে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাছপালা, ফুল-টুল দেখতে লাগলাম। বাগান বড় নয়, তবে খুব সাজানো গোছানো। একদিকে ছোটখাটো একটা ঢিবি। গা থেকে ঝরনার জল পড়ছে। ঢিবি ঘিরে নুড়ি পাথরের পথ।

উঁচু পাঁচিল ধরে বড় বড় গাছ। পর্দার মতো। বাইরে থেকে ভিতরটা দেখা যাচ্ছে না। অনেক খরচাপাতির ব্যাপার। তবে টাকা থাকলেই এই জিনিস হয় না। ঠিক মতো পরিকল্পনা লাগে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি বাগান অফিসের প্রেমে পড়ে গেলাম। সত্যি তো, অফিস শুধু কাচের ঘরেই করতে হবে কেন? এমন কোনো নিয়ম কি আছে? অফিস ইচ্ছে করলে গাছের তলাতেও হতে পারে। ঝাপসা একটা জামগাছের তলায় কেউ যদি টেবিল চেয়ার পেতে কম্পিউটার নিয়ে বসে অসুবিধে কোথায়? এসির ঠাণ্ডা হাওয়ার বদলে ন্যাচারাল ঠাণ্ডা হাওয়ায় অডিটের কাজ করলে কি ভুল হয়ে যাবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো ইট পাথরের স্কুল থেকে বেরিয়ে গাছের তলায় স্কুল বানিয়েছিলেন। আগে কেউ ভাবতে পারত? সেই স্কুলে পড়ে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা তো কিছু কম লেখাপড়া শেখেনি। তাহলে অফিসের বেলায় আপত্তি হবে কেন? না, এই মন্মথ তালুকদার মানুষটাকে 'অন্যরকম' মনে হচ্ছে।

'স্যার, আমার ইন্টারভিউ কি হয়ে গেছে?'

মন্মথ বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'তুমি কী খাবে সাগর? চা-কফি? ঠাণ্ডা কিছু?'

আমি মাথা চুলকে বললাম, 'স্যার, কিছু মনে করবেন না। চা কফির বদলে কি কিছু খাবার পাওয়া সম্ভব?' খুব খিদে পেয়েছে।

মন্মথ খানিকটা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইন্টারকমে স্যান্ডউইচের অর্ডার দিলেন। আমার যে এখনই খাওয়ার দরকার এমন নয়। ক্লায়েন্টকে হালকা ঘাবড়ে দেবার জন্য খাবার চাইলাম। আমরা অনেক বিষয়ে খোলামেলা হয়েছি। পোশাকে, মনে, ব্যবহারে। খাটো পোশাক পরে তুমি হাত দেখাও, বুক দেখাও, পা দেখাও ক্ষতি নেই। মনে তুমি কুচুটে, হিংসুটে, স্বার্থপর হও সমস্যা নেই। ব্যবহারে তুমি অন্যকে অবজ্ঞা, অবহেলা করতে শেখ মেনে নেব। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলব 'আই ডোন্ট মাইন্ড'। কিন্তু পেট দেখালে সমস্যা। তাও পেটের বাইরেটা হলে কথা ছিল। আধুনিকতার কল্যাণে নারীর নাভির সঙ্গে পুরুষের অন্তর্বাস দর্শনে আমরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু পেটের ভিতরটা যদি দেখতে হয় তাহলে অস্বস্তি লাগে। এ আবার কী অসভ্যতা! বেটা

BanglaBook.org

ভিখিরি। দ্বিতীয় অস্বস্তি হল, আমাকেও কোনোদিন অন্যকে খিদে দেখাতে হবে না তো? সেন্স অব ইনসিকিউরিটি। ক্লায়েন্ট মন্মথ তালুকদার ধনী মানুষ। খাবার কথা বলে তাকে ঘাবড়ে দিলাম। হালকা দাবড়ানির মতো হালকা ঘাবড়ানি। তমাল আমাকে যখন কাজটা দেয় ক্লায়েন্ট সম্পর্কে বলেছে।

'ভদ্রলোক ভাল। শিল্পী মানুষ।'

আমি রেগে গিয়ে বলি, 'ভালমানুষ! খুন করবার জন্য লোক খুঁজছে, আর তাকে তুই ভালমানুষ বলছিস? তুই কি খেপে গেলি? নাকি পয়সা খেয়েছিস?'

তমাল না কাটা পেনসিলটা এবার ঠোঁটের বদলে টেবিলে টোকা দিতে দিতে বলল, 'মানুষ খুন করতে চাইলেই খারাপ হয় তোকে কে বলল? এই যদি তোর মতো আলসে ছেলেকে এখন ধরে বেঁধে দশ ঘণ্টার কাজে ঢুকিয়ে দিই, তুই কী করবি? আমাকে খুন করবি না?'

আমি বললাম, 'চাইব, কিন্তু পারব না।'

'এই মন্মথর বেলাতেও তা-ই হয়েছে। উনি চাইছেন, কিন্তু পারছেন না।'

আমি উত্তেজিত গলায় বললাম, 'তা বলে আমাকে এই কাজ দেওয়ার কথা তোর মাথায় এল কী করে? তোর কি ধারণা টাকার জন্য আমি খুনও করতে পারি? এটা ঠিকই যে রোজগারের জন্য মাঝেমধ্যে নানা ধরনের ধান্দা করতে হয়। বাঁধাধরা চাকরি বা ব্যবসা ট্যাবসা কিছু করতে পারি না। পৃথিবীর বহু দেশেই এই রীতি আছে। অড জবস করে পেট চলে। কিন্তু তার মানে কি খুন! আমি কি সুপারি কিলার? সুপারি দিবি আর ফটাফট মানুষ মেরে বেড়াব? চাকরিতে বড় পোস্টে গেছিস বলে তুই ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস। অমন বড় পোস্ট আমার অনেক দেখা আছে। আমি কি শুধু টাকার জন্য এতদিন তোর দেওয়া কাজ করি? মোটেই নয়। কাজগুলো অন্যরকম (আমার যা আছে, তিন নম্বর চিঠি এবং রাজকন্যা কাহিনিতে এইসব অন্যরকম কাজের কিছু রোমহর্ষক নমুনা আছে) বলেও করি। তুই ভাল করেই জানিস তমাল, আমি তোর মতো ভ্যাবলা মার্কা জীবনযাপন করি না। আমি মনে করি জীবন, রোমান্টিক এবং রোমাঞ্চকর। জীবন রেসের মাঠের

BanglaBook.org

ঘোড়া নয় যে রোজগারের জন্য সে শুধু পড়িমড়ি করে দৌড়ে বেড়াবে। জীবন ইচ্ছে করলে বেলা পর্যন্ত ঘাপটি মেরে ঘুমোবে, আবার ইচ্ছে হলে হাফ চেনা কোনো মানুষের জন্য হাসপাতালে রাতও জাগবে। এবার চা কফি কিছু দিতে বল। দুধ চিনি ডবল দিতে বলবি। তোর কথা শুনে অপমানিত বোধ করছি। 'জাস্ট নাউ' নামে কোন এক সায়েন্স ম্যাগাজিনে পড়লাম, দুধ চিনি খেলে নাকি অপমানবোধ তাৎক্ষণিকভাবে কমে। আজ পরীক্ষা করে দেখি।'

আমি থামলে তমাল ঘরে পিওন ডেকে দুকাপ চায়ের কথা বলল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চা চলেও এল। বসেদের জন্য জল কি তাড়াতাড়ি ফোটে? হতে পারে। হয়তো বসদের জল ফোটবার তাপ একশোর বদলে পঁচাত্তর ডিগ্রি। নেতা হলে ফুটবে আরো কমে। ষাটেই টগবগাবে। মন্ত্রী হলে পঞ্চাশেই খেল খতম।

স্যান্ডউইচে প্রথম কামড়টা দেবার পর মন্মথ বলল, 'খুনটা করতে হবে আমার স্ত্রীকে। আমার স্ত্রীর নাম মালঞ্চমালা। মালঞ্চমালা সেন। বিয়ের পর পদবি বদলায়নি।'

বুকটা ধক করে উঠল। মালঞ্চমালা! কী সুন্দর নাম! এ কি সেই স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা? স্বপ্ন কি তবে রিপিট হচ্ছে?

BanglaBook.org

দশ

স্বামীর হাতে স্ত্রী হত্যা চমকাবার মতো কোনো বিষয় নয়। আমিও চমকালাম না।

অপরাধ বিজ্ঞানের পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যাবে, আমাদের দেশে এই ধরনের ঘটনার স্থান তালিকার ওপর দিকে। এদেশের স্বামীরা বউ পেটানো এবং খুনে যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত। বউয়ের গালে কষিয়ে চড় মারা অথবা গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই মেরে দেওয়া আমাদের কাছে তুরুশ্চু। অন্য কায়দাও জানি। সংসারের জাঁতাকলে ফেলে বউকে তিলেতিলে মারতেও পারি। এই খুনে মজা আছে। বউ নিজেও বুঝতে পারবে না। সে ভাবে সংসার করে পুণ্যি করছি। কর্তব্য করছি। কীভাবে বউ মারব সেটা নির্ভর করছে স্ট্যাটাসের ওপর। উচ্চবিত্ত এবং শিক্ষিত স্বামীদের মধ্যে বউকে পুরো না মেরে আধমরা করে রাখবার প্রবণতা বেশি। অতি চমৎকার। একইসঙ্গে বউ বাঁচে, আবার মরে। এই বিষয়ে আমার একটা সুন্দর ঘটনা জানা আছে। ঘটনাটা এই সুযোগে বলে নিই।

মেয়ের নাম বিতস্তা, ছেলের নাম শূদ্রক। বিতস্তা ছিল সেতার পাগল। অল্পবয়েসেই মিষ্টি হাত হয়েছিল। বাসররাতে বউয়ের সেতার শুনে শূদ্রকের বুক এক হাত ফুলে উঠল। সবার থাকে সুন্দরী বউ, তার হল সেতারি বউ। কিন্তু হায়রে, পথের মোড়ে যে বাঁক আছে কে জানত? বিয়ের একমাস পর থেকেই সেতার কোলে বউকে দেখলেই শূদ্রক বিরক্ত হতে শুরু করল। বাড়ির বউয়ের একী কাণ্ড! সে কি উপপতি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছে? মুখে কিছু বলত না শূদ্রক, ভিতরে গুম মেরে থাকত। সাড়ে তিনমাসের মাথায় একদিন বলল। মুখে নয়, বলল হাতে। এক বৃষ্টির সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে সেতার তুলে মারল আছাড়। শূদ্রকের এই রাগের পিছনে যুক্তি আছে। আই আই টি

BanglaBook.org

থেকে পাশ করা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, জাপানি কোম্পানির অফিস সেরে বাড়ি ফেরার পর যদি দেখে বউ চা না বানিয়ে, কোলের ওপর সেতার রেখে, চোখ বুজে 'মিঞা কি মল্লার' বাজাচ্ছে তাহলে রাগ করবে না তো কী করবে? পাশে বসে তবলায় ঠোকা দেবে? তেরে কেটে তাক? শূদ্রক ঠিক করেছে। বেশ করেছে। আমি হলেও করতাম। শূদ্রক সেতার আছড়ে ভেঙেছে, আমি সেতারে আগুন লাগিয়ে দিতাম। তারপর বউকে ডেকে ঠাণ্ডা গলায় বলতাম, 'এই আগুনেই চা বানাও। আজ লিকার টি-র বদলে সেতার টি খাব।' আনন্দের খবর হল, সেতার বাজানো বন্ধ করে দিয়েছে বিতস্তা। সে এখন আধমরা। আধমরার মতো সাজগোজ করে, আধমরার মতো কথা বলে, ঘর সংসারের কাজ করে, হাসে এবং রাতে স্বামী ডাকলে বিছানাতে যায় আধমরার মতোই। সুবিধের বিষয় হল, ফুল মরার প্রাণ থাকে না বলে পুলিশ অ্যাকশন নিতে পারে। হাফ মরার প্রাণ থাকে, মন থাকে না। মনের ব্যাপার পুলিশের মধ্যে পড়ে না, ফলে তার অ্যাকশন নেওয়ার কিছু নেই।

মন্মথ তালুকদার তার বাগান অফিসে খোলা আকাশের নীচে বসে যেমন সহজ ভঙ্গিতে বউ খুনের কথা বলল, আমিও তেমন সহজ ভঙ্গিতে স্যান্ডউইচ খাওয়া না থামিয়ে বললাম, 'স্যার, আরেকবার বলবেন?'

লোকটা সম্ভবত আমার সহজ ভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ অবাক হল। চোখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল, 'অবশ্যই বলব। কাজটা যখন তুমি করবে সবটাই তোমাকে জানতে হবে। আমার স্ত্রীর নাম মালঞ্চমালা। তোমাকে তো বললাম। আমাদের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর হতে চলল। টু বি ভেরি স্পেসিফিক আর সাড়ে চার মাস পর পাঁচ বছরে পা দেব। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফিফথ অ্যানিভারসারির সামনে বসে আমাকে স্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। ছ'মাস হতে চলল মালঞ্চ বাড়ি ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে বুঝতে চায়নি। বিষয়টা এখন পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে পৌঁছেছে।'

আমি স্যান্ডউইচ শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছলাম। নির্লিপ্ত

BanglaBook.org

ভঙ্গিতে বললাম, 'একেবারে খুনে যেতে চাইছেন কেন?' কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম, ঠিক করলাম না। আমি সাপ্লায়ার (এক্ষেত্রে মৃত্যু সাপ্লাই করতে এসেছি)। পার্টি কেন 'মাল' (এক্ষেত্রে হত্যা) চাইছে তা নিয়ে সংশয় দেখানো আমার কাজ নয়।

মন্মথ চাপা ব্যথিত গলায় বলল, 'দুঃখের হলেও এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। মালা আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে। পালটা কোম্পানি খুলতে চলেছে। আমাদের ব্যক্তিগত ঝগড়াকে ব্যবসায়িক স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। আমার ক্লায়েন্টদের কাছে অ্যাপ্রোচ করতে শুরু করেছে, তারা যেন আমার কাছে কাজ না করে। এই অবস্থায় আমার আর অন্য কোনো পথ নেই।'

চা এল। চায়ের কাপ প্লেট ফিনফিনে। আমার কলেজের বন্ধু তীর্থঙ্কর বলেছিল, 'মনে রাখবি সাগর, যত বড়লোক তাদের কাপ প্লেট তত ফিনফিনে। আমাদের বাড়িতে এমন কাপ প্লেট আছে যে দেখতেই পাবি না।'

আমি জিগ্যেস করেছিলাম, 'তোরা বড়লোক বুঝি!'

তীর্থঙ্কর হাসিমুখে বলেছিল, 'ওই আর কি। আমরা বুঝতে দিই না, বড়লোকি দেখালে বাবা রাগ করে। তবে কাপ প্লেট দেখলে বোঝা যায়।'

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, 'আমিও শুনেছি। টাটা বিড়লার বাড়িতে চা খেতে গেলে ওরা টি পট থেকে হাতের আঁজলায় চা ঢেলে দেয়। চরণামৃত দেবার কায়দায়। ওরা তোদের থেকে একটু বেশি বড়লোক কিনা, তাই চায়ের কাপ একটু বেশি ফিনফিনে। শুধু মানুষ নয়, চা নিজেও সেই কাপ দেখতে পায় না। বাধ্য হয়ে হাতেই ঢালতে হয়।'

এই রসিকতা যে আসলে বড়লোকামির মুখে সপাটে চড় বুঝিনি। দুম করে বলে ফেলেছিলাম। তবে তীর্থঙ্কর এরপর তিনমাস আমার সঙ্গে কথা বলেনি। মন্মথ তালুকদারের অফিসের কাপ সত্যি পাতলা। 'এই বুঝি ভেঙে যাবে,' গোছের। আচ্ছা যা দামি তা-ই কি ঠুনকো? ভালবাসা বা অভিমান কেমন? দামি না সস্তা? রাগ? আমি সাবধানে কাপ নামিয়ে বললাম, 'আপনার কীসের বিজনেস জানতে পারি?'

BanglaBook.org

'বাগানের।'

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'বাগানের! মালি?'

মন্মথ মৃদু হেসে বলল, 'অনেকটা তা-ই। আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশোনা করেছি। যদিও ছোটবেলা থেকে আমার ঝোঁক ছিল ছবি আঁকায়। স্বপ্ন ছিল আর্টিস্ট হব। মাতিস আমার প্রিয় শিল্পী। শেষ পর্যন্ত আর্ট কলেজের বদলে যাদবপুর। আর্টিস্ট হওয়ার বদলে আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ার। বেঙ্গালুরুর চাকরি পেলাম। বাড়িঘরের ডিজাইনে মন ভরছিল না। ওখানেই আলাপ হয় মালঞ্চমালার সঙ্গে। মালঞ্চমালা সত্যি একজন আর্টিস্ট। তবে ছবির নয়, গানের। প্রবাসী বাঙালিদের অ্যারেঞ্জ করা এক ফাংশনে তার গান শুনে আমি মুগ্ধ হই।' এই পর্যন্ত বলে থামল মন্মথ তালুকদার।

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, 'গানটা কি আপনার মনে আছে?'

মন্মথ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'না, সুরটুকু হালকা মনে আছে। কেন বল তো?'

আমি লজ্জা পাওয়া ভঙ্গিতে বললাম, 'কোনো কারণ নেই, এমনি। আমি প্রেমের প্রথম সময়টা কালেক্ট করি। খাতায় লিখে রাখি।'

মন্মথ বলল, 'প্রেমের প্রথম সময় কালেক্ট কর মানে!'

মানুষটার চোখ-মুখই বলে দিচ্ছে, আবার হালকা ঘাবড়ে গেছে। খুন নিয়ে আলোচনার সময় এই ধরনের কথা যে কেউ বলতে পারে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি সুযোগ নিলাম। বানানো লাজুক হেসে বললাম, 'এটা আমার একটা শখ। স্ট্যাম্প সংগ্রহ, দেশলাই সংগ্রহ, খেলোয়াড়দের ছবি সংগ্রহের মতো প্রেমের মাহেন্দ্রক্ষণ সংগ্রহ। ওই সময়টা নিয়ে যখন যেমন শুনি নোট রাখি। যেমন ধরুন, কোনো মেয়ে প্রেমের প্রথম সময় ছেলে যে জামা পরেছিল তার রংটা মনে রেখেছে। কোনো পুরুষ হয়তো সেদিন প্রেমিকার নার্ভাস হয়ে যাওয়া ঠোঁটের কম্পনটুকু ভুলতে পারেনি। এরকম রেস্টুরেন্ট, সিনেমা, পার্ক, মুখের হাসি, চোখের জল কত কী যে আছে! আপনাকে বলতে অসুবিধে নেই স্যার, খানকতক চুমুর কেসও আমার কালেকশনে পেয়েছি। সেদিনই একটা অন্যরকম ঘটনা পেলাম। ছেলেমেয়ের প্রেমের প্রথমটা জুড়ে আছে গোবর। কাউ ডাং। নামকরা কলেজের

BanglaBook.org

ছেলেমেয়ের ঘটনা। এক্সকারশনে গিয়ে বান্ধবী ভচাস করে গোবরে পা দিয়ে বসল। ছেলে টিউবওয়েল টিপে গোবর ধোয়ার জল সাপ্লাই করল। ওই ধোয়াধুয়ির সময় প্রেম। পরে বিয়ে। স্যার, আনন্দের কথা হল, ওই দম্পতি এখনো কোথাও গোবর পড়ে থাকতে দেখলে মুগ্ধ হয়ে যায়। মানুষ অকৃতজ্ঞ। কত কী ভুলে যায়। এই ছেলেমেয়ে গোবর ভোলেনি স্যার। ভাল না?'

মন্মথ তালুকদার কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলাল। বলল, 'মালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর সিদ্ধান্ত নিই, চাকরি ছেড়ে দেব। বিজনেস করব। নিজের ফার্ম খুলব। শুধু আর্কিটেকচারের ফার্ম নয়, ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচারের কাজ করব। মালা নিজে শিল্পী, সে শিল্পীর তাগিদ বুঝল। আমাকে মদত দিল। বড় বড় হাউজিং, অফিস, হাসপাতাল, শপিং মলের চারপাশ সুন্দর করে সাজানোটাই আমাদের কাজ হবে। বাগান, জল, ড্রাইভওয়ে, থেকে শুরু করে বাইরে গেস্ট বসবার অ্যারেঞ্জমেন্ট, লবির ইনটিরিয়র, সবই ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচারের মধ্যে পড়ে। এতে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যে এবং ছবির প্রতি ভালবাসা দুটোই কাজে লাগবে। আজকাল ল্যান্ডস্কেপিং বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাগান না থাকলে কোটি টাকার ফ্ল্যাটও বিক্রি হবে না। আমরা কলকাতায় চলে এলাম। বিয়ে করলাম। শুরু হল যুদ্ধ। কোম্পানির নাম রাখলাম "বিউটিফুল"। সরল নাম। একটা সুন্দর জায়গা দেখলে মানুষের মুখ দিয়ে যে শব্দটা প্রথম বেরিয়ে আসে। একটা সময় "বিউটিফুল"-এর কাজ পেতে কষ্ট হত। এখন গোটা দেশে কাজ করি। আমরা বিভিন্ন শহরে সায়েন্স গ্যালারি থেকে আর্ট গ্যালারি, স্কুল, কলেজের ক্যাম্পাস সবই তৈরি করেছি।'

মন্মথ চুপ করল। আমি বললাম, 'আপনার মিসেস কি বিজনেসের কারণেই আপনাকে ছেড়ে চলে গেলেন? রাইভালরি?'

'না, বললাম তো, আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যা। কিন্তু এখন সেও একটা ফার্ম খুলতে চলেছে। আমাকে শেষ করতে চায়। মাইনে করা ইঞ্জিনিয়র এবং আর্টিস্ট রেখেছে। যেহেতু একসময় আমার বড় বড় ক্লায়েন্টদের অনেকের সঙ্গেই সে যোগাযোগ রাখত, এখন সেই সুযোগটা নিচ্ছে। আমি ওকে বারণ করেছি। বলেছি, নিজের মতো

বিজনেস করতে চাইছ করো, বিউটিফুলের ক্ষতি করছ কেন? ও শুনছে না। খবর পেলাম, সাতদিন আগে সিঙ্গাপুরের একটা পার্টির সঙ্গে কথা বলেছে। আমার পার্টি ছিল। কাজটা আমার পাওয়ার কথা ছিল। মালঞ্চ ঠিক করেছে, ওই কাজ দিয়ে নিজের কোম্পানি স্টার্ট করবে। আমি বুঝতে পারলাম, ও আসলে বিজনেস করতে চাইছে না, আমার স্বপ্নটার ক্ষতি করতে চাইছে।'

আমি অস্ফুটে বললাম, 'আবার সেই স্বপ্ন!'

'অবশ্যই স্বপ্ন। এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যের সঙ্গে আমার ছবি আঁকার প্যাশনকে মিশিয়ে কাজ করছি, সেটা স্বপ্ন ছাড়া কী? দুর্ভাগ্যের বিষয়, মালঞ্চ আমার স্বপ্নকে তছনছ করে দিতে চাইছে। তাই আমি বাধ্য হয়ে ওকে...।'

আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বললাম, 'খুন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো? ঠিক করেছেন। যে স্বপ্ন নষ্ট করে তাকে কোনোভাবেই স্পেয়ার করা যায় না। স্ত্রী বলে মাথা কিনে নিতে পারে, স্বপ্ন তো আর কিনে নিতে পারে না। আমার তো স্বপ্ন দূরের কথা, কেউ ঘুম ভাঙালেই মাথায় খুন চেপে যায়। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে। একটা নয়, দুটো প্রশ্ন। এক নম্বর হল, খুনের জন্য আমাকে বাছলেন কেন? দুনম্বর হল আমার রেমুনারেশন কীভাবে দেওয়া হবে?'

মোবাইল ফোনে কোনো একটা লাইন ঢুকছিল। মন্মথ তালুকদার ফোন কেটে দিয়ে বলল, 'আমি তো তোমাকে বাছিনি। কর্মসূত্রে তমালবাবু আমার পরিচিত। আমরা ওঁকে বেশ ভাল অ্যামাউন্টের কাজ দিই। ওঁকে একদিন ঘটনাটা বলি। বলি, আমি নিজে পারব না, কিন্তু খুন ছাড়া অন্য পথ নেই। আমার এমন একজন লোক লাগবে যে আমার বিষয়টা বুঝতে পারবে...আমার লেখাপড়া, আমার প্যাশন, আমি কেন এমন একটা কাজে যেতে বাধ্য হলাম সেটা ফিল করবে...সেই লোক নিজে কাজ করবে, না, অন্য কাউকে দিয়ে করাবে সেটা তার ব্যাপার...আমি ডিল করব তার সঙ্গে। বিহার ঝাড়খণ্ডের কোনো সুপারি কিলারকে আমি আর্কিটেক্ট, ল্যান্ডস্কেপিং বোঝাতে পারব না। তাছাড়া...তাছাড়া কাজটা মোটা দাগের যেন না হয়। পথে যেতে যেতে বাইক থেকে গুলি বা ফ্ল্যাটে ঢুকে গলায় মাথায় কোপ

নয়, মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হবে। পুলিশ যেন বুঝতে না পারে। তমালবাবু দুদিন পরে ভাবনাচিন্তা করে জানান, সাগর নামে এরকম একটা ছেলেকে তিনি চেনেন। সেই ছেলে নিজে মোটামুটি ভদ্রলোক হলেও মূলত ছোটলোকদের সঙ্গেই তার মেলামেশা। গান-বাজনা ছবি-টবি সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞানগম্যিও আছে। আমি বললাম, ভাল, পাঠিয়ে দিন। আর তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, পেমেন্ট হবে কাজের আগে হাফ, কাজের পরে হাফ।'

আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তমালের অবনতি তো দেখছি অনেকটা হয়েছে! স্বাভাবিক। চাকরিতে উন্নতি হয়েছে, অথচ মানুষ হিসেবে অবনতি হয়নি এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। নিশ্চয় এই লোকের 'বিউটিফুল' কোম্পানির কাছ থেকে তমালরা কাজের মোটা বরাত পায়। তার জন্য নানারকম ঘুষও দিতে হয়। তারই একটা এই খুনি সাপ্লাই! সেদিন তমাল বলেছিল, 'তুই সবসময় মুখে বলবি জীবন রোমাঞ্চকর আর সামান্য একটা খুনের কথায় হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে ফেলছিস? ছোঃ। তুই না বলিস, কোনটা অপরাধ, আর কোনটা অপরাধ নয় তার সীমারেখায় গোলমাল আছে? বলিস না? কাজটা করবি কি না করবি সে তোর ব্যাপার। বাংলায় দুটো জিনিসের কোনো অভাব নেই। খুনি আর বুদ্ধিজীবী। তুড়ি মারলে পেয়ে যাব। অর্ডার পেয়েছি, তোকে ডেকে বললাম। না করলে কেটে পড়। অন্য লোক ধরব। খুন যে তোকেই করতে হবে এমন কথা তো বলিনি। তুই লোক খুঁজে দিবি। প্রফেশনাল মার্ডারার। খারাপ লোকদের সঙ্গে মেলামেশা তো তোর কম নেই, বরং ভাল লোকেদের থেকে বেশিই আছে। তোর ওই খাবার হোটেলটার কী যেন নাম? ভাত ডাল না চচ্চড়ি? ওখানে নিশ্চয় ক্রিমিনালরা আসে। কমিশনে কাজ করাবি। কিন্তু প্ল্যানটা মাথা ভাল করে দেখে নিবি। ফুল প্রুফ চাই। যদি পুরো টাকাটা নিজে রাখতে চাস, তাহলে নিজে হাতে কাজ করবি।'

'ধরা পড়লে তোকে আগে ফাঁসাব।'

তমাল মুখটা হাসি হাসি করে বলেছিল, 'আমার ক্ষমতা বেড়েছে সাগর। ক্ষমতাবানরা সহজে ফাঁসে না। ফাঁসলেও ফাঁস কাটতে জানে।'

BanglaBook.org

আমার ভাবনা ছিঁড়ে দিয়ে মন্মথ তালুকদার বলল, 'পারিশ্রমিকের অ্যামাউন্টটা কি তুমি জানতে চাও?'

আমি দুম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'না চাই না। আমি শ্রীমতী মালঞ্চমালা সেনের ঠিকানাটা চাই।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার ভরসা হচ্ছে।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'কীসের ভরসা? খুনের?'

'আমার বিশ্বাস কাজটা তুমি পারবে। কাজটা করবে তো সাগর?'

আমি তাচ্ছিল্য করবার ভঙ্গিতে গালে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, 'এখনো ফাইনাল করিনি। মালঞ্চমালাদেবীর সঙ্গে আগে কথা বলব। মনে হয় না করব। এরপরেও যদি আপনি আপনার স্ত্রীর ঠিকানা দিতে চান দিতে পারেন।'

বাগান অফিস থেকে বেরোবার পরপরই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, কাজটা আমি করব। খুনি হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করাটা হবে মহা বোকামি। এই সুযোগ জীবনে আর আসবে না। এই অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবার কোনো মানে হয় না। অনেকরকম সাগরকে সবাই দেখেছে। বেকার, অলস, অকর্মণ্য। এবার খুনি সাগরকে দেখবে।

BanglaBook.org

এগারো

ভালমানুষ সম্পর্কে আমার একটা অবজারভেশন আছে। আজ মালঞ্চমালা হত্যাকাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সেই অবজারভেশনের কথা খুব মনে পড়ছে।

মানুষ আসলে দুরকম ভাল। গোরুর মতো ভাল এবং সিংহের মতো ভাল। এই দুই ধরনের 'ভাল'র পিছনেই রয়েছে আলস্য বা অক্ষমতা। 'বড়' হতে না চাইবার আলস্য এবং 'খারাপ' হতে না পারার অক্ষমতা। আবার উলটোও হতে পারে। বড় হতে না পারার অক্ষমতা এবং খারাপ হতে না চাইবার আলস্য। পদার্থবিদ্যা বলে, দুনিয়ার কোনো কিছুই কজ এবং এফেক্টের বাইরে নয়। এক্ষেত্রেও তা-ই। আলসেমি, অক্ষমতা হল 'কজ', ভাল হওয়া হল 'এফেক্ট'।

প্রথমে আসি 'গোরুর মতো ভাল' প্রসঙ্গে। বেশিরভাগ সময়েই গোরু খানিকটা ঘাস চিবিয়ে ছায়া দেখে থেবড়ে বসে যায়। চোখ বুজে জাবর কাটে গম্ভীর মুখে। দেখলে মনে হয়, কবিতার ছন্দ, নয় গল্পের প্লট ভাঁজছে। বাংলা সিনেমা, থিয়েটার নিয়েও ভাবতে পারে। আজকাল বাংলা সিনেমা থিয়েটার নিয়ে ভাবাভাবি খুব বেড়েছে। এত বেড়েছে যে মাঝেমধ্যে ভয় হয়, এই ভাবনা আর মানুষের মধ্যে আঁটবে না। দ্রুত পশুপাখিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে। এই সময় যদি গোরুর কানে কানে কেউ বলে, 'দশ পা দূরে সবুজ ঘাসে মাঠ ছেয়ে আছে। চলুন যাই। খানিকটা তাজা ঘাস খেয়ে আসি। ওই ঘাসে ভিটামিন প্রচুর। শরীরস্বাস্থ্য, মন ভাল থাকবে। আপনার কবিতা, গল্প, সিনেমা, থিয়েটার নিয়ে ভাবনাচিন্তা বিকশিত হবে,' গোরু কী করবে? কিছুই করবে না। চোখও খুলবে না। দুবার লেজ নাড়বে এবং ফের জাবর কাটতে শুরু করবে। সবাই বলবে, 'কী ভাল! মোটে লোভ নেই! তাজা ঘাসের কথা মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না।' আসলে

এটা আর কিছুই নয়, স্রেফ আলসেমি। 'সিংহের মতো ভাল' আবার অন্যরকম। সেখানে অক্ষমতাটাই কারণ। খরগোশ মেরে খাওয়ার পর পেট আইঢাই করে সিংহ বসে থাকে। নাকের ডগা দিয়ে নধর হরিণ গেলে চকচকে চোখে তাকায়, জিব বের করে ঠোঁট চাটে কিন্তু লাফিয়ে পড়ে না। শক্তি নেই, শরীর নড়ে না। হরিণ মেরে 'খারাপ' হওয়ায় তখন সে অক্ষম। অভাগা পাবলিক বুঝবে না। গদগদ গলায় বলবে, 'দেখ কত ভাল! পেট ভরতে যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই খায়।' আমার বিশ্বাস গোরু বা সিংহ যদি কথা বলতে পারত, তাহলে পাবলিকের এই সিদ্ধান্তে বিরক্ত হত।

আচ্ছা, আমি কেমন মানুষ? অবশ্যই ভাল। বড় এবং খারাপ হওয়ার মতো উদ্যোগ বা ক্ষমতা আমার কোনোটাই নেই। সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলায় না। কিন্তু আমি কেমন ভাল? কার মতো? গোরু না সিংহ? ঘাস খাই না হরিণ খাই? সে যে ভালই হই, মালঞ্চমালা হত্যাকাণ্ডের পর তো আর আমি ভাল থাকব না। কোনো খুনিই ভাল নয়। আচ্ছা, যারা খুন-টুন করে না তারা কেমন? তারা ভাল? ইস এই বিষয়ে আমার কোনো অবজারভেশন নেই। থাকলে ভাল হত।

শনিবার বিকেলে এইসব হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে সাউথসিটি মলের সামনে দিয়ে হাঁটছিলাম। কালই মালঞ্চমালা সেনের কাছে যেতে হবে। দুলক্ষ টাকার 'কাজ' বলে কথা। ভালমানুষি চুলোয় যাক। হ্যাঁ, স্ত্রী হত্যার জন্য উদ্যান বিশারদ শ্রীমন্মথ তালুকদার দুলক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি হয়েছে। জীবন বাগানের একটি ফুল পটাং করে ছিঁড়ে ফেলার জন্য দুলক্ষ টাকা খরচ সহজ কথা নয়। সেদিন মন্মথর অফিস থেকে বেরোবার পরপরই তমাল আমাকে মোবাইলে ধরল। ও বলা হয়নি, আমার একটা মোবাইল ফোন হয়েছে। অস্থায়ী মোবাইল। তিনমাসের মালিকানা। ফোন এবং কানেকশন দুটোর একটাও আমার নয়, নন্দর। নন্দ চমৎকার মানুষ। থাকে বাগবাজারে গঙ্গার পাশে। একটা ডুপলেক্স ঝুপড়িতে। দোতলার ঘর থেকে শুয়ে গঙ্গা দেখা যায়। নন্দর পেশা ভিক্ষা। নেশা গঞ্জিকা সেবন। গঙ্গার পাশে থাকলেও ট্রান্সফারেবল জব। ভিক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়। নিয়মিত খোঁজ রাখতে হয় কোথায় ভিক্ষে পাওয়া যাচ্ছে।

BanglaBook.org

আগে ধর্মস্থানে ব্যবসা ভাল হত। ধর্মভীরু মানুষ ভিক্ষে দিয়ে পাপ মোচন করতে চায়। এখন পলিটিক্যাল পার্টি অফিসগুলোর সামনে বাজার ভাল। ঢুকতে বেরোতে নেতারা ভিক্ষে দিয়ে যায়। তারাও কি পাপমোচন চায়? নাকি কেউ ভাবে গরিবমানুষকে দুটো পয়সা দিলে, ভগবান খুশি হবে? আরো ক-টা দিন ক্ষমতা টিকে যাবে? আর উলটোরা কী ভাবে? গরিবমানুষকে পয়সা দিলে ভাগ্য খুলে যাবে? দ্রুত ক্ষমতায় ফিরে আসব? কে জানে বাবা। যাইহোক ভিক্ষার স্পট জানবার জন্য এবং গঞ্জিকার পুরিয়া অর্ডার দেবার জন্য নন্দ মোবাইল নিয়েছে। সস্তার মোবাইল। আমাদের দেশে এখন চাল-ডালের দাম অনেক। মোবাইলের দাম সামান্য।

'হ্যালো, ভুটু...ভুটু? শুনতে পাচ্ছিস ভুটু...হ্যালো...হ্যালো...আজ কোনদিকে...বাইপাসের তৃণমূল ভবন না আলিমুদ্দিন?...না না কংগ্রেসে যাব না...বড্ড ভিড়...ফুটপাথে বসার জায়গা পাই না...এক কাজ কর...আজ বরং এসপ্ল্যানেডে যাই...বুদ্ধিজীবীদের মিটিং আছে... হ্যালো ভুটু, ভুটু শুনতে পাচ্ছিস...হ্যালো...।'

নন্দর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। মাঝেমাঝে নদী দেখতে ইচ্ছে হলে ওর ঘরে চলে যাই। সারারাত জানলার পাশে বসে থাকি। আমি হলপ করে বলতে পারি, পৃথিবীর কোনো রাজপ্রাসাদ থেকে এত সুন্দর নদী দেখা যায় না। গভীর রাতে সে সেজেগুজে ভিখিরির দুয়ারে আসে। কলকল আওয়াজ করে ফিসফিসিয়ে বলে, 'হ্যাঁগো আমার ভালবাসার মানুষ, তুমি কি আমার সঙ্গে ভেসে যাবে?'

নন্দ তিনমাসের জন্য দেশে গেছে। ঝুপড়ির চাবি আর মোবাইল ফোনটা রেখে গেছে আমার জিম্মায়। আমি বললাম, 'ফোনটা নিয়ে যাও।'

নন্দ চোখ কপালে তুলে বলল, 'খেপেছেন? গ্রামে এই জিনিস দেখলে কেউ ভিখিরি বলে মানবে? পেস্টিজ চলে যাবে। ক-টা দিন আপনের কাছে রাখেন, ব্যভার করেন।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার এসব লাগে না নন্দ। আমার মনফোন আছে। ওতেই কাজ চলে যাবে। ওই ফোনে মনে মনে কথা বলা যায়।'

BanglaBook.org

মনফোনের ব্যাপারটা নন্দ বুঝল না। সে মুখ গোমড়া করে বলল, 'ভিখিরির জিনিস ব্যভার করতে লজ্জা লাগে?'

এরপর না নিয়ে পারা যায়? আমি দু-একজনকে নম্বরও দিয়েছি। রেবা লামডিং থেকে বলল, 'এই ফোনটা কার?'

আমি সিরিয়াস গলা করে বললাম, 'এক ভিক্ষুকের।'

'তোমার থেকে বড় ভিক্ষুক?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ আমার থেকে বড়। তাকে যদি কেউ ভিখিরি না ভাবে তার প্রেস্টিজে লাগে। ক-টা দিন ইচ্ছে করলে এই নম্বরে ফোন করতে পারো। ভাল হবে। যেহেতু আমি তোমার ভালবাসার কাঙাল তাই একজন ভিখিরির ফোনই আমাদের কথোপকথনের সবথেকে উপযুক্ত হবে।'

কোনো জবাব না দিয়ে রেবা ফোন কেটে দেয়। তমাল ভিখিরির ফোন শুনে খুব বিরক্ত হয়েছিল। বলেছিল, 'ওই নম্বর দিবি না। যতসব ছোটলোকমি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ফোন নম্বরের ছোটলোকমি বড়লোকমির কী আছে?'

তবু তমাল দরকারে ফোন করে। আমার ধারণা এই নম্বরে ফোন করবার সময় সে রুমাল দিয়ে নিজের ফোন ঢেকে নেয়। যাতে ভিখারির নোংরা গন্ধ নাকে না যায়। সেদিন ফোন করে বলল, 'সাগর, ক্লায়েন্ট খুব খুশি।'

আমি নির্বিকার গলায় বললাম, 'কেন? কাজের আগেই খুশি কীসের?'

'না, তোর সঙ্গে কথা বলে খুশি। বলল, এই লোক ইনোভেটিভ। কল্পনাশক্তি আছে। চারটে কথার মধ্যে তিনটে কথাই বানিয়ে বলে এবং সুন্দর করে বলে। তুই নাকি প্রেমের প্রথম মুহূর্ত-টুহূর্ত কীসব বলে ঘাবড়ে দিয়েছিস? যাক মন্মথ তালুকদার বললেন, কাজ যাকে দিয়েই করাক, সাগর মাথা খাটিয়ে একটা ফুলপ্রুফ প্ল্যান বানাবে। পুলিশ ধরতে পারবে না। এই ক্ষমতা তার আছে। কাজটার জন্য সে দুলক্ষ টাকা ধরে রেখেছে।'

আমি আঁতকে উঠলাম। বললাম, 'দুলক্ষ টাকা! বলিস কীরে?'

BanglaBook.org

তমাল আরো গলা নামিয়ে হাসি হাসি গলায় বলল, 'ইয়েস টু ল্যাখস। কাজ যদি নিজে করিস সবটাই তোর।'

আমি থতমত খেয়ে বলছি, 'মানে নিজে হাতে মহিলাকে খুন করতে বলছিস?'

তমাল একটু চুপ থেকে বলল, 'আমি ওসব কিছুই বলছি না। বলছি, এক লপ্তে দুলক্ষ টাকা পেলে তুই কোথায় চলে যাবি ভাবতে পারছিস? সব ধার দেনা মিটিয়ে, নিশ্চিন্ত হতে পারবি। হাতেও অনেকটা থাকবে। তারপর ধর...'

তমালের বাকি কথা আর শুনতে পাইনি। ভিখিরির ফোনে লাখ টাকার কথা শুনতে শুনতে আমি একধরনের ঘোরে চলে গিয়েছিলাম। যাই হোক, সেদিন সাউথ সিটি মলের সামনে কী হল বলি। বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কাঁধে কে যেন হাত রাখল। বলল, 'আরে! সাগর না?'

আমি এমন ভেবড়ে গেলাম যে বলতে পারলাম না, 'কে সাগর!' বলতে পারলে ভাল হত। এড়িয়ে যাওয়া যেত। উলটে বললাম, 'আরে রঞ্জনদা তুমি! কবে এলে?'

এরপর যা বিপদ হবার তা-ই ঘটল। বিদেশ থেকে যারা বহুদিন পরে দেশে ফেরে তারা চেনা, হাফ চেনা, কোয়ার্টার চেনা কাউকে পেলে আদিখ্যেতার চূড়ান্ত করে। রঞ্জনদা টানতে টানতে তার নতুন ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল। একুশতলার ওপর মারকাটারি ফ্ল্যাট। ফোর-বি এইচ কে উইথ টেরেস গার্ডেন। মানুষ বাড়ির নাম দেয়, রঞ্জনদা ফ্ল্যাটের নাম দিয়েছে। বলিভিয়া। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ফ্ল্যাটের নাম বলিভিয়া! মানে কী রঞ্জনদা?'

রঞ্জনদা হেসে বলল, 'বলিভিয়া মানে বলিভিয়ার জঙ্গল। শেষ জীবনে চে যেখানে আত্মগোপন করে ছিলেন।'

আমি আরো অবাক হলাম। বললাম, 'চে! চে গুয়েভারা? রঞ্জনদা তুমি কি চে গুয়েভারার কথা বলছ?'

রঞ্জনদা ভুরু কুঁচকে বিরক্ত গলায় বলল, 'অন্য কোনো চে'র সঙ্গে আমার আলাপ আছে নাকি?' ভাবটা এমন যেন ওরিজিনাল চে গুয়েভারার সঙ্গে রঞ্জনদার খুবই আলাপ। বলিভিয়ার জঙ্গলে তিনি

যখন হ্যামকে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন, রঞ্জনদা তাঁর পাশে মোড়া টেনে বসে গুন গুন করে গণসংগীত শোনাত।

আমি মাথা চুলকে বলি, 'না, মানে... আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

ততক্ষণে রঞ্জনদা পোশাক বদলে এসেছে। ড্রেসিং গাউনের দড়িতে নট বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'বোঝা উচিত ছিল। স্টুডেন্টস লাইফে চে-র ব্যাপারে আমি ছিলাম অবসেসড। মনে নেই? সবাই বলত, আমেরিকা জানতে পারলে তোমার বরানগরের বাড়ি অ্যাটাক করবে। তোমার উচিত বালির বস্তা দিয়ে বাড়িতে বাঙ্কার তৈরি করে রাখা। হা হা হা...।' রঞ্জনদা গলা ফাটিয়ে হাসল।

মনে আছে, কলেজজীবনে রঞ্জনদা নিজেকে বলত 'বিপ্লবী'। শুধু বলত না, সাজতও। চে গুয়েভারার মুখ আঁকা টি শার্ট, উসকোখুসকো চুল, এক মুখ দাড়ি, কাঁধে রুকস্যাকের মতো ব্যাগ, হাতে চে গুয়েভারার ডায়েরি। চোখেমুখে সবসময় পুলিশের তাড়া খাওয়া একটা ভাব। চাপা গলায় বলত, 'যা বলবার তাড়াতাড়ি বল। হাতে সময় নেই।' যেন যেকোনো সময় বিপ্লবীদের মতো আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে। কলেজস্ট্রিটের মোড়ে পুলিশের ভ্যান দেখলে স্যাৎ করে গলিতে ঢুকে যেত। সঙ্গে মেয়েরা থাকলে বেশি করে যেত। যদিও তাকে পুলিশ কখনোই তাড়া করেনি। করবার কোনো কারণও ছিল না। রঞ্জনদা স্বভাবে ছিল ভীতু। শুধু লেকচারে সাহসী। তাও ক্যান্টিন বা ইউনিয়ন রুমে, বাইরে নয়। বলত, 'দেখিস, একদিন বিপ্লব আসবে। আলো ফুটবে, কারা টুটবে। সেদিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ভেঙে দেব। আর সেই লড়াইয়ের সময় আমি চলে যাব আন্ডারগ্রাউন্ডে!'

রঞ্জনদা একদিন সত্যি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেল। প্রথমে পেনসিলভেনিয়া, সেখান থেকে সিডনি। যাত্রাপথ সুগম করতে মাঝখানে বিদেশিনী বিবাহ। বাড়িতে ছবি পাঠাল। শাড়ি পরা অস্ট্রেলিয়ান বউ। নাকে নোলক। দশাসই চেহারার শ্বশুরমশাইয়ের বিরাট ডেয়ারির ব্যবসা। দুঃখের কথা হল, ডেয়ারির জরুরি কাজে আটকে পড়ায় মাতৃভূমির জন্য সদা চিন্তিত রঞ্জনদার মায়ের মৃত্যুতে দেশে আসা হল না। গোরুদের হাঁচি না কাশি কী একটা রোগ হল।

বেচারাদের কাহিল অবস্থা। নাকের জলে চোখের জলে কাণ্ড। তাদের ফেলে আসবে কী করে? একবার নয়, দেশপ্রেমিক রঞ্জনদার দেশে আসবার প্রচেষ্টা বারবার ধাক্কা খেয়েছে। ফ্লাইটের গোলমালে বোনের বিয়ের সময়েও গেল আটকে। টাকাপয়সা, উপহার নিয়ে আসা হল না। বাবার চিকিৎসায় ডলার পাঠাতে গিয়েও সমস্যা। ব্যাঙ্কে টেকনিক্যাল গোলমাল। তখন সিডনি থেকে বরানগরে টাকা পাঠানো অত সহজ ব্যাপার ছিল না। পাঠানো গেলও না। শেষ পর্যন্ত বিদেশের পাট চুকিয়ে, বিপুল অর্থ উপার্জন করে, বিদেশিনীকে ডিভোর্স দিয়ে কিছুদিন হল দেশে ফিরেছে। ফ্ল্যাট কিনেছে। একুশতলার ওপর ধুলো কাদা মুক্ত বলিভিয়ার জঙ্গলে হাত পা ছড়িয়ে জমিয়ে বসেছে। সেই ফ্ল্যাটের নরম সোফায় বসে বিপ্লবীর জীবন বৃত্তান্ত শুনে হাঁসফাঁস করতে লাগলাম। এই কুৎসিত ফ্ল্যাট থেকে পালাতে হবে। পালাতে হবে। কিন্তু কীভাবে? চে'র বাণী ছিল, বিপ্লব পাকা ফল নয় যে টুপ করে গাছ থেকে খসে পড়বে। বিপ্লবকে আনতে হবে। জালিয়াত ফক্কুড়িবাজ মানুষদের কাছ থেকে পালানোও কি তা-ই? উপায় নিজেকেই আনতে হবে? একুশতলার ওপর থেকে লাফ দিলে কেমন হয়? খুব লাগবে? এর মাঝখানে রঞ্জনদা ভদকার বোতল বের করে গ্লাসে ঢালল। বলল, খাবি? বলিভিয়ার কঠিন শীতে চে ভদকা ছাড়া কিছু খেতেন বলে তো মনে হয় না।' আমি মাথা নাড়লাম। রঞ্জনদা বেতের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ভদকায় চুমুক দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডোরবেল বাজল। আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম। অনেকটা যুদ্ধের বাজনা!

রঞ্জনদা হেসে বলল, 'চমকাবার কিছু নেই। আমেরিকা থেকে কিনেছি, চায়না মেইড। যে সুরটা শুনলি ওটা লং মার্চের সময় বিপ্লবীরা ট্রাম্পেটে বাজিয়েছিল। চীন ওই আওয়াজ কলিং বেলে ভরে বাজারে এনেছে। আমেরিকায় হইহই করে বিকোচ্ছে। হা হা হা...।' হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে দরজা খুলল রঞ্জনদা। আমিও পালানোর সুযোগ পেলাম।

ভারী চেহারার মাঝবয়সি এক মহিলা। ঠোঁটে কালো লিপস্টিক। কপালে বড় কালো টিপ। কালো শাড়ি। কানে কালো দুল। গলার

BanglaBook.org

হারটাও কালো পুথির। মহিলার শাড়ি বেসামাল। কাঁধ থেকে আঁচল খসে খসে যাচ্ছে। আসলে মহিলা নিজেই কিঞ্চিৎ বেসামাল। এও কি ভদকা খেয়ে এসেছে নাকি রে বাবা! রঞ্জনদা দরজা খুলেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। কালো সুন্দরীর হাত ধরে আমায় বলল, 'সাগর, মিট মাই ফ্রেন্ড, শি ইজ তমসা।' তমসাই বটে! তমসাদেবী আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটিয়ে আদুরে গলায় বললেন, 'রঞ্জন, আই ওয়ান্ট টু স্লিপ। আমি তোমার ফ্ল্যাটে ঘুমোতে এসেছি সোনামণি।'

রঞ্জনদা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'সিঅ, সিঅ। চল, বেডরুম দেখিয়ে দিই।'

তমসাদেবীকে প্রায় জড়িয়ে বেডরুমের দিকে রওনা দিল রঞ্জনদা। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। যতদূর মনে পড়ে চে বলেছিলেন, 'হাঁটু মুড়ে বাঁচার থেকে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করা অনেক ভাল।' মৃত্যুবরণ নয়, আমি পালিয়ে জীবনবরণ করতে চাই। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে লিফ্‌টে উঠে হাঁপ ছাড়লাম। খুব বাঁচা বেঁচেছি।

না, বাঁচলাম না। দশ মিনিটের মধ্যে আর একজনের পাল্লায় পড়লাম। তিনিও মহিলা।

যদিও তমাল আমাকে বলেছিল, সব আঁচল খসা নাকি রিয়েল হয় না। অনেকটা কারবাইট দিয়ে জোর করে পাকানো আমের মতো। জোর করে খসানো। কোনো কোনো মহিলা পারে। সময়, সুযোগ মতো শাড়ির আঁচল খসায়। এই মহিলা মনে হয় না তেমন।

BanglaBook.org

বারো

‘অ্যাই সাগর, অ্যাই সাগর।’

নারীকণ্ঠে চমকে উঠলাম। থমকে দাঁড়ালাম। নারীকণ্ঠ তাচ্ছিল্য করবার মতো বুকের পাটা আমার নেই। নিঝুম রাতেও যদি কোনো মেয়ে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে ডাকে ‘সাগর, সাগর’, আমি দরজা খুলে বেরিয়ে যাব। নিজেকে ঠেকাতে পারব না। সবাই বারণ করবে। বলবে, ‘ওরে যাসনি, ঘরের বাইরে যাসনি। এ হল নিশির ডাক।’ আমি মনকে বোঝাব, নিশ্চয় নিশি নামে কোনো সুন্দরী বিপদে পড়েছে। এই ডাকে সাড়া না দেওয়াটা অন্যায় হবে। তাতে যদি বিপদ হয়, হোক। কিন্তু এখন তো নিঝুম রাত নয়। নারীকণ্ঠ আসছে কোনদিক থেকে? বাস থেকে কেউ ডাকছে? সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। লেডিস সিটে হুমদো ধরনের গোঁফঅলা এক পুরুষ। আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। যেন তাকিয়ে আমি অন্যায় করেছি। আজকাল কি বাসের লেডিস সিটে পুরুষমানুষদেরও বসার পারমিশন হয়েছে? হতে পারে। চারপাশে কতরকম বদল হচ্ছে। সব মনে থাকে না।

জালিয়াত বিপ্লবী রঞ্জনদার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে হাতের সামনে যে বাস পেয়েছি তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কোন বাসে উঠলাম, কোনদিকে যাব, এসব তখন তুচ্ছ। আগে এলাকা ছেড়ে পালাও। এমন একটা দূরত্বে চলে যাও, রঞ্জনদা যেন ধাওয়া করেও ধরতে না পারে। নেমে পড়েছি যাদবপুর থানার সামনে। পুরো উলটোদিকে চলে এলাম। জীবনের এটাই নিয়ম। মাঝেমধ্যে উলটোদিক টানে। এই টানে সাড়া দেয়নি এমন মানুষ খুব কম পাওয়া যায়। কোনো সময় এই উলটোপথ আসলে বে-পথ, ভুল পথ। তবু যেতে হয়। একমাত্র গলায় দড়ি বাঁধা ছাগলের উলটো দিকে যাওয়ার

BanglaBook.org

কোনো সুযোগ নেই। টান পড়ে। যে মানুষ জীবনে কখনো উলটো পথে হাঁটেনি, নজর করলে তার গলায় দড়ির দাগ দেখতে পাওয়া যাবে। ছাগলের দড়ি। সস্তামার্কা দার্শনিক ধরনের কথা এখন থাক, আমি যে পালাতে পেরেছি এটাই অনেক। বিপদের আর চান্স নেই। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে হাঁটতে লাগলাম।

নারীকণ্ঠ আবার ডাকল, 'অ্যাই সাগর, অ্যাই...। এই দিকে, বাঁ দিকে তাকা।'

বাঁদিকে ফিরে এবার দেখতে পেলাম। একফালি কাচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যে মহিলা তাকে চিনতে পারছি, আবার চিনতে পারছিও না। এইটা সবথেকে বড় সমস্যা। চিনতে পারলে তো হয়েই গেল। চিনতে না পারলেও ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু মাঝামাঝি মানেই অস্বস্তি। এখান থেকেই দেখতে পেলাম, মহিলার মাথায় কায়দা মার্কা তামাটে চুল খোঁপা করে বাঁধা। তামা রঙের মাঝেমাঝে রুপোলি ঝিলিক। মাল্টিন্যাশনালের মতো মাল্টি কালার। পাকা চুল ঢাকতে কারসাজি। সাজপোশাকেও খুকি ভাব। জিন্‌সের সঙ্গে স্লিভলেস কুর্তি। মহিলা হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন। আমি সিগারেট ফেলে এগিয়ে গেলাম। এগোতে এগোতেই চিনতে পারলাম। ইনি হলেন চারুপিসি। চারুলতা দত্ত। চারুলতা দত্ত আমার নিজের পিসি নয়, দূর সম্পর্কের পিসিও নয়। শ্যামলদার পিসি। শ্যামলদা আমার দাদা কাম বন্ধু কাম ধমকদাতা। শ্যামলদা আর মঞ্জু বউদি মিলে একবার বাড়িতে কাজের মাসির ছেলের জন্মদিন সেলিব্রেট করেছিল। হই হই কাণ্ড। কতদিন পরে চারুপিসিকে দেখছি? দশ বছর? নাকি তার থেকে একটু বেশি হবে? আজ কি সব পুরোনো লোকদের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন? এই নিয়ে দুজন হল। রঞ্জনদা আর চারুপিসি।

চারুপিসির কাছে যেতে বুঝতে পারলাম, দূর থেকে উনি যতটা খুকি সেজেছেন বলে মনে হচ্ছিল, তার থেকে উনি একটু বেশিই সেজেছেন। গলায়, কানে, হাতে বিচিত্র সব পাথরের গয়না। বড় বড় পাথর। গালে, ঠোঁটে রং। চোখের পাতাতেও বেগুনি আভা। সব মিলিয়ে কিম্ভূত লাগছে। আচ্ছা, শ্যামলদার বাড়িতে যখন দেখা হয়েছিল তখন কি চারুপিসির সাজগোজের এই বাড়াবাড়ি ছিল? ওঁর

বয়স কত হল? ষাটের কাছাকাছি? দু-এক বছর বেশিও হতে পারে। বয়স হলে নারী পুরুষের সাজগোজ নিষিদ্ধ, হাতে খঞ্জনি আর জপের মালা নিয়ে বসে থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। কিন্তু বয়সের সঙ্গে মানানসই থাকার মানে আছে। আবার কিছু মহিলাকে দেখি যারা পাউডার লিপস্টিক মাখি না, গয়না পরি না, পোশাক নিয়ে মাথা ঘামাই না বলে ঢাক পেটান। কারো যেমন বাড়াবাড়ি সাজগোজের ভান, এদের তেমন বাড়াবাড়ি না সাজগোজের ভান। এদের ভাবগতিক দেখলে মনে হবে, কিটস, শেলি বা জীবনানন্দ দাশের বোন। সাজগোজ নয়, এবারের ভাইফোঁটায় দাদাকে কখন ফোঁটা দেবে তাই নিয়ে চিন্তিত। আমার বিশ্বাস, এদের মধ্যে কেউ কেউ নিৎসে, ফুকো, দেরিদার মতো গ্রেট দার্শনিকদের টেলিফোনে 'গুড নাইট' না বলে ঘুমোতে যায় না।

'কেমন আছ সাগর? কতদিন পরে তোমাকে দেখছি।' আমার কাঁধে হাত রেখে চওড়া হাসলেন চারুপিসি।

আমি গদগদ গলায় বললাম, 'আপনার সঙ্গেও অনেকদিন পর দেখা হল চারুপিসি। আজ হল পুরোনো মানুষদের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন।'

BanglaBook.org

চারুপিসি আঁকা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'পুরোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়া মানে!'

আমি হেসে বললাম, 'মানে তেমন কিছু নয়। এই তো খানিক আগে রঞ্জনদার সঙ্গে দেখা হল, এখন আপনার সঙ্গে...যদি আর একজন পুরোনো পরিচিতর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে হ্যাটট্রিক হয়ে যাবে। আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আজ হ্যাটট্রিক করতে পারি।'

মুখ গম্ভীর করতে গিয়েও গাম্ভীর্য গিলে ফেললেন চারুপিসি।

'তুমি এখনো আগের মতোই ঠাট্টা তামাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছ নাকি?'

'কী করব বলুন? চারপাশটা ভীষণ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। হুমদোমুখো মানুষরা সব ঘুরে বেড়ায়। কঠিন কঠিন কথা বলে। আমি ঠাট্টা তামাশা করে ব্যালান্স রাখবার চেষ্টা করি। প্রকৃতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে না?'

চারুপিসি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'বাঃ তাহলে তো তুমি খুব ইমপর্ট্যান্ট কাজ করছ।'

লক্ষ করলাম, কথা বলবার সময় মহিলার কপাল, নাকের পাশ এবং গলার চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে। চুলের মতো চামড়ার ওপর রঙের পলেস্তারা লাগানোর কোনো ব্যবস্থা চালু হয়নি? বাড়ির নোনাধরা দেয়াল যেমন চুনকাম করা হয়?

আমি মাথা নামিয়ে অভিনন্দন গ্রহণের ভঙ্গিতে বললাম, 'খানিকটা।'

'বিয়ে থা করেছ?'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'ঠাট্টা তামাশার জন্য হচ্ছে না চারুপিসি। মেয়েরা ঠাট্টা তামাশার প্রেমিক পছন্দ করে। স্বামী পছন্দ করে না। স্বামীকে হতে হবে সিরিয়াস। সে সুকুমার রায়ের চলচিত্তচঞ্চরি পড়ে হাসবে কিন্তু জোরে হাসবে না। চ্যাপলিনের ছবি দেখে জোরে হাসতে পারে, কিন্তু হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে পারবে না।'

'তা-ই নাকি!'

আমি বিনয়ের সঙ্গে নীচু গলায় বললাম, 'অবশ্যই তা-ই। আর এই কারণেই আমার পাত্রী জুটছে না।'

চারুপিসি বললেন, 'কাজকর্ম করছ? তখন তো বেকার ছিলে।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'এখনো বেকার আছি।'

'কাজ করবে? চাকরি?'

এইবার আমাকে কেটে পড়তে হবে। সময় হয়েছে। আগ বাড়িয়ে বেশি বাজে কথা বলতে গিয়ে ফেঁসে যেতে বসেছি। চাকরি-টাকরি বলে এই মহিলা আটকে দেবে নাকি? খেয়েছে। আমি একপা-দুপা করে পিছিয়ে আসবার চেষ্টা করছি আর তখনই একটা কাণ্ড ঘটল। পুরোনো মানুষ দেখায় আমি হ্যাটট্রিক করলাম।

এতক্ষণ আমরা একটা কাচের দরজার বাইরে, ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। চারুপিসি দাঁড়িয়ে আছেন সেই দরজার দিকে পিছন ফিরে। আমি দরজাটা দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎই দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। শাড়ি পরা ছিমছাম মেয়েটি আমারই বয়সি।

BanglaBook.org

একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চমকে উঠলাম। আরে! ঋতিশা না? হ্যাঁ, ঋতিশাই তো। আমার কলেজের বন্ধু। কেমিস্ট্রি পড়ত। একবার কেমিস্ট্রি নিয়ে একটা কাণ্ড করেছিল। ওকে সেই কারণেই বেশি করে মনে আছে। সেকেন্ড না থার্ড ইয়ারে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলল। কে যেন বলল, 'এইজন্য সুনীল গাঙ্গুলি সুন্দরী মেয়েদের কেমিস্ট্রি পড়তে বারণ করেছেন। উনি কবিতা না গল্পে লিখেওছেন। তুই সুনীলবাবুর কথা না শুনে ঠিক করিসনি ঋতিশা।' মনে পড়ছে, ঋতিশা দুদিন পরে, এক হাতে ব্যান্ডেজ, আর এক হাতে কবিতা নিয়ে কলেজে হাজির হল। ক্যান্টিনে সকলকে সেই কবিতা পড়ে শোনাল। রবীন্দ্রনাথের চেনা কবিতার স্টাইলে লেখা সেই কবিতার দুটো লাইন ছিল এইরকম— 'দোহাই সুনীলবাবু, কেমিস্ট্রি নয়, বরং রান্নাঘর নিয়ে একটা কবিতা লিখুন/মেয়েদের যত জ্বালা পোড়া সেইখানে...।' কবিতার নাম 'রান্নাঘর'। আমরা ঋতিশাকে বললাম, 'এই কবিতা তুই সুনীল গাঙ্গুলির কাছে পৌঁছে দিয়ে আয়। কবিতার জবাব কবিতায় হোক।' ঋতিশা তাই করল। সুনীলবাবুর অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কবিতা দিয়ে এল। মজার ব্যাপার, কয়েক মাসের মধ্যে সুনীলবাবু সেই কবিতা তাঁর পত্রিকায় ছেপে দিলেন। সব ঠিক রইল, শুধু জ্বালা, পোড়ার পাশে একটা 'ভালবাসা' জুড়ে দিলেন। তাতে লাইনটা হয়ে গেল—'দোহাই সুনীলবাবু, কেমিস্ট্রি নয়, বরং রান্নাঘর নিয়ে একটা কবিতা লিখুন/মেয়েদের যত জ্বালা পোড়া ভালবাসা সেইখানে...।'

সেই ঋতিশা এখানে! কী করছে? সবথেকে বড় কথা, আমার হ্যাটট্রিক হয়ে গেল! আজ তিন-তিনজন পুরোনো মানুষের সঙ্গে দেখা! ভাবা যায়? ঋতিশা মনে হয় আমাকে চিনতে পারল না। স্বাভাবিক। কলেজের সুন্দরী মেয়েদের ছেলেরা মনে রাখে। আমার মতো হাবাগোবা ছেলেকে মেয়েরা মনে রাখতে যাবে কোন দুঃখে?

'মা, আপনার ফোন।'

কী আশ্চর্য! ঋতিশার গলাটাও খুব কিছু বদলায়নি! চারুপিসি কি ঋতিশার মা? না না, 'আপনি' বলছে, তার মানে শাশুড়ি। তাই কি? আমি কিছু বলতে গেলাম। ঋতিশা চকিতে আমার দিকে তাকাল এবং

BanglaBook.org

দ্রুত ঠোঁটে ডান হাতের তর্জনী ছোঁয়াল। মানে 'চুপ করে থাক।' ঋতিশা আমাকে চিনতে পেরেছে। তাহলে আমাকে চুপ করে থাকতে বলছে!

চারুপিসি ঘুরে পরিশীলিত গলায় বললেন, 'ঋতি, তুমি কলারের নাম আর নম্বরটা লিখে রাখ। বল আমি রিং ব্যাক করব।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এসো সাগর। ভিতরে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলি। জরুরি কথা আছে।'

ঋতিশা আমার দিকে চকিতে আর একবার তাকিয়ে কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। কিছু একটা ইশারা করল যেন। আমাকে কিছু বলতে চায়? কী বলতে চায়। কেনই বা আমাকে চুপ করতে বলল? মজার মেয়েটা কি কোনো গোলমালে পড়েছে? নিশ্চয় পড়েছে। নইলে এমন অদ্ভুত আচরণ করছে কেন! চারু দত্তর সঙ্গে কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম।

ভিতরে ঢুকে আমার ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা হল।

দোকান। কায়দা করে বলা হয় 'বুটিক'। তাও শাড়ি, জামাকাপড়, বানানো গয়নাগাটির বুটিক নয়। মোমবাতির বুটিক! এখানে শুধু মোমবাতি বিক্রি হয়! নানা চেহারার, নানা কায়দার, নানা রঙের। চারুপিসি বুটিকের নাম রেখেছেন 'আগুন জ্বালো'। শুধু মোমবাতি কেন? দীপাবলি? সে তো বছরে মাত্র ক-টা দিনের মামলা। তার জন্য এত খরচাপাতি, এত কায়দা করে দোকান সাজানোর দরকার কী!

না। শুধু দীপাবলি নয়। আগুন জ্বালো মানে খুশির আগুন নয়, প্রতিবাদের আগুন জ্বালো।

বুটিকের এক কোনায় চারুপিসির বসার টেবিল চেয়ার। চারুপিসি আমাকে তাঁর টেবিলের উলটোদিকে বসিয়ে সব বললেন। ঋতিশা, আমার চাকরি, এই মোমবাতি বুটিক—সবই। মোমবাতি নিয়ে বিজনেস করবার প্ল্যান দিয়েছে চারুপিসির এক পরিচিত ব্যবসায়ী। লোহিয়া ঝুনঝুনওলা। চারুপিসি আদর করে ডাকেন, ঝুনঝুনভাই। ঝুনঝুনভাইয়ের বড়বাজারে গুড় এবং শুকনো লঙ্কার বিরাট গোডাউন। ইউ পি, মহারাষ্ট্র থেকে মাল এসে জমা পড়ে। সেই মাল চট করে বাজারে ছাড়া হয় না। দাম বাড়লে ছাড়া হয়। একইসঙ্গে ঝাল

BanglaBook.org

এবং মিষ্টির কারবারি। ঝুনঝুনভাই শুধু নিজের টাকাপয়সা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না। অন্যকেও টাকাপয়সা করবার কাজে উৎসাহিত করেন। চারুপিসিকে বলেছেন, চারপাশে এখন মোমবাতির রমরমা বাজার। মোমবাতি ছাড়া মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ কোনো কিছুর এখন দাম নেই। ঘটনা থাকছে, মোমবাতিও থাকছে, শুধু বছরে বছরে হাত বদল ঘটছে। আজকাল কিছু একটা ঘটলেই হল। হইহই করে সবাই মোমবাতি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ছে। ঝুনঝুনওয়ালা তাঁর দূরদৃষ্টি নিয়ে দেখতে পেয়েছেন, মোমবাতির ডিমান্ড বাড়বে। এখন প্রতিবাদে, শোকে ব্যবহার হচ্ছে, একটা সময় সমর্থনে, আনন্দে, সরকারি উৎসবে মোমবাতি জ্বেলে লোকে পথে হাঁটবে। শুধু চালু করার অপেক্ষা। বিদেশ থেকে আমদানি হওয়া জিনিস। যা খুশি হতে পারে। পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণেও মোমবাতি মিছিল হবে। চিড়িয়াখানায় জিরাফ শিশু নামকরণ অনুষ্ঠানে যখন বনমন্ত্রী যাবেন তখন সরকার থেকে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে মোমবাতি ধরিয়ে দেওয়া হবে। তারা মিছিল করে মন্ত্রীর পিছনে পিছনে যাবে। সুতরাং মোমবাতিকে কাজে লাগাও। চারুপিসি ঝুনঝুনভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী কলকাতার নামকরা জায়গায় ঘর নিয়ে মোমবাতি বুটিক খুলেছেন।

'তুমি দেখেই বুঝতে পারছ সাগর, আমি আমার "আগুন জ্বালো" বুটিকে সবরকম মোমবাতি রেখেছি। ওই তাকটা হল, নারী নির্যাতনের মোমবাতি। এই দিকটা হুমকি শাসানির বিরুদ্ধে। আর এই তাকটা হচ্ছে, জমি নিয়ে গোলমাল। জমি নিয়ে গোলমালের মোমবাতিতে শিখাগুলো একটু লম্বা করা হয়েছে। আগুন লকলক করবে। বধূ নির্যাতন, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, শ্লীলতাহানির জন্য একেবারে আলাদা সেট। একেকটা সেট ধরে দাম। ঝুনঝুনভাই নিজের ওয়ার্কশপ থেকে মাল সাপ্লাই করছেন। কারখানার বন্ধে যে মোমবাতি ইউজ হবে তাতে হালকা সেন্ট পড়েছে। শ্রমিকরা কারখানার গেটে এই স্পটওলা মোমবাতি জ্বেলে অনশনে বসবে। ভাল করেছি না?'

আমি মুগ্ধ গলায় বললাম, 'খুবই ভাল করেছেন।'

মুগ্ধ না হয়ে উপায় কী? মোমবাতি নিয়ে যে এই ব্যবসা হতে

পারে আমি কল্পনাও করতে পারছি না। কথা বলতে বলতে আমি আড়চোখে দু-একবার ঋতিশার দিকে তাকালাম। সে আমার দিকে ফিরেও দেখছে না। কাউন্টারে মন দিয়ে বিল লিখছে।

চারুপিসি বললেন, 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর ঝুনঝুনভাইয়ের সাহায্যে বুটিক আমার ভালই চলছে। আগে শুধু কলকাতায় মোমবাতির ব্যাপারটা চালু ছিল, এখন জেলাগুলো থেকেও নিয়মিত অর্ডার পাচ্ছি। রোজই কোথাও না কোথাও ক্যান্ডেল ডেমনস্ট্রেশন। তবে সবার একটাই আবদার। মোমবাতির দাম যা-ই করুন, বড় করা চলবে না, দেখবে বেশিক্ষণ যেন না জ্বলে। বোঝেনই তো সবার বাড়ি যাওয়ার তাড়া থাকে। হাতের মোমবাতি না নিভলে বাড়ি যায় কী করে?'

কথা শেষ করে চারুপিসি খুব হাসতে লাগলেন। আমি আড়চোখে আবার আমার বন্ধুর দিকে তাকালাম।

ঋতিশা তার খুকি শাশুড়ির দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে দৃষ্টি আগুন দিয়ে সে এই মহিলাকে ভস্ম করে দিতে চায়।

ব্যাপারটা কী!

BanglaBook.org

তেরো

চাপাপিসির পাল্লা থেকে আমাকে যত দ্রুত সম্ভব বেরোতে হবে। আসল কাজটাই পড়ে আছে। হত্যাকাণ্ড। মালঞ্চমালা সেনের কাছে যেতে হবে। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। সেই কথা যদি টেপরেকর্ডারে ধরে রাখা যেত তাহলে বেশ হত। বইমেলায় একটা বই করা যেত। বইয়ের নাম দিতাম 'একজন নিহত এবং একজন আততায়ীর কথোপকথন'। শিল্পী দেবব্রত ঘোষ খুব সকালে উঠে ঘুমভাঙা চোখে দুরন্ত প্রচ্ছদ এঁকে দিতেন। মলাটের এককোনায় একা পড়ে আছে গাছের পাতা। মৃত্যুর মতো উদাসীন ও স্বচ্ছ। বইয়ের উৎসর্গে শঙ্খ ঘোষের কবিতার ক-টা লাইন দেওয়ার খুব ইচ্ছে।

'ভেবে দেখো কাকে সহজে দিয়েছ ফাঁকি।
কবরখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে
একবার ফিরে তাকাও নিজের দিকে
মনে করে দেখো কোন্ কথা ছিল বাকি।'

লাইনগুলো চমৎকার না? গায়ে কাঁটা দেয়। চিন্তা একটাই। খুনের বই তো, এখানে দেবব্রত ঘোষের প্রচ্ছদ, শঙ্খ ঘোষের কবিতা দেওয়া কি উচিত হবে? ওঁরা রাজি হবেন? মনে হয় না। যাক, এটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সত্যি সত্যি তো আর বই হচ্ছে না। মালঞ্চমালার কাছে যাব। যাকে হত্যা করব তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। যখন কাজ করব, তখন সব আয়োজন করেই করব। মহিলাকে দেখতে কেমন? সুন্দরী হলে মুশকিল। একেই গান করে শুনে আমার ভিতর একটা প্রেম প্রেম ভাব জেগেছে। এরপর যদি সুন্দরী হয় তাহলে পুরোপুরি প্রেমে পড়ে যেতে পারি। তখন ঘটনা হবে অন্যরকম। অন্যের বউয়ের বদলে নিজের প্রেমিকা খুন। সেটাও ইন্টারেস্টিং কম হবে না। কিন্তু আপাতত সমস্যা করছে ঋতিশা। আমার সঙ্গে কেন এমন ব্যবহার করছে না

জেনে এখান থেকে যেতে পারব না। মনটা খুঁত খুঁত করবে। ও যদি আমাকে চিনতে না পারত কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করবার ইঙ্গিত করল কেন?

টেবিলের উলটো দিকে বসে থাকবার কারণে কাছ থেকে চারুপিসিকে দেখতে পাচ্ছি। রং করা চুলের আড়াল থেকে কানের পাশে পাকা চুল উঁকি দিচ্ছে। ফুরফুর করে উড়ছেও। যেন চারুপিসিকে জিব ভেঙিয়ে বলছে, 'দুয়ো, দুয়ো, পারিসনি পারিসনি...আমাদের লুকোতে পারিসনি...এমা দুয়ো।'

নারীপুরুষ নির্বিশেষে যাঁরা বয়স গোপন করতে চুলে রং করেন আমি তাঁদের পক্ষে। দুনিয়ায় পাকা চুলের মর্যাদা নেই। বিশেষ করে নারীজীবনে চুল সাদা হওয়া এক ভয়ংকর 'অভিশাপ'। ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, আকর্ষণ সব চুলোয় যায়। সেসব ফিরিয়ে আনবার একটাই উপায়। রং, রং এবং রং।

আচ্ছা, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, বেগম আখতার, আগাথা ক্রিস্টি, আশাপূর্ণাদেবী, লীলা মজুমদার, আঁতিওনেৎ লুইজা, ব্রাউন ব্ল্যাকওয়েলের মতো মহিলারা চুল সাদা হওয়ায় কী করেছিলেন? আঁতিওনেৎ লুইজা আমেরিকায় নারীদের ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন। সেদেশের মানুষ যে নারীর সম-অধিকার নিয়ে এত বড়াই করে, তার পিছনে এই মহিলার অবদান সবথেকে বেশি। আমার ধারণা তিনিও চুলে রং লাগাতেন। ফ্লু গোতের ঘটনাই বা কী ছিল? ১৯/২০ শতকে এই মহিলা ছিলেন মারকাটারি ব্যাপার। যেমন বিদুষী, তেমন শিক্ষিত। হেলেন কেলার তাঁর কাছে জার্মান ভাষা শিখেছিলেন। তিনি কি সাদা চুল লুকোতে পার্লারে যেতেন? নিশ্চয় যেতেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল? তাঁর চুলের রং কেমন ছিল? সুবর্ণা ঠাকুরানিই বা কম কী? পূর্ব রাঢ় অঞ্চলের ব্রাহ্মণকন্যা। একবার পালকি চড়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে দস্যুরা ধরল। পালকির দরজা খুলে সুবর্ণা নেমে আসেন। কোমরে আঁচল গোঁজা, হাতে কাটারি। হুংকার দিলেন, 'আয় দেখি, কোন হারামির পুত আমার শলীলে হাত লাগাবি? আয় একবার।' বলতে বলতে সামনের ডাকাতটার গলায় দিলেন এক কোপ। বাকিরা দে চম্পট। সুবর্ণা ঠাকুর মেয়েদের মনে

BanglaBook.org

চিরঞ্জীবী হলেন। সেখানকার এক দিঘির নাম হল সোনাঠাকুরানির দিঘি। লোকে বলে, ওই জলে ডুব দিলে মেয়েরা সুবর্ণা ঠাকুরের মতো সাহসী হয়। বুড়ো বয়েসে সুবর্ণার চুলের হাল কেমন ছিল? সাদা না কালো? আমি বলব কালো। নইলে কেন এত সম্মান! লীলাবতী আর তুবা খানুমের নাম না বলে কথা শেষ করি কী করে? এঁদেরও সবাই জানে। ভারতীয় মহিলা লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে অভূতপূর্ব প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। পাটিগণিত এবং বীজগণিতের বহু সূত্র তাঁর নামে প্রচলিত। আর তুবা খানুম ছিলেন সেই লড়িয়ে মহিলা যাঁর জন্য ইরানে প্রথম মেয়েদের স্কুল চালু হয়েছিল। রক্ষণশীলদের বাধা, রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি এই কাজ করেছিলেন। সভ্যতার ইতিহাসে তাঁর জায়গা হল স্থায়ী। আমি হলফ করে বলতে পারি, লীলাবতী বা তুবা খানুমের রূপচর্চা নিয়ে যদি কোনো লেখাপত্তরের খোঁজখবর পাওয়া যায়, তাহলে জানা যাবে, তাঁরাও চুলে রং লাগাতেন। আর যদি না লাগাতেন তাহলে মস্ত ভুল করতেন। সম্মান কম পেয়েছেন। চারুপিসি সেই ভুল করেননি। তাঁর উঁকি মারা সাদা চুল নিয়ে রসিকতা অন্যায়।

'সাগর, "আগুন জ্বালো" বুটিক ইতিমধ্যে নাম করতে শুরু করেছে। শুধুমাত্র মোমবাতির বুটিক করে এতটা হবে আমি বুঝতে পারিনি। আমি চাই এর খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ুক। তার জন্য তোমার মতো একজন ছেলেকে আমার দরকার।'

আমি অবাক গলায় বললাম, 'আমি কী করব! আমি তো মোমবাতি বানাতে জানি না।'

চারুপিসি আড়চোখে ঋতিশার দিকে তাকালেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বললেন, 'না, তোমার জন্য অন্য কাজ। রাজি হলে মাইনে ঠিক করব।'

মাইনে! মানে চাকরি? চারু দত্ত চাইছেন আমি 'আগুন জ্বালো' বুটিকে চাকরি করি? খেয়েছে! বললাম, 'ঠিক বুঝতে পারছি না চারুপিসি।'

চারু দত্ত আরো গলা নামিয়ে ফেললেন। প্রায় ফিসফিসের পর্যায়ে নিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

'বোঝাবুঝির কিছু নেই। আমি চাই, তুমি এই বুটিকের দায়িত্ব নাও। সকালবেলা চলে আসবে রাত পর্যন্ত থাকবে। জিনিসপত্রের অর্ডার নেবে। কাস্টমার এলে কথা বলবে। ওই যে মেয়েটাকে কাউন্টারে দেখছ, ওর নাম ঋতিশা, আমার পুত্রবধূ। বছরদুয়েক হল ছেলের বিয়ে দিয়েছি। ভেবেছিলাম বাড়িতে সুন্দরী বউ এলে তাকে দোকানে বসাব। সুন্দরী মুখে ব্যবসা ভাল হয়। কিন্তু এখন দেখছি ওই মেয়ে কোনো কম্মের নয়। আলসের ঢিপি। আমার ধারণা, হাতটানের অভ্যেস আছে। ক্যাশ থেকে পয়সা সরিয়ে বাপের বাড়ি পাঠায়। হাতেনাতে ধরতে পারলে চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিতাম। হাতেনাতে ধরতে পারিনি তাই চুপ করে আছি। লেখাপড়া জানা মেয়েগুলো মিটমিটে শয়তান হয়। ঋতিশাও তাই। যাইহোক, বাড়ির কেচ্ছা বাইরে বলা ঠিক নয়। তুমি বাইরের লোক নও বলেই তোমাকে বলে ফেললাম। ব্যবসার জন্য একজন বিশ্বাসী লোক আমার খুব দরকার। তাছাড়া ঘরের কাজে অসুবিধে হচ্ছে। রান্নাবান্না, ঘর ধোয়ামোছা, কাপড়কাচা, বাসনমাজা শুধু কাজের লোক রেখে হয় না। তারওপর ছোটলোকগুলো এখন মাথায় উঠেছে। একটার বেশি দুটো কাজ করতে গেলে এক্সট্রা পয়সা চায়। আমি কি পয়সার কুমির? ছেলের বউ তো বাপের বাড়ি থেকে কুটোটি আনতে পারেনি। তাই ঠিক করেছি, এই মেয়েকে ঘরে পাঠিয়ে দেব। সে দেখবে সংসার। আমি থাকব বাইরে। আর আমার এই সাধের বুটিক দেখবে তোমার মতো কেউ।'

এতক্ষণে বিষয়টা পরিষ্কার হল। ঋতিশা চারুপিসির পুত্রবধূ। এমনি পুত্রবধূ নয়, শাশুড়ির লাথি ঝাঁটা খাওয়া পুত্রবধূ। কেমিস্ট্রি পড়ে কী হাল! তখন অ্যাসিডে হাত পুড়িয়েছিল, এখন সংসারে হাত পোড়াচ্ছে। আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বললাম, 'চারুপিসি, আপনি নিজেই বরং এখানে ম্যানেজারি করুন।'

চারুপিসি বললেন, 'তা হবে না। আমাকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। মোমবাতির ব্যবসা বাড়ানোর জন্য আমি নতুন প্ল্যান করছি। ঠিক করেছি, নারীবাদীদের সঙ্গে ভিড়ে যাব। মেয়েদের ওপর অত্যাচার দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

আমি বললাম, 'অত্যাচার কি শুধু বাইরে হলেই দেখবে? ঘরে হলে দেখবে না?'

চারুপিসি আমার ইঙ্গিত ধরতে পারলেন না। বললেন, 'ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা বলছ? দেখ সাগর, এই মুহূর্তে যেটায় পাবলিসিটি বেশি সেটাই আমার কাছে প্রায়োরিটি। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে মোমবাতির চল এখনো হয়নি। হলে যাব। পাবলিসিটির জন্য আমাকে মিটিং, মিছিল, সভাসমিতিতে ব্যস্ত থাকতে হবে। টিভিতে লেকচার দিতে হবে, পত্রপত্রিকায় লিখতে হবে। এগুলো সহজে হয় না। টাইট কম্পিটিশন। সেইসঙ্গে তলে তলে 'আগুন জ্বালো' বুটিকের প্রচার চালাতে হবে। প্রতিবাদের সময় মোমবাতি যেন আমার বুটিক থেকে কেনা হয়। সেই কারণেই আমি নিজেকে একজন প্রতিবাদী নারী হিসেবে এস্টাবলিশ করতে চাই। ঝুনঝুনভাই বলেছে, ব্যবসার জন্য সব করতে হবে।'

আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, 'বাবা, এ তো বিরাট পরিকল্পনা!'

চারুপিসি হেসে বললেন, 'বড় বিজনেসের জন্য বড় পরিকল্পনাই করতে হয়। দেখবে অল্পদিনের মধ্যে "আগুন জ্বালো" দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আমি বিভিন্ন শহরে ফ্র্যানচাইজি নেব। স্টারেদের নিয়ে গিয়ে উদ্বোধন করব। রিনাকেও বলব।'

আমি বললাম, 'রিনা কে?'

চারুপিসি গর্ব ভরা গলায় বললেন, 'অপর্ণা সেনকে আমি রিনা ডাকি। শর্মিলা ঠাকুরকে ডাকি রিঙ্কু। খুব ইচ্ছে, আমার এই "আগুন জ্বালা"তে রিনা আর রিঙ্কুকে একবার নিয়ে আসি।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'আনুন না। অসুবিধে কী?'

চারুপিসি বললেন, 'আরে বাবা, তার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে না? হাজুবাজু লোক ডাকলে ওরা আসবে কেন? নিজেকে সামবডি হতে হবে। সেই কারণেই তো আমি নারী আন্দোলনে ঢুকে পড়তে চাইছি। চট করে সামবডি হয়ে যাব। নবাদির সঙ্গে কথা বলেছি। নবাদিও বলল, চলে আয়। নারী হচ্ছে এখন ইনথিঙ্ক। নারীর অধিকার, নারীর সম্মান, বলে একবার নেমে পড়লেই হল। আমি

BanglaBook.org

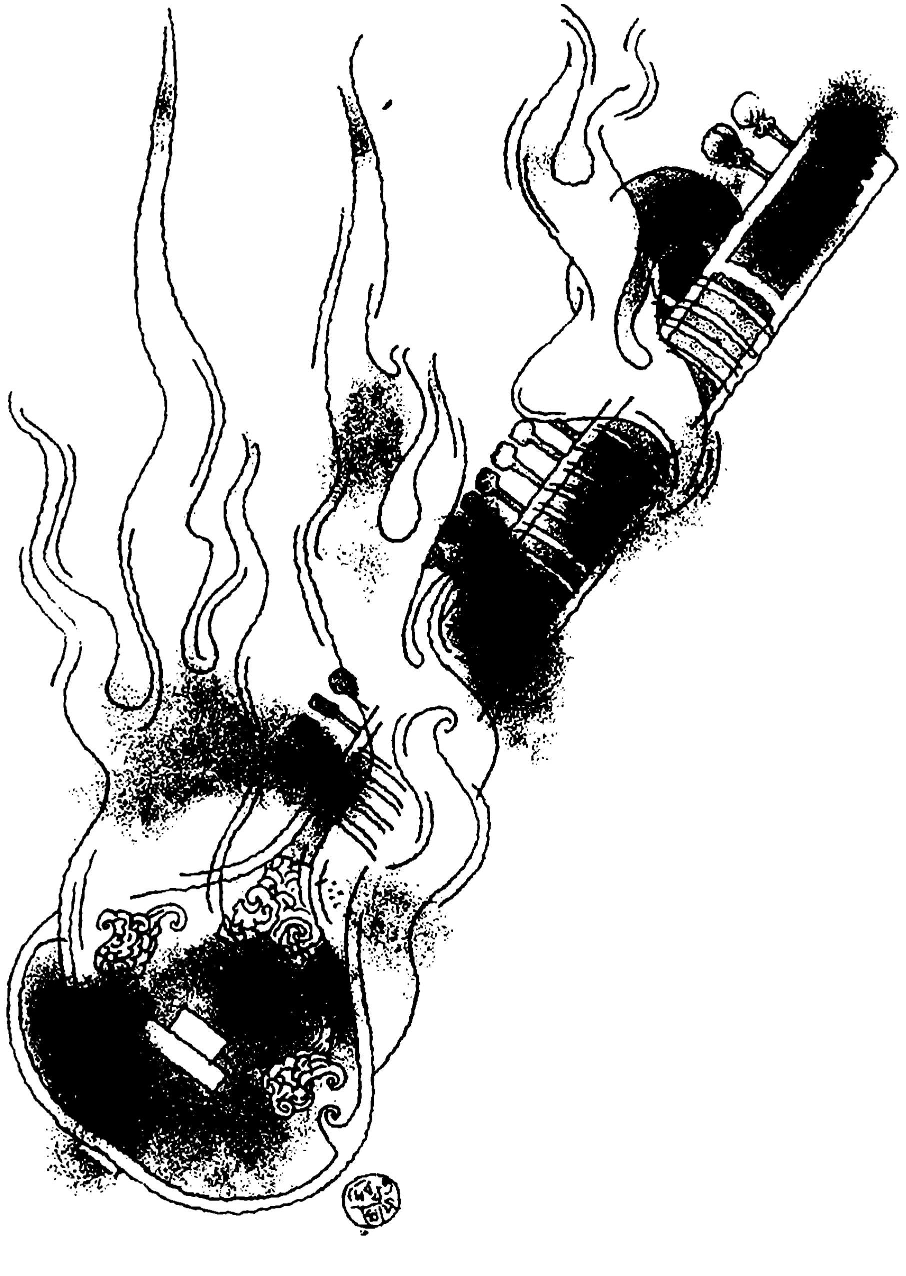

জিগ্যেস করলাম, কোয়ালিফিকেশন কী লাগবে? নবাদি বলল, কিচ্ছু লাগবে না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'নবাদি কে! ফিল্ম স্টার?'

'ফিল্ম নয়, প্রোটেস্ট স্টার। প্রতিবাদের তারকা। একজন নারাবাদী মহিলা। তেরোবার বিদেশে গেছে, সাতবার জেলে।'

আমি আঁতকে উঠি, 'জেলে গেছেন! বল কী!'

চারুপিসি মুচকি হেসে বললেন, 'জেল মানে কি আর সেই জেল? এক-দুঘণ্টার জন্য ফ্যাশন করা জেল। টিভিতে, পত্রিকায় পাবলিসিটি পেয়েছে। জেলে যাবার জন্য নবাদির আলাদা ড্রেস আছে। ভ্যানিটি ব্যাগে কানের বড় রিং থাকে। ল ব্রেক করে পুলিশের গাড়িতে ওঠবার সময় টকাটক পরে নেয়। আমার খুব ইচ্ছে, আমিও জেলে যাই।'

আমি বানানো কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, 'কী দরকার চারুপিসি? এই-বয়েসে জেল-টেলের ঝামেলা কি সহ্য হবে? ওরা যদি এক দুদিনের বদলে দশ দিন ধরে রাখে?'

চারুপিসি হেসে বললেন, 'দুর বোকা! ওরকম হয় না। নারীবাদীদের কেউ ধরে রাখে না। আজ পর্যন্ত শুনেছ, আমাদের দেশে কোনো নারীবাদী নারী গুলি খেয়েছে? কারো চাকরি গেছে? ঘর ছাড়া হয়েছে কেউ? ওসব হয় না। সেই কারণেই তো ওখানে এত ভিড়। খুব সেফ। আর বয়স হলে সুবিধে। কেউ অতীত জানে না। নবাদির ব্যাপারটাই দেখ না। কে জানে নবাদি একসময় কত পুরুষমানুষের সঙ্গে লটঘট করেছে? যখন যেরকম দরকার ধান্দা বাগিয়ে নিয়েছে। সবাই জানে সে হল নীতিমালার জেঠিমা। নারী মর্যাদার কাকিমা। আমি তো ওকে কলেজ লাইফেও দেখছি। পরীক্ষায় নম্বর বাগাবার জন্য প্রফেসরদের সঙ্গে ইটিশ-লিটিশ কম করেছে? একবার ছোকরা প্রফেসরের সঙ্গে বিষ্ণুপুর চলে গেল। রাত কাটিয়ে ফিরল। প্রফেসরের স্ত্রী আপত্তি করলে তার নামে উলটে থানায় নালিশ ঠুকে দিল। ওর এক মামার বন্ধু তখন লালবাজারে কাজ করত। সবাইকে সেই লোকের ভয় দেখাত। কলেজে অনেকে বলত, ওই লোকের সঙ্গেও নাকি...থাক সেকথা। নবাদি পরে বর্ধমান না বীরভূমে কলেজে পড়াতে

BanglaBook.org

গেল। এক অফিসারের সঙ্গে মিছুকিছু করে বাড়ির কাছে বদলি পেয়ে গেল তিন মাসেই।'

আমি বললাম, 'মিছুকিছু! মিছুকিছু কী!'

চারুপিসি মুচকি হেসে বললেন, 'মিছুকিছু হল কিছুমিছু। বাকিটা নিজে বুঝে নাও।'

আমি বললাম, 'ও।'

চারুপিসি বলল, 'তবে নবাদির একটা বড় গুণ, মেয়েদের মোটে সহ্য করতে পারে না। কোনো মেয়ের ভাল দেখলে হিংসেতে জ্বলে মরে। কলেজে এক মহিলা কলিগের সঙ্গে একবার হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছিল। সেসব কথা জানে কেউ? এখন দেখ কী চমৎকার নারী, নারী গো বলে বুক চাপড়ে বেড়াচ্ছে! বয়স হলে এটা সুবিধে। অতীতের মুখ মুছে নেওয়া যায়। আমি জানি, আমার পিছনেও লাগবে।'

আমি চুপ করে আছি। ভেতরে ভেতরে রাগ আর ঘেন্না দুটোই হচ্ছে। মেয়েদের মর্যাদা, অধিকার, সম্মান রক্ষার লড়াই গোটা দুনিয়াতে কম হয়নি। আমাদের দেশেও মেয়েদের অপমান, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বড় বড় আন্দোলন হয়েছে, হচ্ছে। একজন অসহায় মেয়ের জন্য লক্ষ মানুষ যখন গর্জে ওঠে, গর্ব হয়। যেখানেই থাকি মনে হয়, প্রতিবাদের ওই গর্জনে আমিও আছি। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে কত বড় বড় নেত্রী তৈরি হয়েছেন। নির্যাতিত মেয়েদের পাশে মেয়েদের গিয়ে দাঁড়ানোর উজ্জ্বল ইতিহাস কম লেখা হয়নি। রোজই হচ্ছে। আরো হবে। এর মধ্যে এই চারুপিসি, নবাদি, ঝুনঝুনওয়ালাদের মতো সুযোগসন্ধানী মানুষরা যখন ঢুকে পড়তে চায় তখন রাগ হবে না? ঘেন্না করবে না? চোনা পড়লে এক বালতি দুধও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

নিজের রাগ ঘেন্না লুকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নরম গলায় বললাম, 'ক-টা দিন ভাববার সময় দাও চারুপিসি।'

চারু দত্ত আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে কার্ডটা রাখো। মোবাইলে ফোন করবে। তবে বেশি দেরি করবে না।'

চারুপিসির মোবাইলে নয়, কার্ড দেখে পরদিন 'আগুন জ্বালো'র ল্যান্ডলাইনে ফোন করলাম। ঋতিশা ফোন ধরল।

'কেমন আছিস ঋতিশা?'

ঋতিশা আমার ফোনে বিস্মিত না হয়ে বলল, 'আমি জানতাম তুই ঠিক ফোন করবি। ভাল নেই সাগর।'

'চিন্তা করিসনি, তোর চারু দত্ত মালটাকে শাস্তি পেতে হবে।'

ঋতিশা ফিসফিস করে বলল, 'কী শাস্তি?'

আমি হাই তুলে বললাম, 'কঠিন শাস্তি। সেই শাস্তির নাম হবে সাগর শাস্তি। এখনো বল, কেমন আছ কেমিস্ট্রি সুন্দরী?'

ঋতিশা কলেজ বান্ধবীদের মতো মিষ্টি হেসে বলল, 'তুই একদম একইরকম আছিস।'

আমি বানানো আগ্রহ নিয়ে বললাম, 'কীরকম আছি?'

'বদমাইশ একটা।'

আমি চিন্তিত গলায় বিড়বিড় করে বললাম, 'সেটাই তো সমস্যা ঋতিশা। খুব সমস্যা।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চোদ্দো

মালঞ্চমালা মানে কী?

পৃথিবীতে এমন কোনো খুনি কি আছে যে খুনের আগে যাকে খুন করবে তার নামের মানে খুঁজেছে? সম্ভবত নেই। আমার মালঞ্চমালা নামের মানে জানতে ইচ্ছে করছে। কেন করছে বলতে পারব না। অপরাধ অতি জটিল বিষয়। মানুষ কেন অপরাধ করে, অপরাধের আগে পরে তার মনের অবস্থা কেমন থাকে সহজে বোঝা যায় না। মানবমনের অতলে ডুব দিতে হয়। ডুব দিয়েও যে সবসময় লাভ হয় না। কোনো কোনো সময় মানুষের আসল মনের থেকে তার অবচেতন মন বেশি শক্তিশালী। অবচেতন মন আসল মনের কিছু অংশকে লুকিয়ে ফেলতে পারে। খুব ভালবাসার মানুষকেও সে যেমন সব ভালবাসার কথা বলতে দেয় না, তেমন খুব রাগের মানুষকেও রাগের সবটা বুঝতে দেয় না। এসব কঠিন কথা আমার নয়, দার্শনিক মহামতি বার্ট্রান্ড রাসেলের। তিনি বলেছেন, আমাদের অবচেতন মনে অপরাধীর প্রতি একধরনের সহানুভূতি থাকে। সেই সহানুভূতি অপরাধের প্রতি আমাদের কৌতূহলী করে। অপরাধ মানুষের প্রিয় বিষয়গুলির একটি। হত্যা মানুষকে শিকারের তৃপ্তি দেয়। তৃপ্তির এই আকাঙ্ক্ষা মানুষ জিনে লালন করে বলেছে। আদিমকালে শিকার ছিল মানুষের প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় বিষয়। সভ্যতা, সমাজ, শিক্ষা জিন থেকে এই আকাঙ্ক্ষাকে উৎপাটিত করতে পারেনি। আমাদের জিনে যেমন ভালবাসার বীজ আছে, খুনের বীজও আছে। সমাজের নিয়মকানুন তাকে দমিয়ে রাখে মাত্র। রাসেল সাহেবের মতে, যে মানুষ খুন করতে ভয় পায়, খুনের ঘটনা তাকে দেয় কল্পনার মুক্তি। বাপরে!

এসব কথা থাক। আমি কি আমার জিনের খপ্পরে পড়েছি? যে

BanglaBook.org

জিন অপরাধ ইচ্ছেকে বহন করে? রাসেল সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো সুযোগ থাকলে তাঁকে জিগ্যেস করতাম। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ তাঁর বাড়িতে হাজির হতাম। হঠাৎ সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি যাবার গল্প অনেকের মুখে শুনেছি। গা ছমছমে সব গল্প। মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। দীর্ঘকায় মানুষটি নিজে এসে দরজা খুলে দিচ্ছেন...জলদগম্ভীর গলায় বলছেন, 'কী চাই?' বার্ট্রান্ড রাসেলের ক্ষেত্রেও কি সেরকম কিছু হত? উনিও কি নিজে এসে দরজা খুলে দিতেন? ভারী গলায় বলতেন, 'কী চাই?' বললে অসুবিধে কিছু নেই। আমি বিনয়ের সঙ্গে বলতাম, 'স্যার, হঠাৎ একটা খুনের বরাত পেয়েছি। পারিশ্রমিক থাকলেও ভেবেছিলাম কাজটা নেব না। পরে একটা কৌতূহল তৈরি হয়েছে। খুন করলে কেমন লাগে সেই কৌতূহল। এ বিষয়ে আপনি কি দয়া করে কিছু আলোকপাত করবেন?'

এই কথা শুনে রাসেল সাহেব কী করতেন? ঘাড় ধরে বের করে দিতেন নাকি ঘরে বসিয়ে কফি খাওয়াতেন? আমি কখনো শুনিনি সত্যজিৎবাবু কাউকে দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যারা গেছে সকলেই নাকি তাঁর কাজের ঘরে খানিকটা সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছে। লেখার টেবিল, বইয়ের তাক, চেয়ারের কুশন, হাওয়াই চটি সব দেখেছে। আমার শুধু একটাই খটকা। সত্যজিৎবাবুর যত ভক্ত, তার ভগ্নাংশের ভগ্নাংশকেও যদি তিনি ঘরে বসিয়ে দু-কথা বলতেন, তাহলে রোজ সকালে সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় চলে যাওয়ার কথা। তাহলে উনি কাজ করতেন কখন? নাকি যারা 'আমি মানিকদার ঘরে বসেছি' বুকে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা সবাই সত্যি বলে না? সেখানে জল আছে। থাকতে পারে। জল কোথায় নেই? ভেজাল সর্বত্র। এমনকী জলেও ভেজাল হিসেবে জল মেশানো হচ্ছে। আমার কী? আমি খুব ভাল করেই জানি, সত্যজিৎবাবু বা রাসেল সাহেব কেউ সাগরের মতো ফ্যা ফ্যা পার্টিকে অ্যালাও করতেন না। স্ট্রং রেকমেন্ডেশন থাকলেও নয়। সুতরাং এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামানো অর্থহীন।

যাইহোক, মূল কথায় আসি। মালঞ্চমালা মানে কি বাগানের মালা? হতে পারে। বাগান শিল্পী মন্মথর স্ত্রী বলে 'মালা' শব্দ হয়তো

সিম্বলের মতো ব্যবহার হয়েছে। তাহলে বলতে হয়, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। মন্মথ যতই লেখাপড়া জানা ছেলে হোক না, সে যখন বউকে খুন করবার প্ল্যান কষছে সে মোটেও মানুষ নয়। একটি বাঁদর। যদিও বাঁদর কখনো নিজের বউকে হত্যা করে বলে আমার জানা নেই। বাঁদর বিশেষজ্ঞ কাউকে পেলে জানতে হবে।

আমি আমার ক্লাস টুয়েলভে পড়া ছাত্রীর কাছে মালঞ্চমালা নামের অর্থ জানতে চেয়েছিলাম। সে কোনো রূপকথার বই-টইতে যদি পড়ে থাকে। নামটার মধ্যে একটা রূপকথা রূপকথা ভাব আছে না? ছোটরা অনেক সময় রূপকথার খবর রাখে।

ছাত্রী বলল, 'মাস্টারমশাই, গুগল সার্চ করব? গুগলে সব পাওয়া যায়। মালঞ্চমালার মানেও বলবে, আবার আপনার জুতোর মাপও বলে দেবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমার জুতোর মাপ বলে দেবে মানে!'

ছাত্রী ঘাড় কাত করে বলল, 'হ্যাঁ মাস্টারমশাই। ধরুন পুজোর সময় মা ঠিক করল, আপনাকে জুতো উপহার দেবে। আমরা জুতোর দোকানে গেলাম, কিন্তু আমরা আপনার পায়ের মাপ জানি না। সাত নম্বর না আট নম্বর বলতে পারছি না। তখন দোকানের লোক ফটাফট নেট খুলে, গুগল সার্চ করে আপনার পায়ের মাপ জেনে যাবে।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'সেকী! গুগল আমার পায়ের মাপ জানবে কী করে!'

ছাত্রী উৎসাহে বলল, 'গুগল সব পারে। কম্পিউটারে মাস্টার-মশাইয়ের জুতো লিখে এন্টার মারলেই হবে। একবার মা গিয়ে শুধু ছোটমাসির নাম বলল, ওরা সঙ্গেসঙ্গে গুগল সার্চ করে বলে দিল।'

আমি বললাম, 'মাস্টারমশাই টু ছোটমাসি—ইন্টারনেট সবার পায়ের মাপ জানে! গুগল কি পায়ের মাপের বিশেষজ্ঞ?'

ছাত্রী মুখ টিপে হেসে বলল, 'দুর, ছোটমাসির জন্য আমরা কি জুতোর দোকানে গিয়েছিলাম নাকি? আমরা গিয়েছিলাম ইয়ের দোকানে। ছোটমাসি ঘটনা শুনে মাকে বলল, ওমা দিদি বলিস কী! গুগলটা তো খুব পাজি! ও জানল কী করে!'

BanglaBook.org

আমার এই ছাত্রীটি সরলমুখী পাকা মেয়ে। মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই। এই কথার জন্য আমি কি তাকে জোরে একটা ধমক দেব? ধমক দেবার সময় কী বলব? একটা অপরাধ তো দেখাতে হবে। সেটা কী? থাক এসবের মধ্যে ঢুকে কাজ নেই। আরো জড়িয়ে পড়ব। আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। আমি এমন একটা ভান করলাম, যেন ব্যাপারটা বুঝতেই পারিনি। পড়ার বই টেনে নিলাম। আমি নিশ্চিত, আজ এই মেয়ে স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খুব হাসাহাসি করবে। আমার ছাত্রী বলবে, 'ভ্যাবলা মাস্টারমশাইটাকে আজ দারুণ র‍্যাগ করেছি। বেচারি কান লাল হয়ে গেছে। তাও তো কিছু বলিনি। শুধু ইয়ে শুনেই কুপোকাত। আরেকটু বললে হার্ট ফেল করত।' হাসাহাসি এখানেই থামবে না। মাস্টারমশাইয়ের পায়ের মাপের সঙ্গে যদি ছোটমাসির ইয়ের মাপের পালটাপালটি হয়ে যায় তখন কী হবে তা নিয়েও আলোচনা চলবে। মেয়ের দল হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বে। হাসুক। হাইস্কুলের মেয়েরা মজা করাটা কোনো অন্যায় নয়। সেই মজায় হালকা পাকামি থাকাটাও ভাল। বরং না থাকাটাই অসুখের লক্ষণ।

নামের মানে নয়, শেষ পর্যন্ত আমি দুজন মালঞ্চমালার খোঁজ পেয়েছি। খোঁজ পেয়েছি গুগলে নয়, বইতে।

মালঞ্চমালা এক নম্বর—পূর্ববঙ্গে এক লোকগাথায় মালঞ্চমালাকে পাওয়া যায়। এই পালাগানের নাম 'মালঞ্চমালা পালা'। সেখানে মালঞ্চমালা এক বীর রমণী ছিলেন। তিনি লাঠি দিয়ে বন্দি স্বামীর পায়ের শিকল ভেঙেছিলেন।

মালঞ্চমালা দুনম্বর—আমার ধারণাই ঠিক। মালঞ্চমালা বলে সত্যি রূপকথার এক নায়িকা ছিল। এক রাজার সন্তান জন্ম নিল। পুত্র সন্তান। রাজগণৎকার কোষ্ঠী বিচার করে বললেন, সর্বনাশ! এ ছেলে বারো দিনের বেশি বাঁচবে না। রাজা, রানি, প্রজারা কেঁদেকেটে অস্থির। গণৎকার আবার হিসেবে বসলেন। বললেন, উপায় আছে। রাজপুত্রের জীবন রক্ষা পেতে পারে যদি তাকে বারো বছর বয়েসের কোনো কুমারীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। চারদিকে খোঁজ খোঁজ। বারো বছরের কুমারী কোথায় আছে? দেখা গেল, কোটালকন্যার বয়স বারো

BanglaBook.org

বছর। সেই কন্যার নাম মালঞ্চমালা। অতি চমৎকার। কোটালও খুব খুশি। যতই হোক রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে বলে কথা। অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে, আতসবাজী পুড়িয়ে মালঞ্চমালার সঙ্গে নবজাতক রাজপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হল। কিন্তু তাতে লাভ হল না। বারোদিনের দিন রাজপুত্রের মৃত্যু হল। রাজামশাই তো রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তাঁর বিশ্বাস হল, মালঞ্চমালা মানুষ নয়, সে ডাইনি। তিনি সেই বালিকার চোখ উপড়ে রাজপ্রাসাদ থেকে দিলেন তাড়িয়ে। মালঞ্চমালা তার মৃত স্বামীকে বুকে আগলে ধরে চলে গেলেন বনে। সেখানে অনেক কষ্টের পর স্বামীকে বাঁচিয়ে তুললেন। তারপর বহু বিপদের সঙ্গে লড়াই করে, সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন রাজ্যে। সুখে বসবাস করতে লাগলেন।

সুন্দর গল্প। আমার মনে হয়, দুজন মালঞ্চমালা আসলে একজনই। পতিব্রতা, সাহসী, ভালবাসায় পরিপূর্ণ। স্বামীকে বাঁচানোর জন্য এঁরা দুজনেই জীবনপণ করেছিলেন। একজন পালাগানে আর একজন রূপকথায়। আর আজ কী ঘটছে? বাস্তবের মালঞ্চমালাকে তার স্বামী মেরে ফেলবার পরিকল্পনা করেছে। ঠিক উলটো। ঘটনা সবদিক থেকে জমজমাট।

BanglaBook.org

আমি বসে আছি নিউটাউনে। মালঞ্চমালার ফ্ল্যাটে। ঠিক ফ্ল্যাট নয়, ফ্ল্যাটের রুফ গার্ডেনে। আশ্চর্য রুফ গার্ডেন! কোথাও কোনো গাছ নেই। এপাশে ওপাশে শুধু কিছু পাথর সাজানো। পাথরগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। কোনোটা সাদা, কোনোটা হলুদ, কোনোটায় নীল আভা। পাথরের বাগান! মন্মথর উলটো? গাছের প্রতিবাদ পাথর? কথাটা মাথায় আসতে আমি একটু হাসলাম। মালঞ্চমালা কি জানে না গাছ থেকেই পাথরের সৃষ্টি? আমি একটা পাথরের ওপর বসে আছি। বেশ লাগছে। পাথর থাকে নদীর ধারে। ফ্ল্যাটবাড়ির তেরোতলায় থাকে না।

টেলিফোন করে এসেছি। মন্মথ তালুকদারের কারণে আমি তার দেখা করতে চাই শুনে মালঞ্চমালা ফোনের ওপাশে মিনিট কয়েক চুপ করে থেকে জিগ্যেস করেছিল, 'কেন?'

আমি কোনোরকম ধানাইপানাইয়ের মধ্যে গেলাম না। আমি

নিলাম 'হয় এসপার নয় ওসপার' টেকনিক। এই টেকনিকে বেশিরভাগ সময় কাজ দেয়।

'দেখুন ম্যাডাম, আপনার হাজব্যান্ড আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে চান। আর সেই কাজটা করাতে চাইছেন আমাকে দিয়ে। এমনি এমনি নয়, তার জন্য উনি আমাকে পারিশ্রমিক দেবেন। মোটা পারিশ্রমিক।'

মালঞ্চমালা মনে হয় আমার সরাসরি কথায় মজা পেল। অল্প হেসে বলল, 'আপনি কি ভাড়াটে গুণ্ডা?'

আমি বললাম, 'এখনো পুরোটা বুঝতে পারছি না। ভাড়াটে গুণ্ডা না কেনা গোলাম কোনটা হলে সুবিধে বেশি বুঝতে পারছি না। পারিশ্রমিকের অ্যামাউন্টটা অতিরিক্তরকম ভাল। এত টাকা একটা মানুষ যখন দিচ্ছে, তখন মনে হয় তার কেনা গোলাম হয়ে থাকাটাই উচিত। ম্যাডাম, আমি একজন বেকার যুবক। আপনার স্বামীর কাজটা যদি ঠিকমতো করতে পারি তাহলে এটাকেই পাকাপাকি পেশা হিসেবে নেব ভাবছি। এখন আপনার সহযোগিতা চাই।'

'আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে আমারই সহযোগিতা চাই! ব্যাপারটা কী বলুন তো? আপনি কি রসিকতা করছেন? আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে ঠিক কোন ধরনের প্রতিশোধ নিতে বলেছে?'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'টেলিফোনে বলা যাবে না। মুখোমুখি হলেও বলতে পারব কিনা জানি না। প্রতিশোধ খুবই কঠিন। এক্সট্রিম বলতে পারেন।'

মালঞ্চমালা এবার যেন একটু আওয়াজ করে হাসল। বলল, 'এক্সট্রিম মানে? মারধোর? নাকি আরো বেশি কিছু? একেবারে মার্ডার?'

আমি চুপ করে রইলাম। যার মানে দাঁড়ায় কথাটা ঠিক হলে অবাক হবার কিছু নেই। মৌন থাকা সম্মতির লক্ষণ। আমি ইচ্ছে করেই খুনের ব্যাপারটা ঠারেঠোরে মালঞ্চমালাকে বোঝাতে চাইছি। এটাই আমার টেকনিক। এতে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে। এক, মেয়েটা ভয় পেয়ে যেতে পারে। ভয় পেয়ে হয়তো এখনই পুলিশকে খবর দিল। দুই, আমার প্রতি কৌতূহল তৈরি হতে পারে। মহামতি দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, অপরাধের প্রতি মানুষের কৌতূহল আছে।

BanglaBook.org

আমার মন বলছে, মালঞ্চমালার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা হবে। যে মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে পারে সে সহজ মেয়ে নয়। তারওপর মালঞ্চমালা একজন শিল্পী। শিল্পী আর পাঁচজনের মতো করে ভাবে না। আমাকে তার কৌতূহল উসকে দিতে হবে। জানতে হবে কী এমন কারণ যার জন্য মন্মথ নামে এক ভদ্র, শিক্ষিত, গাছ ফুল পরিবেশ ভালবাসা মানুষ নিজের বউকে খুন করতে চায়? কিন্তু জানবার চেষ্টা করতে হবে উদাসীন ভঙ্গিতে।

মালঞ্চমালা আমার ঘোর ভাঙিয়ে বলল, 'তাহলে আর দেরি করছেন কেন? প্রতিশোধ নিয়ে ফেলুন।'

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'তার জন্যই তো দেখা করতে চাইছি ম্যাডাম। দয়া করে যদি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন। বেশিক্ষণ সময় নেব না। মিনিট দশ পনেরো।'

মালঞ্চমালা হেসে বলল, 'দশ মিনিটে কীভাবে মারবেন? মাথায় লাঠি মেরে? নাকি বুকে ছুরি?'

একথার উত্তর হেসেই হওয়া উচিত। আমি তা করলাম না। ইচ্ছে করেই করলাম না। বললাম, 'ছি ছি এটা আপনি কী বলছেন ম্যাডাম? কীভাবে কাজ করব সেটা আপনার সঙ্গে কথা না বলে কখনো ঠিক করা যায়? আপনার সুবিধে অসুবিধে আছে, সময় অসময় আছে। সব দিক দেখে শুনে তো কাজে হাত দিতে হবে। তাই না? প্রথম কাজ আমি সবার সঙ্গে কথা বলে, শুভেচ্ছা নিয়ে করতে চাই। আপনি কী বলেন সেটাই উচিত না?'

মালঞ্চমালা চুপ করে রইল। মুহূর্ত কয়েক ভাবল মনে হয়। তারপর সিরিয়াস গলায় বলল, 'ও, তাহলে কথাটা ভুল বলিনি। মন্মথ আমাকে খুন করতে চাইছে!' আমি চুপ করে রইলাম। মালঞ্চমালা আবার খানিকটা চুপ থেকে খানিকটা আপনমনেই বলল, 'হোয়াই নট? আমি ওর আসল জায়গায় হাত দিয়েছি। বিজনেস। সে-ই বা আমাকে ছাড়বে কেন?' আমি এবারও চুপ করে রইলাম। ভাবটা এমন স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে আমি কী করব? মালঞ্চমালা বিড়বিড় করে বলল, 'আমিও ওকে খুন করব। আই শ্যাল কিল হিম।'

BanglaBook.org

আমার কাজ অনেকটাই হয়ে গেছে। আমার চেতন অবচেতন দুটোই বলছে, মালঞ্চমালা আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে। বললাম, 'তাহলে বরং আমার সঙ্গে দেখা করবার বিষয়টা আপাতত বাদ থাকুক। আপনারা নিজেরাই যদি...।'

মালঞ্চমালা কঠিন গলায় বলল, 'না, আপনি আসবেন। কাল বিকেল পাঁচটায় আপনি আসবেন। আমি দেখতে চাই, আমাকে মারবার জন্য সে কতবড় খুনি ঠিক করেছে।'

আমি পাঁচটা বাজবার পনেরো মিনিট আগেই চলে এসেছি। পরিচয় দিতে এক তরুণী মেয়ে আমাকে দরজা খুলে বসিয়েছে। মেয়েটি সম্ভবত মালঞ্চমালার অ্যাসিস্ট্যান্ট ধরনের কেউ। বলল, 'দিদি, সুইমিং-এ গেছে। আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। আসুন, আপনি ছাদে এসে বসুন।'

মালঞ্চমালা পাঁচটা বাজার আগেই চলে এল। তাকে দেখে আমি চমকে গেলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পনেরো

এমন সুন্দর একটা মেয়েকে তার স্বামী মেরে ফেলতে চাইছে! তাও আবার এত ঘটা করে? এতগুলো টাকা খরচ করে?

মালঞ্চমালা সেজেছে। কটকটে হলুদ একটা হল্টারনেক টপের সঙ্গে, ঘন সবুজ স্কার্ট। স্কার্টের ঝুল হাঁটুর একটু নীচ পর্যন্ত এসে থমকেছে। ফর্সা লম্বা দুটো পা। টপের কারণে হাত এবং কাঁধের অনেকটাই অনাবৃত। মালঞ্চমালার হাতগুলোও লম্বা। এই মেয়ে সাধারণভাবে লম্বাও। শুধু চুল ছোট। ঘাড় পর্যন্ত এসে থমকেছে। সেই চুল ভিজে। ভিজে চুলের মেয়েদের স্নিগ্ধ দেখায়। মালঞ্চমালাকেও লাগছে। শুধু স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে না, আকর্ষণীয়ও লাগছে। সুইমিং শেষ করে চোখে কি হালকা কোনো মেকআপ নিয়েছে? নইলে চোখদুটো বড় আর গভীর লাগবে কেন? কে জানে দিয়েছে হয়তো। নিজের হত্যাকারীর সঙ্গে কথা বলবার আগে কেউ যদি সাজগোজ করে এসে বসে সেটা অবশ্যই প্রশংসার। আবার এও হতে পারে, সে হত্যার বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না। হতে পারে কেন, তা-ই হয়েছে। নইলে আমার সঙ্গে কাল টেলিফোনে অতক্ষণ কথা বলত না, আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্টও দিত না। মেয়েটি হয়তো মজা দেখতে চাইছে। নিজের খুনিকে স্বচক্ষে দেখবার মজা। এই সাজগোজ সেই মজারই অংশ। সে জানে, ঘটনা অতদূর পর্যন্ত গড়াবে না। কেন জানে? মালঞ্চমালা কি তার স্বামীকে এখনো বিশ্বাস করে?

মেয়েরা সুন্দর হয় রূপে। সেই রূপ কখনো নরম, কখনো কঠিন। পুরুষমানুষকে সে রূপ দিয়ে যেমন বাঁধতে পারে, তেমন রূপ দিয়ে ছাড়তেও পারে। তবে মালঞ্চমালার মধ্যে রূপের থেকেও আরো একটু বেশি কিছু আছে। সেই আরো কিছুটা হল ব্যক্তিত্ব। টেলিফোনের কথা শুনেও তাই মনে হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে তার এই বাড়াবাড়ি সংঘাতের

BanglaBook.org

কারণ কি ব্যক্তিত্ব? তাই ছাড়াছাড়ি? ব্যক্তিত্বের কারণে ঘটনা হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছে? হতেই পারে। এই বিষয়ে আগ্রহ দেখালে চলবে না। অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে মালঞ্চমালা যেন নিজেই ঘটনা বলে। আমি যত নিস্পৃহ থাকব এই মেয়ের ঘটনা বলার ইচ্ছে তত বাড়বে। থিয়োরিই আছে, নিস্পৃহতা আগ্রহকে আকর্ষণ করে। প্রেমের বেলায় এই থিয়োরি সবথেকে বেশি কাজে দেয়। যদিও আমার ক্ষেত্রে থিয়োরি নড়বড়ে। রেবার বেলায় একরকম, অন্যের বেলায় আলাদা। রেবা যত আমাকে তার কাছে যেতে বারণ করে, যত সে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আড়ালে চলে যায় যত, তত আমি তার জন্য টান অনুভব করি। আমি দু-একবার অন্য মেয়েদের ওপর নিস্পৃহতার থিয়োরি লাগিয়ে দেখেছি, অঙ্ক মেলেনি। শুধু মেলেনি না, কেলেঙ্কারিও হয়েছিল। একবার মানাদার বোনের ওপর পরীক্ষা করেছিলাম। মেয়ের নামটা মনে পড়ছে না। মানাদার বাড়ির এক অকেশনে গিয়ে দেখি ফুটফুটে একটা পরী মেয়ে কাঁধের দুটো ডানা খুলে ভ্যানিটি ব্যাগে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনটা চনমন করে উঠল। এটা কোনো দোষের নয়। বরং ভাল। তমালের মাসতুতো দিদি সুকন্যা রায় ডাক্তার। আমার ঝামেলার অসুখবিসুখ হলে সুকন্যাদির কাছে যাই বা ফোন-টোন করে ওষুধ চেয়ে নিই। কয়েকবার বিনিপয়সায় ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি বলেছি, 'সুকন্যাদি, ওষুধ পাঠাবার দরকার নেই। আমি প্রুফ দেখার টাকা পেয়েছি।'

সুকন্যাদি বলেছে, 'পাকামি করিস না। গরিবমানুষকে ওষুধ দিয়ে ডাক্তারদের পাপস্খলন করতে হয়। আমি বিশেষ গরিব চিনি না। যে সামান্য দু-একজনকে জানি তার মধ্যে তুই একজন।'

আমি বলি, 'ডাক্তাররা আবার পাপ কোথায় করে! তারা ভগবান। ভগবানের কোনো পাপ হয় না।'

সুকন্যাদি বলে, 'আর বলিস না, সেদিন ইন্দ্রকে দেখি ক্লিনিকে এসে বিরাট চিৎকার চেঁচামেচি করছেন।'

আমি বলি, 'ইন্দ্র কে!'

সুকন্যাদি বলে, 'দুর গাধা, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, ঠাকুর, কী হয়েছে? আপনি ক্রুদ্ধ কেন? ইন্দ্রদেব চোখ লাল করে বললেন, ক্রুদ্ধ কেন বুঝতে

BanglaBook.org

পারছ না? একটি চড় খেলে বুঝতে পারবে। আমার পা মচকেছে আর আমাকে করতে দিয়েছে ইউ.এস.জি। তাও আবার টোটাল অ্যাবডোমেন! পেটের ইউ.এস.জি. করে পা মচকানো সারানো হবে? ভগবানের সঙ্গে ফাজলামি হচ্ছে? অ্যাঁ, ফাজলামি?'

সুকন্যাদি এখানে থামল। আমি বললাম, 'তারপর?'

সুকন্যাদি গম্ভীর মুখে বলল, 'তারপর আর কী, আমি তাড়াতাড়ি ওঁকে শান্ত করে সোফায় বসলাম। বললাম, ক্রোধ সংবরণ করুন ঠাকুর। নিশ্চয় কোনো ছেলেমানুষ অন্যায় করে ফেলেছে। ইন্দ্রদেব দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, অন্যায় করে ফেলেছে? মামাবাড়ি। আমি ওর মেজোমামা? এমন অভিশাপ দেব যে ঠেলা বুঝতে পারবে। আমি বললাম, ছেড়ে দিন ঠাকুর, ছেড়ে দিন। আপনি বরং ফ্যানের তলায় বসে একটা পেপসি খান। অ্যাই রামানুজ, ঠাকুরের জন্য একটা পেপসি নিয়ে এসো। ঠাণ্ডা দেখে আনবে।'

সুকন্যাদির গল্প শুনে আমি হেসে গড়িয়ে পড়লাম। সুকন্যাদি বলল, 'হাসিস না। আমরা এরকম কত পাপ করছি তার ঠিক আছে? সেই কারণেই তোদের মতো গরিবদের দান ধ্যান করে পাপ কাটাচ্ছি।'

সুকন্যাদি মুখে যাই বলুক, আমি জানি অলস এবং অকর্মণ্য হবার কারণে সে আমাকে বিশেষরকম পছন্দ করে। আমি বলি, 'হিংসে থেকে পছন্দ।'

সুকন্যাদি বলে, 'দুর এত খেটে ডাক্তারি শেখার থেকে কুঁড়ে হলে ভাল হত। সারাদিন শুয়ে বসে থাকতাম। আমি হতাম মেয়ে সাগর।'

আমি বললাম, 'খেতে কী?'

সুকন্যাদি হেসে বলল, 'সাগর কি না খেয়ে থাকে?'

যাইহোক, এই ডাক্তারই আমাকে বলেছিল, 'যখন দেখবি সুন্দরী দেখে মন চনমন করছে তখন বুঝবি সুস্থ আছিস। প্রেশার, সুগার, কোলেস্টেরল সব নর্মাল।'

আমি মিটিমিটি হেসে বললাম, 'আর মেয়েদের বেলায়?'

সুকন্যাদি হেসে বলল, 'তোর মতো আলসেকে হিংসে করলেই ভাল থাকবে।'

সেই সুকন্যাদির কথা মতো মানাদির সুন্দরী বোনকে দেখে মন

চনমন করিয়েছিলাম। তারপর নিস্পৃহতার থিয়োরি অনুযায়ী মুখ ফিরিয়ে নিই। যতবার সে আমার ধারেকাছে আসে আমি সরে সরে যাই। এরকম কিছুক্ষণ চালানোর পর সেই মেয়ে আমার মুখোমুখি হয় এবং কড়া গলায় বলে, 'এই যে মিস্টার শুনুন, বারবার মুখ ঘুরিয়ে আপনি আমার অ্যাট্রাকশন ড্র করবার চেষ্টা করছেন। এইসব বোকামি অন্য কোথাও দেখাবেন। সবাইকে একরকম ভাববেন না।'

মালঞ্চমালার বেলায় কি একই ঘটনা ঘটবে? নিস্পৃহতার থিয়োরি ফেল করবে? মালঞ্চমালাকে দেখে আমি উঠে দাঁড়াই।

'আমি সাগর।'

মালঞ্চমালা বলল, 'বুঝতে পেরেছি, বসুন।'

আমি বসতে বসতে বলি, 'আমি আপনার বেশি সময় নেব না।'

'আমার হাতে বেশি সময় নেইও। বলুন, আমার কাছে কেন এসেছেন।'

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন, আপনার স্বামী সত্যি আপনাকে হত্যা করতে চাইছেন?'

মালঞ্চমালা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'এতে সত্যি মিথ্যের কী আছে? আপনাকে যখন টাকাপয়সা দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে, তখন নিশ্চয় সত্যি সে এই ধরনের কিছু করতে চায়।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'এখনো কোনো পেমেন্ট হয়নি। শুনেছি এইসব কাজে অ্যাডভান্স হয়। আমি ইচ্ছে করেই সেসবের মধ্যে যাইনি। কাজটা পারব কিনা বুঝতে পারছি না। টাকাপয়সা নিয়ে ফেললাম তারপর কাজ হল না, সেটা ঠিক নয়। চোর ডাকাতরা আগে স্পট দেখে কাজের সিদ্ধান্ত নেয়। আমিও তেমন আপনাকে দেখতে এসেছি। আপনার সহযোগিতা কতটা পাব বুঝতে এসেছি।'

পাথরচেয়ারে হেলান দেবার বন্দোবস্ত নেই। তবু মালঞ্চমালা যেন শূন্যেই হেলান দিল। বলল, 'কীরকম সহযোগিতা চান? সঙ্গে গিলোটিন এনেছেন? গলা বাড়িয়ে দেব?'

আমি আবার হেসে বললাম, 'আপনি বিষয়টা হালকা করে দেবার চেষ্টা করছেন মালাদেবী।'

'মালাদেবী' শুনে মালঞ্চমালার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন গিলে ফেলল।

'তাহলে কি সিরিয়াস করে দেখব? স্বামী বাড়িতে খুনি পাঠালে কতটা সিরিয়াস হতে হয় আমার জানা নেই।'

'উনি পাঠাননি, আমি নিজেই এসেছি। তাও কাল আমি বলেছিলাম, তাহলে বাদ দিন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে না। আপনিই খানিকটা জোর করলেন। সত্যি কথা বলতে কী, এই কাজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা আশ্চর্যজনক। কিন্তু পৃথিবীতে আশ্চর্য ঘটনাও তো কিছু ঘটে। ঘটে না? অনেক সময় দেখা গেছে, সত্যি ঘটনা গল্পের থেকে অদ্ভুত। আমার এবং আপনার জীবনে হয়তো সেরকমই হচ্ছে। গল্পের থেকে অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে।'

মালঞ্চমালা অবাক হয়ে বলল, 'আপনার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনকে আপনি জড়াচ্ছেন কেন!'

আমি আলতো হেসে বললাম, 'বাঃ, যে খুন হয় তার সঙ্গে আততায়ীর জীবন জড়ায় না!'

মালঞ্চমালা বলল, 'সাগরবাবু, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? আপনিও যেমন জানেন, আমিও জানি ওসব খুন-টুন বাজে কথা। মন্মথ আমাকে হুমকি দেওয়ার জন্য এইসব গল্প ফেঁদেছে। হুমকি না বলে চাপ বলাই ঠিক হবে। সে চাপ দিতে চায় যাতে আমি বিজনেস থেকে সরে যাই।'

এসব আবার কী নতুন কথা! মন্মথ তালুকদার আমাকে তার বউয়ের ওপর চাপ দিতে পাঠিয়েছে! খুন করতে নয়! টাকার কথাটা নেহাতই টোপ? বিষয়টা বুঝতে হবে। আমি বললাম, 'ঠিক আছে ওকথা থাক। টেলিফোনে কাল বলেছিলেন, আপনিও আপনার স্বামীকে খুন করতে চান। বলেছিলেন না?'

মালঞ্চমালা একটু চুপ করে থেকে কপাল থেকে চুল সরাল। বলল, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম। বলেছিলাম আই শ্যাল কিল হিম। কিন্তু সেই খুনটা প্রাণের নয়, কাজের। কাজের প্রশ্নে তাকে আমি বুঝে নিতে চাই। দেখতে চাই সে কতবড় ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনার হয়েছে। আমি যদি তার পাশে না থাকতাম তাহলে ও এত বড় হতে পারত?'

এই তো মালঞ্চমালা নিজের কথা বলতে শুরু করেছে। এবার থিয়োরি অনুযায়ী আমাকে নিস্পৃহভাব দেখাতে হবে।

BanglaBook.org

‘সেটা আমি কী করে বলব? আপনাদের স্বামীর স্ত্রীর বিষয়।’

মালঞ্চমালা বলল, ‘কেন আপনাকে বলেনি? মন্মথ বলেনি?’

আমি একটা হাই মতো তুলে বললাম, ‘না, বলেনি। বললেও আমি গুরুত্ব দিতাম না। সুপারি কিলাররা সুপারির কারণ জানতে চায় না, শুধু কিল করে।’

মালঞ্চমালা রাগে ফুঁসে উঠে বলল, ‘তা কেন বলবে, নিজের স্ত্রীর গুণের কথা বলতে লজ্জা করেছে। বিজনেস শুরু করবার সময় আমাকে বলেছিল, আমার ইচ্ছেটাও দেখা হবে। আমার স্বপ্নটাও পূরণ হবে। আমি ওর বিজনেসে জানপ্রাণ ঢেলে দিলাম। কোম্পানি মাথা তুলে দাঁড়াল। আজ “বিউটিফুল” কত বড় হয়েছে। কিন্তু আমারটা কী হল? আমার স্বপ্ন? বলতে গেলাম, বলল, এখন ওসব রাখ। ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনার হিসেবে “বিউটিফুল” সবে টেক অফ করেছে। আমাদের অনেক উঁচুতে উড়তে হবে। আমি বললাম, সেকী! তুমি যে কথা দিয়েছিলে, “বিউটিফুল” দাঁড়িয়ে গেলে আমার কাজে হাত দেবে! মন্মথ বলল, সে পরে হবে। এরপরেও আমি প্রতিশোধ নেব না?’

এতদূর পর্যন্ত বলে মালঞ্চমালা চুপ করল। গুণ, কাজ, স্বপ্ন, কথা দেওয়া...মালঞ্চমালা হত্যাকাণ্ডের পিছনে তাহলে অনেক কারণ। মালঞ্চমালা ফুলের পাপড়ির মতো খুলতে শুরু করেছে। ছাড়াছাড়ি, রাগারাগির কারণ বলতে শুরু করেছে। এখন ভান করতে হবে, আমি জানতে চাই না। শুধু তা-ই নয়, মন্মথ তালুকদার এবং তমালের ওপর আমার কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে। মালঞ্চমালাই মনের ভিতর এই সন্দেহটা কায়দা করে ঢুকিয়ে দিল। শুধু সুন্দরী নয়, এই মেয়ে বুদ্ধিমতীও। ওরা কি খুনের কথাটা বলে আমাকে ভুল বোঝাল? দু’ লক্ষ টাকার কথাটা বানানো? হতে পারে। আমার সন্দেহ বাড়ছে। খুনের জন্য আমার মতো একটা ফেকলুর পিছনে লোকটা এত টাকা খরচ করবার কথা ভাববে কেন? আমি যদি ফেল করি? করতেই পারি। ওরা ভাল করে জানে। এই বিষয়ে আমার কোনো পূর্বঅভিজ্ঞতা নেই। আজকাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খুনি রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কম পয়সায় কাজ করে দেবে। আমাকে বায়না দেবার কারণ কি শুধুই পরিকল্পনা?

Banglabook.org

আমি সহজভাবে বললাম, 'দেখুন মালাদেবী, আপনাদের ঝগড়ার কারণ জেনে আমার কী লাভ? বলবেন না।'

মালঞ্চমালা খানিকটা ঝাঁকিয়ে উঠল। বলল, 'অবশ্যই বলব। আপনি ডিল করতে এসেছেন, কারণ জানবেন না?'

'ডিল? কীসের ডিল!' আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

মালঞ্চমালা বলল, 'ন্যাকা সাজবেন না সাগরবাবু, ন্যাকা সাজবেন না। আপনি যে মন্মথর হয়ে আমার সঙ্গে প্যাচ আপ করতে এসেছেন ভাল করেই বুঝতে পারছি। কালই পেরেছিলাম। মুখে বলিনি। মন্মথ আমাদের কমন চেনাজানা কাউকে না পাঠিয়ে আপনার মতো একজনকে পাঠিয়েছে। যে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে প্রথমটায় আমাকে খানিকটা মেসমেরাইজ করে ফেলবে। মেসমেরাইজ করা বোঝেন? সম্মোহিত। আমি জানি এরপর আপনি টাকাপয়সার অফার দেবেন। আমি যাতে "বিউটিফুল" কোম্পানিকে কোনোরকম ডিসটার্ব না করি।' আবার একটু থামল মালঞ্চমালা। বলল, 'সরি, সাগরবাবু আমাকে আপনি ঠেকাতে পারবেন না। মন্মথ তালুকদারকে গিয়ে বলে দিন। আমার সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমাকে দয়া করে, বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা বলবেন না।'

'অবশ্যই বলব। সে আমাকে কথা দিয়েছিল, তার বিজনেস দাঁড়ালে গান নিয়ে কোনো একটা বড় কাজ করবে। ছবি যেমন ওর স্বপ্নের জিনিস, গান তেমন আমার স্বপ্নের জিনিস। যে গানের জন্য ও আমাকে ভালবেসেছিল, আমাকে বিয়ে করেছিল সেই গানকেই ও ভুলে গেছে...শুধু টাকা টাকা আর টাকা...ছিঃ...।'

কথা শেষ করে মালঞ্চমালা মাথা নামাল। দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল। কাঁদছে?

মালঞ্চমালা প্রায় সবই বলে দিয়েছে। আমি শান্ত গলায় বললাম, 'গান নিয়ে কী কাজ করতে চেয়েছিলেন আপনি?'

মালঞ্চমালা দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ফুঁপিয়ে উঠল, 'বলব না...বলব না...। আমি কিছুই বলব না।'

আমার আর জানতে হবে না। আমার নিস্পৃহতার থিয়োরি কাজ করেছে। আমি উঠে পড়লাম।

BanglaBook.org

ষোলো

মালঞ্চমালা আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল।

'কিছু মনে করবেন না, আমি খানিকটা ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম।'

আমি হেসে বললাম, 'মনে করবার মতো মন আমার নয় ম্যাডাম। বহুদিনের চেষ্টায় নিজেকে নিম্নস্তরের প্রাণীদের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। এই পর্যায়ে মনের কোনো কারবার থাকে না। তাছাড়া, এই মুহূর্তে আমি খুনখারাবির মধ্যে ঢুকে পড়েছি, এখন কোনোরকম ইমোশনের প্রশ্ন ওঠে না। আমি আমার কাজ করতে এসেছিলাম। মন ভাল বা খারাপ করতে আসিনি।'

'মালাদেবী' সম্বোধন বাদ দিয়ে 'ম্যাডাম'-এ ফিরেছি দেখে মালঞ্চমালা আবার একটু ঘাবড়াল মনে হয়। ভুরুতে হালকা ভাঁজ পড়ল। বলল, 'আপনার কাজ কী হয়েছে?'

একটু থেমে মালঞ্চমালার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হয়েছে।'

'কী হল? আমি কেন রেগে আছি সেই রিপোর্ট আপনার বসকে দিয়ে দেবেন? গানের কথা বলবেন তো? লাভ হবে না। আপনার বস সব জানে। জেনেশুনেই সে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। আমার কাছে গানটা বড় কথা নয়, স্বপ্নটা বড় কথা। আমি তার স্বপ্ন সত্যি করবার জন্য সাহায্য করেছিলাম, আর সে আমার স্বপ্নটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। শুনুন সাগরবাবু, আপনার বস আমাকে খুন করার আগে আমার স্বপ্নকে খুন করেছে। শরীরের খুনে আমার আর কিছু যায় আসে না। তাই ভাড়াটে খুনিকে আমার কাছে পাঠালেও আমার সমস্যা হচ্ছে না। আপনাকে আমি খুব সহজভাবে নিতে পেরেছি।'

আবার স্বপ্ন! না, মেঘলা তার গবেষণার বিষয় ঠিকই বেছেছে

BanglaBook.org

দেখছি। ঘরে ঘরে এখন স্বপ্ন নিয়ে সমস্যা। কেউ স্বপ্ন ভাঙছে, কেউ স্বপ্ন গড়ছে। কেউ ভাঙা স্বপ্ন নিয়ে হা হুতাশ করে মরছে। আচ্ছা, সবাই কি স্বপ্ন দেখে? তার থেকে বড় কথা হল, যে স্বপ্ন দেখে সে কি বিশ্বাস করে তার উলটোদিকের মানুষটাও স্বপ্ন দেখতে পারে? চারুপিসির ঝুনঝুনভাই টাইপের কোনো গুড়ের ব্যবসায়ীর কথাই ধরা যাক। কল্পনা করুন, এক দুপুরে ঝুনঝুনভাইয়ের দামি গাড়ি পার্কস্ট্রিটের মোড়ে এসে পৌঁছোল। গাড়ি আটকাল ট্রাফিকে। ঝুনঝুনভাই নরম সিটে মাথা এলিয়ে বসে আছেন। উর্দি পরা ড্রাইভার হালকা করে বেগম আখতার চালিয়েছে। পিয়া ভোলো অভিমান, মধু রাতি বয়ে যায়। কিছুদিন হল, ঝুনঝুনভাই লাঞ্চের পর শাস্ত্রীয়সংগীত শোনেন। কখনো হালকা, কখনো কড়া। এটা নির্ভর করে খাবারের মেনুর ওপর। বড়বাজারের অফিসে থাকলেও শোনেন, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে থাকলেও শোনেন। তাঁর কাছে খবর, বঙ্গদেশের জলহাওয়ায় নিজেকে মানিয়ে নিতে হলে লাঞ্চের পর শাস্ত্রীয়সংগীত আর ডিনারের পর জীবনানন্দ দাশের কবিতা একেবারে মাস্ট। দুটোই আলাদা আলাদাভাবে হজমের জন্য উপকারি। শাস্ত্রীয় সংগীত শোনার ব্যাপারে ঝামেলা কম। সিডি চালিয়ে চোখ বুজে থাকলেই হল। কিন্তু জীবনানন্দে সমস্যা হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ কবিতার বই জোগাড় হয়েছে, কিন্তু পড়তে গিয়ে বারবার হোঁচট লাগছে। একে বাংলা, তারপর খুবই উলটাপালটা সব কথা। কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়/পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা/কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ...। হাবিজাবি সব। কোনো মানে নেই। সুঘ্রাণ-টুঘ্রাণ উচ্চারণ করাও কঠিন। এই কারণে কবিতার ব্যাপারটা এখনো চালু করা যায়নি। তবে আশা, কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। সেদিন অফিসে চারু দত্ত এসেছিল। মোমবাতির বিজনেস নিয়ে আলোচনা হল। ঝুনঝুনভাই আরো পয়সা ঢালবেন ঠিক হয়েছে। বাঙালি নারীর প্রতিবাদে এগিয়ে যেতে না পারলে আর কীসে এগিয়ে আসবে? বাংলায় বিজনেস করতে এসে বাংলার জন্য কিছু তো করতে হবে। হবে কিনা? যাওয়ার সময় চারু দত্ত আধো আধো গলায় বলেছে, 'ঝুনঝুনভাই, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমি সব

ব্যবস্থা করে দেব। আমি একটা মেয়েকে চিনি, জীবনানন্দ দাশের কবিতা খুব ভাল বলে। এক মাথা চুল পিঠের ওপর খুলে, কপালে বড় টিপ পরে, ভুরু তুলে যখন বলে হাজার বছর ধরে আমি পথ...একেবারে মিষ্টি গুড়ের মতো মনে হয়। চিন্তা করবেন না, আমি বলে দেব, সপ্তাহে দুদিন এসে আপনাকে শুনিয়ে দিয়ে যাবে। তবে একটাই সমস্যা।'

'সমস্যা! কী সমস্যা? আমি তাকে রেমুনারেশন ভি দেব।'

চারু দত্ত 'দুষ্টু মিষ্টি' হেসে বলেছে, 'ওই মেয়ে রাত দশটার আগে আসতে পারবে না কিন্তু। হ্যাঁ, এই বলে রাখলাম।'

'কোই বাত নেহি। জিব্বানন্দবাবুর পোয়েট্রি শুনতে রাত তো জাগতেই হোবে। উনি তো সোহজ বেপার নেই আছেন। ডোন্ট ওয়ারি মিসেস দত্ত। রিসাইটেশন খতম হলে, আমি নিজে গাড়িতে করে আর্টিস্টকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব। সে যত রাত হয় হোবে।'

BanglaBook.org

কবিতা শোনার সেই সিস্টেম এখনো চালু হয়নি, কিন্তু চারু দত্তর প্রস্তাবে ঝুনঝুনভাই খুশি। 'জিব্বানন্দবাবুর' পোয়েট্রি শোনবার সময় কি হলঘরের মাথায় ঝাড়বাতি জ্বালাতে হয়? নাকি ঘর আঁধার থাকে? যা করার তা-ই করতে হবে। একেকটা সময় একেকরকম। একসময় ঝাড়বাতি জ্বেলে বাঈ নাচত, এখন অন্ধকারে কবিতা হোবে। বহুৎ খুব।

যাইহোক, ট্রাফিকে গাড়ি আটকানোয় ঝুনঝুনভাই বিরক্ত হলেন। হারামজাদা গাড়ি কে আটকায়? সে কি জানে না, গাড়িতে বসে আছে কে? জানে না কি? তিনি সোজা হয়ে বসে বোতাম টিপে গাড়ির কাচ নামালেন। দূরে ময়দানের আকাশের দিকে তাকালেন এবং তখনই দুম করে 'স্বপ্ন'টা দেখে বসলেন। স্বপ্নের বিষয় হেলিকপ্টার। ঝুনঝুনভাই ভাসা ভাসা চোখে দেখতে পেলেন, দূরের আকাশে হেলিকপ্টার উড়ছে। সেই হেলিকপ্টার তার নিজের। তিনি উড়ে যাচ্ছেন ময়দানের আকাশপথে। মাথার ওপর ঘুরছে পাখা। আওয়াজ হচ্ছে, ফুররর, ফুররর...। কোনো শালার বাচ্চা শালা আর তাকে আটকাতে পারছে না। তিনি হেলিকপ্টারের জানলা থেকে হাত বের করে নীচে লিলিপুট

মানুষদের দিকে নাড়ছেন। ঠিক এইরকম একটা স্বপ্ন দর্শনের সময় হাতে কিছু বাসি গোলাপ ফুল নিয়ে ঝুনঝুনভাইয়ের গাড়ির দিকে ছুটে আসে এক মলিন কিশোর। কলকাতার এসব জায়গায় গাড়ি দাঁড়ালে যেমন হয় আর কি! পার্কস্ট্রিট গোরস্তান থেকে চুরি করা, কুড়োনো, বাসি গোলাপ বেচে দু-পয়সা রোজগারের প্রাণপণ চেষ্টা। গাড়িবাবু-গাড়িবিবিদের মনে সৌন্দর্যের সুড়সুড়ি দিয়ে যদি খাওয়ার পয়সাটা জোটে। ভেজা আকাশ থেকে চোখ নামাতেই ঝুনঝুনভাই ফুলওলা কিশোরটিকে দেখতে পেলেন। হেলিকপ্টারের স্বপ্ন ভেঙে গাড়ির ভিতর ফিরলেন হুড়মুড়িয়ে। দ্রুত হাতে বোতাম টিপে জানলার কাচ তুললেন এবং মনে মনে বললেন, 'শালা হারামি। দিল শালা স্বপ্নটা ভেঙে।' এমন সুখস্বপ্নের পর 'বাবু ফুল নিন, বাবু ফুল নিন'-এর ঘ্যানঘ্যানানি শোনা যায়? অসম্ভব। আচ্ছা, ঝুনঝুনভাই কি জানেন, তিনি যেমন স্বপ্ন দেখছেন, গাড়ির বন্ধ জানলার ওপাশে দাঁড়ানো কিশোরটিও স্বপ্নও দেখছে? জানেন সেকথা? হাতে গোলাপ থাকলেও হয়তো ওই কিশোরের স্বপ্নে সৌন্দর্য নেই, আছে ভায়োলেন্স। সে হয়তো স্বপ্ন দেখছে, গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে ঝুনঝুনওয়ালার পশ্চাদ্দেশে একটা জোরে লাথি কষিয়েছে। ঝুনঝুনভাইয়ের মুখ থেকে 'ওঁক' ধরনের আওয়াজ বেরিয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বলছেন, 'ভাই, জিতনা গোলাপ হ্যায় তুমারা পাস সব হামকো দে দো, লেকিন মুঝে মত্ মারো ভাই, মুঝে মত্ মারো।'

মন্মথ তালুকদারও কি এমনটাই? আকাশে ওড়বার স্বপ্নে বিভোর হয়ে মাটিতে গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মালঞ্চমালার স্বপ্নকে অবজ্ঞা করেছে?

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'ম্যাডাম, আমি এখনো ভাড়াটে খুনি নই। একটা পয়সাও নিইনি। তবে নেব। কাজ হবার আগে হাফ, পরে হাফ।'

মালঞ্চমালা আমার কথায় পাত্তা দিল না। সে নিজের মতোই বলে যেতে থাকে।

'মন্মথর মতো একজন পুরুষকে ভালবেসেছিলাম ভাবতে আমার

এখন লজ্জা হয়। ভেবেছিলাম সে আলাদা। এখন বুঝেছি, আলাদা নয়, সে আর পাঁচজনের মতোই। জানেন সাগরবাবু, আপনারা যতই শিক্ষিত, ইনটেলেকচুয়াল, শিল্পী সাহিত্যিক বা বড় চাকুরে-ব্যবসায়ী হন না কেন, আসলে আপনারা একশো বছর আগের পুরুষমানুষ। যাঁরা বাইরে বেরিয়ে বড় কথা বলেন, আর ঘরে ফিরে মেয়েদের দমিয়ে রাখেন। মেয়েরাও যে স্বপ্ন দেখতে পারেন এটাই আপনারা মানেন না। কথায় আছে, প্রতিটা সফল পুরুষমানুষের পিছনে কোনো-না-কোনো নারীর ভূমিকা থাকে। আমি বলব, প্রতিটা সফল নারীর পিছনে কোনো-না-কোনো পুরুষের বাধা থাকে। সে বাবাই হোক, দাদাই হোক আর স্বামীই হোক।'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'ম্যাডাম, আপনি কি পুরুষবিদ্বেষী?'

মালঞ্চমালা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'না। আমি নারী, পুরুষ কোনো বিদ্বেষীই নই। এই মুহূর্তে আমার একটাই কাজ। মন্মথ তালুকদারের বিউটিফুলের প্রতিটা পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলা। ওর বিজনেস দুমড়ে মুচড়ে আমি থামব। দেখি ও কত ভাড়াটে খুনি দিয়ে আমাকে আটকাতে পারে।'

আহা! মনটা ভরে যাচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে বুঝতে পারছি, মালঞ্চমালা কোনো সহজ মেয়ে নয়, কঠিন মেয়ে। মন্মথ এমনি এমনি চূড়ান্ত ব্যবস্থার কথা ভাবেনি। শিকার এরকম হলেই শিকার করে আনন্দ। খুনের দেবতার নাম কী? আমি তাকে একটা ধন্যবাদ দিতে চাই। তিনি আমার প্রথম কাজটাই জমজমাট করে দিয়েছেন।

আমি হাসিমুখে বললাম, 'ম্যাডাম, ভাড়াটে খুনিকে এতটা ছোট ভাবা কি আপনার ঠিক হচ্ছে? বুঝতে পারছি আমাকে দেখে, আপনি খুনিদের সম্পর্কে ভরসা হারিয়েছেন, কিন্তু তার মানে এই নয়, সব খুনি আমার মতো হ্যাবলাক্যাবলা হবে। স্মার্ট খুনিও আছে। যাইহোক, আমি কি চলে যাবার আগে আপনাকে দুটো কথা বলতে পারি? দুটো নয়, তিনটে?'

মালঞ্চমালা বলল, 'না বললেই ভাল হয়। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনি এবার আসুন সাগরবাবু। আপনি আমাকে চিনে

BanglaBook.org

নিয়েছেন, রাস্তাঘাটে মারতে গেলে আপনার আর অসুবিধে হবে না। এই ফ্ল্যাটে এসে কিছু করতে পারবেন না। সিকিউরিটি খুব কড়া।'

আমি একথায় গা করলাম না। বললাম, 'আমার এক নম্বর কথা হল, আপনি যদি মনে করেন, মন্মথবাবুর ওপর প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে আমাকে কাজে লাগাবেন, আমি রাজি। এক কাজে এসে আরেকটা অর্ডার পাওয়া যেকোনো বিজনেসের জন্যই লাভজনক। আমি না হয় আপনাকে কমসমে কাজ করে দেব। আমার দুনম্বর কথা হল, আপনি কি বেলজিয়াম লেখক সেঁমন'র নাম শুনেছেন? আশা করি শুনেছেন। তিনি মূলত একজন গোয়েন্দা লেখক। তাঁর একটা গল্প আছে। স্বামী স্ত্রীর খুন বিষয়ক গল্প। গল্পের নাম দ্য ক্যাট অ্যান্ড দ্য বার্ড। বিখ্যাত গল্প। স্বামী স্ত্রী দুজনই দুজনকে খুন করতে চায়, কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত স্বামী তার স্ত্রীর পোষা বিড়াল এবং স্ত্রী তার স্বামীর পোষা পাখিকে খুন করে আক্রোশ মেটায়। আপনারা যদি মনে করেন এই ধরনের কোনো পথ নিতে পারেন। এখনই বলতে হবে না, ভেবে চিন্তে বলবেন।' আমি থেমে দম নিলাম। সেই ফাঁকে মালঞ্চমালা কথা বলল। কড়া গলায় বলল।

'আপনি কি এখন যাবেন?'

আমি বললাম, 'যাব। তিন নম্বর এবং শেষ কথাটা বলেই চলে যাব। সব পুরুষমানুষই একরকম নয় ম্যাডাম। আপনি যদি চান আমি সফল মহিলাদের একটা তালিকা দিতে পারি। তাদের সাফল্যের পিছনে সবসময়েই কোনো-না-কোনো পুরুষের আশীর্বাদ, ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা থেকেছে। সেই তালিকাও কম বড় হবে না। ফিজিক্স নিয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করে রেবা চেয়েছিল প্রথাগত চাকরিবাকরি, ঘরসংসার না করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে জীবনযাপন করবে। সে-জীবন হবে মুক্ত। তার বাবা মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রেবা এখন তার বাবার সঙ্গে লামডিং-এ। পাহাড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে দিন কাটায়। নার্সারি আর ফার্ম হাউসের কাজ করে। তার বাবা না চাইলে এটা কি সম্ভব হত?'

কথা শেষ করে আমি মধুর করে হাসলাম।

মালঞ্চমালা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'রেবা কে?'

BanglaBook.org

আমি আবার হাসলাম। বললাম, 'আজ আসি।'

আমার হাসি দেখে মালঞ্চমালার মনে সম্ভবত সন্দেহ হল। সে আবার প্রশ্নটা করে।

'রেবা কে?'

আমি মালঞ্চমালার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'একইসঙ্গে পৃথিবীর সবথেকে সুখী এবং সবথেকে দুঃখী মানুষদের একজন।'

মালঞ্চমালা অবাক হয়ে বলল, 'মানে! একটা মানুষ একইসঙ্গে সুখী এবং দুঃখী হতে পারে নাকি!'

আমি মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ালাম। শাবাশ সাগর! তুমি পেরেছ। এই সুন্দরীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছ। একটু বেশি সময় লেগেছে, কঠিন মেয়ে বলে লড়তে হয়েছে, কিন্তু পেরেছ। আমি মালঞ্চমালার দিকে এক পা এগিয়ে নীচু গলায় বললাম, 'মালাদেবী, আপনি গান দিয়ে ঠিক কী করতে চান? ফাংশন? সিডি? গানের স্কুল? নাকি গানের ওপর বই লিখতে চান?'

মালঞ্চমালা বুঝতে পারছে না সে আমার জালে জড়িয়ে পড়েছে। সাগরের অদৃশ্য জাল। যা দেখা যায় না, কিন্তু কেটে বেরিয়ে আসাও যায় না। মালঞ্চমালা মাথা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'জানি না, জানি না আমি কী করতে চেয়েছি। তবে এসব নয়, একেবারে নতুন কিছু, অন্য কিছু... এমন কিছু যা আগে কেউ ভাবেনি। আপনি এবার আসুন।'

মালঞ্চমালার কাছ থেকে বেরিয়ে এসে পকেট থেকে নন্দর টেলিফোনটা বের করে একটা ফোন করলাম।

'হ্যালো রেবা, ভাল আছ?'

'কী বলবে তাড়াতাড়ি বল। ব্যস্ত আছি।'

'কী নিয়ে ব্যস্ত আছ?'

'স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটক করাচ্ছি। তাদের রিহার্সাল চলছে।'

আমি ফোঁস করে ট্র্যাজিক নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'রেবা, একটা খারাপ খবর আছে।'

'কী খবর?'

BanglaBook.org

'আমি জেলে যাচ্ছি। একটা খুনের কাজ পেয়েছি, কাজটা করতে পারলে একইসঙ্গে অনেকগুলো টাকা এবং জেল।'

'অভিনন্দন। জেলে লক্ষ্মী ছেলের মতো থাকবে। আজ রাখি কেমন?'

এর কুড়ি মিনিটের মধ্যে রেবা আবার ফোন করল। আমি অবাক হলাম। এই তো কথা হল! রেবা তো আমার সঙ্গে এত ঘনঘন কথা বলে না। কী হল? ও কি আমার জেলে যাবার ব্যাপারে ডিটেইলসে খোঁজখবর নেবে?

রেবা জানাল তিনদিন পরেই কলকাতায় আসছে। জরুরি কাজ আছে। আমার জেলে যাওয়া ক-দিন পিছোতে হবে।

BanglaBook.org

সতেরো

শিবনাথদার বাড়িতে এসে ফেঁসে গেছি। এখন সেই ফাঁস কাটানোর চেষ্টা করছি। ফাঁস খুব সহজ নয়। শিবনাথদা থ্রি নট জি মেরেছে। থ্রি নট জি হল বিশেষ একধরনের গিঁটের নাম। মানুষ খাদে পড়ে গেলে দড়িতে এই বিশেষ গিট বেঁধে টেনে তোলা হয়। খাদে পড়া মানুষকে যেকোনো গিঁটে বেঁধে তোলা যাবে না। আমার বেলায় ঘটনা ঘটছে উলটো। থ্রি নট জি বেঁধে শিবনাথদা আমাকে খাদে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। খাদ মানে সহজ খাদ নয়। খাদের নীচে বাঘও অপেক্ষা করে আছে। পেলেই থাবা মারবে। সবার বাঘ হয় 'বাঘমামা', শিবনাথদার বাঘের নাম 'বড়মামা'।

আমি প্রায় হাতজোড় করে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দাও শিবনাথদা। আমি একাজ পারব না।'

শিবনাথদা চোখ পাকিয়ে বলল, 'কেন পারবি না? তুই কোন মাতব্বর যে পারবি না? ভিখিরি একটা।'

আমি কাঁচুমাচু গলায় বললাম, 'ভিখিরি বলেই তো পারব না শিবনাথদা। খুবই কঠিন কাজ। আমি আমার জীবনে যত কাজ করেছি তার মধ্যে সবথেকে কঠিন। আমাকে ছেড়ে দাও।'

'এই সুযোগ পাবি না হারামজাদা। পথে পথে তো ভিক্ষে করে খাস, এবার রাজার মতো থাকবি। রোজ পোলাও কালিয়া খাবি। খাওয়া হয়ে গেলে গড়গড়া টানবি।'

আমি বললাম, 'আমার দরকার নেই। বিড়ি সিগারেট গড়গড়া কোনো কিছু টানারই আমার দরকার নেই। এই কাজ আমি পারব না।'

শিবনাথদা এবার রেগে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'আমার বেলা কাজ কঠিন না? আর পাঁচজনে বললে তো ফু ফু করে কাজ করে দিস। দিস না? বল দিস কিনা। সাগর, আমার সঙ্গে বেশি

BanglaBook.org

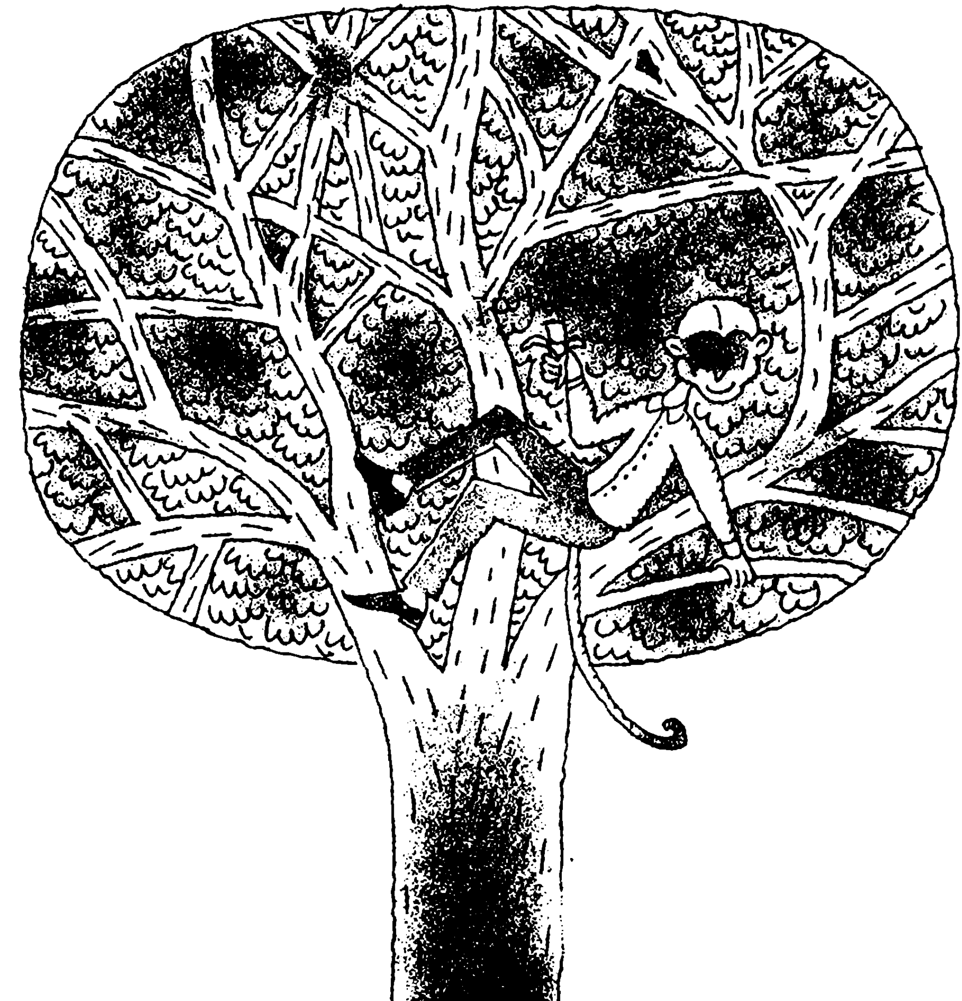

খুনসুটি করতে যাস না। নর্থ ক্যালকাটায় বড় হয়েছি। অনেক ঘুনসুটি দেখেছি। এই বলে রাখলাম, আমাকে একদম ঘুনসুটি দেখাবি না।'

'ফু ফু' বা 'ঘুনসুটি' মানে কী? জানি না। তাও 'লু লু' শুনেছি, 'ফু ফু' শুনিনি। তেমন আবার 'খুনসুটি' শুনেছি, 'ঘুনসুটি' শুনিনি। ঘুনসুটি কি খুনসুটির স্ত্রী লিঙ্গ? হতে পারে। শিবনাথদা মাঝেমাঝেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব শব্দ ব্যবহার করে। ইন্টারেস্টিং সব শব্দ। নিজের বানানো। স্পট বানানো। কথা বলতে বলতে মুখে চলে আসে। আমার বহুদিনের ইচ্ছে, শিবনাথদার এইসব শব্দভাণ্ডার নিয়ে একটা কালেকশন করব। শব্দ সংকলন। কালেকশনের নাম হবে 'শিবনাথের শব্দ'। সত্যি কথা বলতে কী, আমি যে কোনো কোনো রোববার শিবনাথদার বাড়িতে আসি তা এই শব্দের টানেই আসি। ঘণ্টাখানেক বসে থাকলে বেশ কয়েকটা নতুন নতুন 'শব্দ' পাওয়া যায়।

আমি খানিকটা মিউমিউ করে বললাম, 'তোমার বেলা আমার বেলা বলে নয় শিবনাথদা, এ বিরাট ঝামেলার কাজ। আমি এসবের কিছুই জানিও না, বুঝি না। এসবের থেকে একশো হাত দূরে থাকি।'

শিবনাথদা রাগে দাঁত কড়মড় করে বলল, 'তুই কোনটারই বা কী বুঝিস সাগর? শুধু জানিস কীভাবে বাড়িতে এসে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোনো যায়। অলস, অকর্মণ্য, বাজেবকা একটা ছেলে। তোর বয়েসের ছেলেরা কী করে জানিস? জানিস কী করে? ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র হয়। বড় বড় চাকরিবাকরি করে। দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। যাদের লেখাপড়ায় ন্যাক তারা পিএইচডি করে। আমার এক ভাইপো গবেষণা করতে কোথায় গেছে জানিস? জানিস কোথায় গেছে? ভিখিরি কোথাকারে।'

আমি অপরাধীর মতো মাথা নাড়লাম, 'না, জানি না।'

শিবনাথদা খেঁকিয়ে উঠল, 'কেন জানিস না? ভাল ছেলেমেয়েদের খবর রাখতে গা ফুলকোয়? কই সিনেমা থিয়েটারের ছেলেমেয়েদের খবর রাখতে তো গা ফুলকোয় না! কোন ক্রিকেটার কোন মেয়েমানুষ নিয়ে হোটেলের ঘরে ছিটকিনি দিয়েছে সে-খবর রাখতে তো গা ফুলকোয় না!'

আর একটা শব্দ পাওয়া গেল। ফুলকোয়! এটা কি চুলকোনোর সমার্থক? নাকি লুচির মতো ফুলে ফুলে ওঠবার কোনো ব্যাপার?

অ্যালার্জি হলে মাঝেমধ্যে গায়ে চাকা চাকা চাকা হয় না? সেরকম হতে পারে। যাইহোক 'ফুলকোয়' শিবনাথদার শব্দ কালেকশনে স্থান পেয়ে গেল।

আজ শিবনাথদার হচ্ছেটা কী! শব্দের ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে যে! আচ্ছা কী বিপদ! আমি শিবনাথদার ভাইপোর খবর রাখব কী করে? আমি তো তাকে চিনিই না। কত মানুষ কত কিছু নিয়ে গবেষণা করছে। সবার খবর কি আমরা রাখি? তারওপর আমি লেখাপড়া লাইনের ছেলে নই। লেখাপড়ার সঙ্গে আমার বহুদিন কোনো সম্পর্ক নেই। গ্রামের বাড়িঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছি কলেজে পড়বার সময়। মোটামুটিভাবে কলেজ টপকেছি। রেজাল্ট ভালও না আবার মন্দও না। আমাদের কলেজের মাস্টার সিএনকেকে বলতেন, 'এটাই বিপদ। ভাল হলে আমেরিকা যাওয়া যায়, মন্দ হলে উচ্ছন্নে। ভালও না, মন্দও না হলে কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না। পথে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হয়।' সিএনকেকে স্যারের কথা আমার ক্ষেত্রে পুরো মেলেনি। আমি রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে বেশি ঘুরি না। আমি ঘুমোই। এক কামরার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। চাকরিবাকরি করি না। করি না মানে পাই না এমন নয়। এই যুগে কাজ পাওয়া যায়। বাঙালি জীবনে যুগের ছড়াছড়ি। হিমযুগ, প্রস্তরযুগ, অগ্নিযুগের মতো নবজাগরণের যুগ, স্বাধীনতার যুগ। তারপর একসময়ে পেল বিধান রায়যুগ, জ্যোতি বসুর যুগ। সত্তরের দশকে বাঙালি পেল পেটোর যুগ, আশির দশকে নন্দনযুগ। এখন হল 'শিল্প না কৃষি? কৃষি না শিল্প? শিল্প শিল্প, কৃষি কৃষি'র যুগ। এই যুগে একটা না একটা কাজকর্ম জুটিয়ে ফেলা বাঙালির পক্ষে খুব একটা সমস্যা নয়। আমার কাছেও প্রস্তাব আসে। নিতে পারি না। আমি পারি না এমনটা নয়, আমার মন পারে না। চাকরি, ফ্ল্যাট, টিকোলো নাকের বউ, ইএমআই গাড়ি, ইংলিশ মিডিয়াম ছেলেমেয়ে, শনিবার শনিবার অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বোদলেয়ার আমি কি চাইনি? আমিও চেয়েছিলাম। আমার মন আমাকে অ্যালাও করেনি। বউয়ের মতো কলার চেপে রেখেছে। বউ এবং মনের মধ্যে পার্থক্য একটাই। বউকে ডিভোর্স দেওয়া যায়, মনকে ডিভোর্স দেওয়া যায় না।

যাইহোক বাজে কথা থাক। আমি দিনের বড় একটা সময় ঘুমোই। ঘুমিয়ে আরাম পাই। অনেকে মনে করে, ঘুমোনো ব্যাড হ্যাবিট। যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই ঘুমোতে হবে। তার বেশি ঘুমোলে সময় নষ্ট। স্কুলে পড়ার সময় বড়রা কথায় কথায় বলতেন, যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে। আমরা আড়ালে বোকা রসিকতা করতাম, বলতাম, তাহলে লাঠি হচ্ছে সবথেকে ভাগ্যবান। সে কখনো শোয় না। সারাক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় মানুষ ঘুমিয়ে কাটায়! বাকিটুকু জেগে কাজ করে এবং ফল লাভ করে। সেই ফলে মোটামুটি দুটো ভাগ। এক ভাগে সৎ পরিশ্রম করেও দরিদ্র। সমাজে কুঁকড়ে মুকড়ে থাকা। আর দ্বিতীয় ভাগে মানুষ ঠকিয়ে বাড়ি গাড়ি ঘোড়া। বুক ফুলিয়ে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ানো। জেগে থাকা মানুষের কাজের অবশ্য কিছু উপভাগ আছে। কেউ কেউ আবার জেগে থাকলেও কিছু করে না। চিত হয়ে শুয়ে থাকে আর পা নাচিয়ে নাচিয়ে টিভি দেখে। আচ্ছা, এতটা সময় মানুষ যদি না ঘুমোত তাহলে কী হত? পৃথিবীটা কি আর একটু সুন্দর হত? আরো খানিকটা মায়াময়? মানুষ কি তখন বুঝত, এই পৃথিবী কেবল আমার নয়, এই পৃথিবী সকলের। খেতে পাওয়া মানুষের যেমন, তেমন খেতে না পাওয়া মানুষেরও। এমনকী শুধু মানুষের নয়, গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গেরও এই পৃথিবীর ওপর সমান অধিকার। জেগে থাকা মানুষ এসব বুঝবে? যদি বুঝত তাহলে ভাল। তবে উলটো হবার সম্ভাবনাও যে একেবারে নেই, এমনটা নয়। জেগে থেকে মানুষ যদি নিজের সুখ বিলাসের জন্য 'আরো চাই, আরো চাই' বলে থাবা বাড়িয়ে এরটা তারটা কেড়ে নিত তাহলে হত আরেক কেলেঙ্কারি। দুনিয়াটা আরো ঠক, জোচ্চোর, ঘুষখোরে যেত ভরে। তার থেকে ঘুমিয়ে থাকাই তো ভাল।

যাইহোক, যা হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমি দিনের বেশিরভাগ সময়টাই ঘুমোই এটাই আনন্দের কথা। সৌভাগ্যেরও বটে। অনেকেরই ভুল ধারণা, মানুষ যখন ঘুমোয় তখন বাইরের জগতের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ছিঁড়ে যায়। তা হয় না। নিদ্রিত মানুষ অসাড়ে ঘুমোয় না। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মস্তিষ্ককোষ জেগে বা আধখানা ঘুমন্ত অবস্থায়

BanglaBook.org

থাকে। উচ্চমস্তিষ্ক যাকে আমরা থ্যালামাস বলি, সেটা পুরোপুরি কাজ করে না ঠিকই, কিন্তু বাইরের জেগে থাকা দুনিয়ার সঙ্গে ঘুমন্ত মানুষের আংশিক যোগাযোগ থাকে অবশ্যই। সে হাত পা নাড়তে পারে, পাশ ফেরে বা উপুড় হয়। এমনকী কথাবার্তাও বলে। ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর অসুখ তো আমরা সবাই জানি। ঘুম সম্পর্কে বহু বিজ্ঞানীর বহু মত, বহু ধারণা। এ ব্যাপারে মহাবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মত তো অতি ইন্টারেস্টিং। তিনি বলেছেন, শরীরের বিচারে ঘুম হল পিছন দিকে চলা। জন্ম নেওয়ার আগে মাতৃগর্ভে মানুষ যেমন ভ্রূণাবস্থায় থাকে তেমন। দুটো হাঁটু মুড়ে থুতনির কাছে নিয়ে আসে সে। নিশ্চিন্ত, নিরাপদ ভঙ্গি। ঘুমের সময় আদিম অলীক বিশ্বাসের পর্যায়ে চলে যায়। বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়। আত্মরতির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। ফ্রয়েড বলেছেন, প্রতি রাতে ঘুমের মধ্যে আমরা এই নার্সিসিজমে ফিরে যাই। 'অহং'কেই প্রশ্রয় দিই। পারিবারিক, সামাজিক যাবতীয় দায় থেকে হয়ে থাকি মুক্ত। সাধু! সাধু!

ঘুমের পক্ষে এই সওয়াল কি যথেষ্ট নয়?

এতটা পর্যন্ত শুনে যাঁরা ভাবছেন, খাওয়াদাওয়া আর ঘুম ছাড়া সাগরের 'নো ওয়ার্ক' তাঁরা অবশ্য শিবনাথদার মতো ভুল করছেন। ঠিকঠাক খাওয়াদাওয়া এবং ঘুমের জন্য কিছু উপার্জনের প্রয়োজন। সেই সময়টা খানকতক টিউশন, প্রুফ দেখার পরও মাঝেমধ্যে এদিক ওদিক কাজ নিতে হয়। স্মার্ট ভাষায় যাকে বলে 'অড জব'। চলতি ভাষায় যাকে বলে উদ্ভট কাজ। যে কাজ চট করে কেউ করতে পারে না। যারা আমার 'আমার যা আছে', 'তিন নম্বর চিঠি', 'রাজকন্যা', কাহিনিগুলো পড়েছেন এইসব কাজ সম্পর্কে তাঁদের ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ধারণা হয়েছে। উদ্ভট কাজের জন্য আমি পয়সা পাই। সেই পয়সায় বাড়িভাড়া, খাবার হোটেলের ধারবাকি মেটে। তবে সবসময় পাই না। বেকার যুবককে দিয়ে বিনিপয়সায় কাজ করিয়ে দেবার প্রতি মানুষের একধরনের স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। ভাবটা এমন বেকারের পয়সা লাগে না। শিবনাথদা আমাকে সেরকমই একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চাইছে। এই কাজে টাকাপয়সা আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে টাকাপয়সা করবার স্কোপ আছে। তবে স্কোপ থাকলেও লাভ নেই।

BanglaBook.org

টাকা দিলেও একাজ করতে পারব না। এর থেকে খুন করা সহজ। সেই কাজ তো আমি ইতিমধ্যে নিয়ে ফেলেছি। শিবনাথদা দেখছি নাছোড়বান্দা। দড়িতে গিঁট বেঁধে আমাকে খাদে নামিয়ে দিতে চাইছে। থ্রি নট জি খুলে বেরোতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

শিবনাথদার খেঁকানি চলছে সমানে।

'আমার ভাইপো কী করছে সে-খবর রাখবি কেন? ভাল খবর রাখবার কোনো ইচ্ছে আছে? কোনো ইচ্ছে নেই। শুনে রাখ, আমার ভাইপো একজন বটানিস্ট। এই মুহূর্তে সে আছে আমাজনের গভীর জঙ্গলে।'

এই চান্স। শিবনাথদার ভাইপোকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে নিজের গিঁট খুলতে হবে, বাঁচতে হবে। চোখ কপালে তুলে বললাম, 'বল কী! একেবারে আমাজন! কী করছে সেখানে? গাছের ডালে বসে পেপার লিখছে?'

শিবনাথদা চোখ পাকিয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'ঠাট্টা করছিস? অ্যাঁ? আমার ভাইপোকে নিয়ে ঠাট্টা করছিস?'

আমি তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বললাম, 'ছি ছি, ঠাট্টা করব কেন? সে একজন লেখাপড়ার মানুষ। শিক্ষিত মানুষকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে? ঠাট্টা করতে হয় গণ্ডমূর্খ চাষাভুষোকে নিয়ে।'

'তাহলে গাছে বসে লিখছে বললি কেন?'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'জঙ্গল বলে গাছ বললাম। পাহাড় হলে বলতাম পাথরে বসে লিখছে। অনেক বড় বড় লেখক পাথরে বসে লিখেছেন। ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ পাথরের ওপর বসে চাঁদের পাহাড় লিখেছিলেন। কবি কিটস...।'

কথা শেষ করতে দিল না শিবনাথদা। দুপাশে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে বেশি ভ্যাস্টামো দেখাস না সাগর। বেশি ভ্যাস্টামো দেখাস না। জঙ্গল কি স্টাডি যে টেবিল চেয়ার নিয়ে পেপার লিখবে? বান্টু গেছে লতাপাতা সংগ্রহ করতে।'

ভ্যাস্টামো! বাঃ। শব্দ কালেকশনে ঢুকে গেল। আমি অবাক হবার ভান করে বললাম, 'লতাপাতা সংগ্রহ!'

BanglaBook.org

শিবনাথদা আবার ধমক দিল। বলল, 'অবশ্যই লতাপাতা। লতাপাতার ওপর গবেষণা করতে গিয়ে কি বাঘ ভল্লুকের সংগ্রহ করে ফিরবে? তারপর চিড়িয়াখানায় সাপ্লাই দেবে?'

আমি তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললাম, 'না না তা কেন করবে। আচ্ছা, শিবনাথদা, তোমার সঙ্গে কি মাঝেমধ্যে ভাইপোর কথা হয়? আমাজনের জঙ্গল থেকে সে কি তোমায় টেলিফোন করে? মেইল?'

শিবনাথ চোখ সরু করে সন্দেহের গলায় বলল, 'কেন?'

আমি বিনয়ের হেসে বললাম, 'তাকে একটা কথা বলবে?'

শিবনাথদার চোখ আরো সরু হয়ে গেল।

'কী কথা?'

আমি খুব স্বাভাবিক মুখ করে বললাম, 'সে যেন ফেরবার সময় খানিকটা পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল আর বাবলাছাল নিয়ে আসে। বেশি নয় এতটুকু করে আনলেই হবে।' কথা শেষ করে আমি হাত দিয়ে মাপ দেখালাম।

শিবনাথদা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এগুলো কী?'

আমি গদগদভাবে বললাম, 'সবই লতাপাতা, ছালবাকল। এককথায় বলতে পারো বনজসম্পদ। প্রাচীনকালে ঋষি মুনিরা বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতেন। পিত্তশূল, উদ্ধশ্লেষ্মা, অম্লপিত্ত হলে বেটে খেতেন। হার্বাল ট্রিটমেন্ট। আমি ঠিক করেছি, পুরোপুরি লতাপাতা, ছালবাকল চিকিৎসায় চলে যাব। তোমার ভাইপো আমাজনের অরণ্যে আছে শুনে আশ্বস্ত হলাম। ওকে দিয়ে মাঝেমধ্যে জিনিসপত্র আনানো যাবে। গবেষণার ফাঁকে সে খুঁজবে পিত্তশূলনিবারক লতা।'

ভেবেছিলাম, এই কথা শোনবার পর শিবনাথদা নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না। আমাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। আমার থ্রি নট জি গিঁট যাবে কাটা। আমি হব মুক্ত। কিন্তু তা হল না। শিবনাথদা ঠোঁটের কোনায় হালকা হাসি এনে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলল, 'আমাকে তুই কী ভাবছিস সাগর? আমি একটা জিন্টিস? খুরকা? তোর মতলব বুঝতে পারছি না? হাবিজাবি বলে তুই আমাকে রাগিয়ে দিতে চাইছিস সেটা ধরতে পারছি না? আমাকে এত

BanglaBook.org

এলবালুক ভাবিস না রে। আমি চট করে রাগব না। বাজে কথা বাদ দিয়ে কাজের কথায় আয়। আমি একটা ঠিকানা দিচ্ছি, আজই সেখানে চলে যাবি। বিকেলে যাবি। যাবার আগে ফোন করে নিবি। বড়মামাকে ফোন না করে গেলে পাবি না।'

আমি একইসঙ্গে খুশি এবং হতাশার নিশ্বাস ফেললাম। খুশি হওয়ার কারণ তিনটে নতুন শব্দ পেলাম। জিন্টিস, খুরকা আর এলবালুক। আর হতাশ হলাম, শিবনাথদাকে বেলাইনে নিয়ে যেতে পারলাম না বলে।

'আপনার বড়মামা?'

'না, সকলের বড়মামা। গোকুলদাকে এই জগতে সবাই বড়মামা নামে চেনে।'

আমি অবাক হলাম। বললাম, 'সেকী! নামে চেনে না!'

শিবনাথদা বলল, 'পলিটিকসে এরকম হয়। অনেক সময় লিডারদের বড়মামা, মেজকাকা, ন'মেসো, মেজদা, ছোটজামাইবাবু নামে চেনাচিনি হয়। ওরিজিনাল নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ক্রিমিনাল জগতে নাম হয় গালকাটা কালু, হাতকাটা হালু, বোম কালি, চাকু সন্তোষ—এইসব।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'ভাগ্যিস।'

শিবনাথদা চোখ বড় করে বলল, 'কী ভাগ্যিস?'

আমি লজ্জা পাওয়া গলায় বললাম, 'ভাগ্যিস অন্যদের এরকম কোনো নাম হয় না। হলে কী ঝামেলাই না হত। হাতকাটা অর্থনীতিবিদ প্রফেসর চট্টোপাধ্যায়, ভজন শিল্পী ছোড়দা শ্রীকল্যাণ হাঁসদা, কানকাটা লেখক শ্রীমান প্রচেত গুপ্ত...।'

শিবনাথদা এবার জোর ধমক দিল।

'চোপ! অনেক ইকলামা হয়েছে। এবার আমি যা বলছি তা-ই কর। আচ্ছা দাঁড়া, আমি বড়মামাকে এখনই ফোন করে তোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিচ্ছি।'

আমি হাঁই হাঁই করে উঠলাম, 'থামো, থামো শিবনাথদা। এখনই কিছু বোলো না। আমাকে একটু ভাবনাচিন্তা করবার সময় দাও। মনে শক্তি আনতে হবে।'

BanglaBook.org

শিবনাথদা ততক্ষণে লিডার বড়মামাকে মোবাইল ফোনে ধরে ফেলেছে।

'কেমন আছেন বড়মামা...প্রণাম জানবেন...আরে না না আমি পালাব কেন?...ছি ছি...আমি কখনো পালাতে পারি...ছি ছি...পালিয়ে যাবই বা কোথায় বড়মামা?...যতদূরেই যাই আপনি ঠিক ধরে ফেলবেন...আপনার হাত থেকে কেউ কোনোদিন পালিয়ে বেঁচেছে... হ্যাঁ, লোক একটা পেয়েছি...গ্যাবলা লোক...আপনি যেমনটি চেয়েছিলেন...আলাভোলা, হাঁদা...দেখলে মনে হবে ভিখিরি...প্রায় সেরকমই...সাগর নাম বড়মামা...সাগর, সাগর...সি...না না, সি বিচ নয়, ওনলি সি...না না বাড়িঘর কিছু নেই...কাজকর্মও কিছু করে না...বলছি তো আসলে অপদার্থ ভিখিরি...আপনি তো অপদার্থই খুঁজছিলেন...খুঁজছিলেন না?...বড়মামা, সাগর শুধু অপদার্থই নয়, টাঁটেশও...টাঁটেশ মানে?...ও কিছু মানে নেই...হে হে...আমি ওরকম দুমদাম বলে ফেলি...আজই আপনার কাছে সাগরকে পাঠিয়ে দিই? ...আজ নয়, নেক্সট উইকে? পরের সোমবার? আচ্ছা, তা-ই হবে...প্রণাম জানবেন বড়মামা...এখন ছাড়ি?'

কান থেকে মোবাইল ফোন নামিয়ে রেখে শিবনাথদা জিভ দিয়ে সামনের দাঁতের পাটির ওপর একবার বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, 'বড়মামার সঙ্গে হালুসপালুস কিছু করিস না সাগর। সময়মতো চলে যাবি। পলিটিক্যাল লোক। খুন জখম জলভাত। সব মেনে নেবে, কোনোরকম হালুসপালুস মানবে না। কথার খেলাপি করলে বিপদে পড়বি। এক সপ্তাহ পর, সোমবার চলে যাবি। তোর নাম যখন বলে দিয়েছি আর একটুক্ষণের মধ্যে তোর হিস্ট্রি জিয়োগ্রাফি সব জেনে ফেলবে। লিডারদের নেটওয়ার্ক দারুণ হয়। পালাতে গেলে ঘাড় ধরে নিয়ে আসবে। নিয়ে এসে হাত পা ভেঙে ছেড়ে দেবে। তোকে অবশ্য অপশন দেবে। কোন হাত পা ভাঙবে সেই অপশন। তুই ইচ্ছেমতো ডান বাঁ বেছে নিতে পারবি। বড়মামার এটাই কায়দা। আরো একটা বড় গুণ আছে। হাত পা ভাঙার পর তোকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্লাস্টার করিয়ে আনবে।'

আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম। বললাম, 'এ তুমি কী করলে

শিবনাথদা? আমাকে খাদে ফেলে দিলে? আমি জানতাম তুমি আমাকে খুব ভালবাস। এই তোমার ভালবাসার নমুনা?'

শিবনাথদা উঠে দাঁড়িয়ে অল্প হেসে বলল, 'ভালবাসা কাকে বলে আজ বুঝবি না, কয়েকদিন পরে বুঝবি। সমতলে তোকে দিয়ে কিছু হবে না। তোকে খাদেই ফেলতে হবে। কিছু মানুষ থাকে খাদের জন্য। তুই হলি সেরকম। খাদমানুষ। খাদে পড়ে হ্যাঁচোর প্যাঁচোর করাই তোর জীবনের নিয়তি। এই বড়মামা লোকটি যেমন ধুরন্ধর, তেমন ক্ষমতাবান। ওর কথা শোন, দেখবি তোর ভাল হবে। জীবনে খাওয়া পরার কোনো চিন্তা থাকবে না। সেদিন এসে আমাকে বলে যাস। যা ভাগ এখন আচমূল কোথাকারে।'

আমি মুখ শুকনো করে শিবনাথদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। এ আমি কী ভয়ংকর বিপদে পড়লাম রে বাবা! পালাব? তারপর যদি ধরা পড়ি? সত্যি কি হাত পা ভেঙে দেবে? আমি কোন অপশন দেব? ডান হাত? নাকি বাঁ পা? তবে শিবনাথদার কাছ থেকে অনেকগুলো নতুন নতুন শব্দ কালেক্ট হল। ফুফু, ঘুনসুটি, ফুলকোয়া, 'ভ্যাস্টামো...। একদিনের পক্ষে অনেক। মনে হচ্ছে, 'শিবনাথদার শব্দ' বইটা একখণ্ডে শেষ করা যাবে না। কয়েক খণ্ড লাগবে।

BanglaBook.org

আঠেরো

বৃষ্টি।

সারাদিন ঝরঝর করে পড়ছে। বৃষ্টি হলেও বৃষ্টি পড়ে, আবার না হলেও মনে হয় পড়ছে। আসলে এই সময়টায় বৃষ্টির একটা ঘোর তৈরি হয়। আজ কিন্তু সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছে। সকালে আকাশ ভেঙে নেমেছিল। বেলার দিকে ধরেছে একটু, তবে থামেনি। আমি আর রেবা ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনে দিয়ে হাঁটছি। দুজনের কারো মাথাতেই ছাতা নেই। ছাতার বিষয়ে আমাদের নির্দিষ্ট পলিসি আছে। গোদা বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে ছাতানীতি। আমি আর্থিক কারণে ছাতা নিই না। রেবা নেয় না নীতিগত কারণে। আমি যে পরিমাণ ছাতা হারাই তাতে নিত্যনৈমিত্তিক ছাতা কেনা বা সংগ্রহ আমার পক্ষে অসম্ভব। জীবনে সেকেন্ড হ্যান্ড, থার্ড হ্যান্ড, ফোর্থ হ্যান্ড হরেক ছাতা নিয়ে দেখেছি। কিছুই রাখতে পারিনি। একধরনের মানুষ আছে যারা ভারি চমৎকার ছাতা আগলে রাখতে পারে। আমার স্কুলের বন্ধু প্রবাল তার ঠাকুর্দার ছাতা নিয়ে অফিস যায়। ছাতা তার কাছে প্রতীকের মতো। গোছানোর জীবনের প্রতীক। রোদে, জলে মেলে ধরে। কাজ হলে একেকটা ভাঁজ হিসেব করে, আদর করে গুটিয়ে রাখে। জীবনটা প্রবাল ছাতার মতোই দেখতে চায়। অনন্তকাল গোছানো, গোটানো হয়ে থাকে যেন পাশটিতে। আমিও প্রবালের মতো চেষ্টা করেছিলাম। ফেল করেছি। ছাতা হারিয়ে গেছে। তবে রেবার ছাতা না রাখার নীতি স্রেফ পাগলামি। নিজেই বলে, 'রেইন ম্যাডনেস।' সে বৃষ্টিকে ছাতা দিয়ে আটকাতে রাজি নয়। বোঝ কাণ্ড!

'ছাতা জিনিসটা কেমন একটা ঢালের মতো লাগে। বিচ্ছিরি। মনে হয় বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছি।'

BanglaBook.org

'তা বলে কাজের জায়গায় যাবার সময় ভিজে যাবে!' আমি অবাক হয়ে বলি।

রেবা শান্ত ভঙ্গিতে বলেছে, 'সেরকম হলে যাব না।'

আমি বলি, 'ঠাণ্ডা লেগে শরীর-টরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। জ্বর সর্দি কাশি।'

রেবা হেসে বলে, 'সেরকম হলে কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব। বৃষ্টি দেখব। তবে কিছুতেই ছাতা দিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।'

ছেলেমানুষি কথা। এর ওপর তর্ক চলে না। রেবা আসলে ছেলেমানুষই। ছেলেমানুষ এবং খানিকটা অপরিণতও বটে। নইলে আমার মতো হ্যালাব্যালা একটা ছেলেকে কেউ এত ভালবাসে? যে ভালবাসার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কিছুই নেই। শুধুই খানিকটা ভালবাসা আছে।

বৃষ্টি পড়ছে। পড়ছে টিপটিপ। যেন গান গাইছে—আমি যাব না, যাব না, যাব না ঘরে...। রেবা আর আমি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটছি। রেবার গায়ের বৃষ্টির জল আমার গায়ে এসে পড়ছে গড়িয়ে। বেশিরভাগ সময়টাই আমরা কথা বলছি না। পাশাপাশি হাঁটবার সময় প্রেমিক প্রেমিকারা পৃথিবীর সবথেকে বড় বকবকিরাম (না, শিবনাথদা দেখছি আমাকে ভালই এফেক্ট করেছে। আমিও শব্দ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছি! তবে আর একটু উদ্ভট হতে হবে। তা-ই না? বকবকিরাম একটা সহজ কথা। মানেটাও বোঝা যাচ্ছে। দেখা যাক উদ্ভটে যেতে পারি কিনা)। তাদের কথা শুরু হয়, কিন্তু থামতে চায় না। আমি আর রেবা যখন বেরোই বেশিরভাগ সময়টাই চুপচাপ থাকি। কে জানে হয়তো আমাদের সেই মৌনতাই হয়তো অনেক কথা বলে। কখনো গাঢ় স্বরে, কখনো ফিসফিসিয়ে। আমরা জানি না, কিন্তু সেই মনের কথা এমনটা হতে পারে—

'কেমন আছ রেবা?'

'খুব ভাল।'

'আমার জন্য তোমার মন কেমন করে না?'

'ওমা! সেইজন্যই তো ভাল আছি।'

BanglaBook.org

'সেকী! মন কেমন করে বলে ভাল আছ!'

'নিশ্চয়। তোমার জন্য মন কেমন নিয়েই তো আমার এত আনন্দ, এত বেঁচে থাকা।'

এই ফাঁকে বলে রাখি, রেবা দিন কয়েকের জন্য লামডিং থেকে এসেছে। তার বাবাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যাপার আছে। এর মধ্যে আমাকে সে সময় দিতে পেরেছে মাত্র একদিন। আজই সেই একদিন।

রেবা কৌতুকের গলায় বলল, 'সাগর, একটা কথা রাখবে?'

আমি বিন্দুমাত্র না থমকে বললাম, 'রাখব।'

সত্যি কথা বলতে কী, অতীতে রেবার একটা ছাড়া সবকথাই আমি রেখেছি। পরে রেবা আমাকে অনেকবার বলেছিল, সেও নাকি অমনটাই চেয়েছিল! চেয়েছিল যাতে আমি কথা না রাখি। তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সে আমাকে আরো বেশি ভালবেসেছে!

রেবা আমার চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে পালাবে?'

আমি বাঁ হাত দিয়ে কপালের জল মুছে বললাম, 'কোনো অসুবিধে নেই। পালাব।'

রেবা থমকে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বিস্ফারিত চোখে বলল, 'সত্যি! সত্যি বলছ?'

আমি হেসে বললাম, 'আমি তোমাকে হাজারটা মিথ্যে বলতে পারি, কিন্তু সাগর কখনো রেবাকে মিথ্যে বলতে পারে? বলেছে কখনো?'

রেবা বাচ্চা মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল রাস্তার মাঝখানেই। তার পায়ের চাপে ফুটপাথের জল ছলাৎ ছলাৎ করে উঠল।

'কবে পালাবে?'

রেবা বলল, 'কালই। কালই চল।'

আমি বললাম, 'কাল কেন? আজ সমস্যা কোথায়?'

যেকোনো মেয়েকেই বৃষ্টিতে ভিজলে পৃথিবীর সবথেকে সুন্দরী বলে মনে হয়। সব বয়েসের জন্যই একথা সত্য। বালিকার দল যখন ঝুপুস বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, হাসতে হাসতে, কলকল, খলখল করতে করতে স্কুল থেকে ফেরে, মনে হয় একদল পরী নেমেছে।

BanglaBook.org

আবার থুত্থুরে বৃদ্ধাকেও দেখেছি, বারান্দা থেকে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ছুঁয়ে ফোকলা দাঁতে হাসছেন। নিজের যৌবনকে যেন আর একবার আদর করছেন। এই রূপ ভোলবার নয়। আজ রেবাকেও সুন্দর লাগছে। চুল দিয়ে, গাল বেয়ে, চিবুক থেকে ঝরে পড়ছে বারি ধারা।

রেবা চকচকে চোখে বলল, 'আজই যাবে?'

আমি বললাম, 'ক্ষতি কী? দিনক্ষণ দেখে বেড়াতে যাওয়া যায়, পালানো যায় না। তাছাড়া কাল আবার কী মনে হবে কে জানে? হয়তো বা আটকে যাব কোনো কাজে। পালানোটাই বরবাদ হয়ে যাবে।'

রেবা আমার গায়ে হাত রেখে হেসে বলল, 'ঠিকই। তোমার মুডই হয়তো বদলে যাবে। তখন আমাকে একাই পালাতে হবে লামডিং। তার থেকে আজই ভাল।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'তোমার বাবা? বাবাকে জানাবে না?'

রেবা ফিক করে হেসে বলল, 'ওমা! জানিয়ে আবার পালানো যায় নাকি!'

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, রেবার বাবা একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। চমৎকার মানুষ। রোমান্টিক এবং মজারও। সেই সময় উনি একজন ডাকসাইটে মন্ত্রীর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। সেই লড়াইতে কাঠবিড়ালীর মতো আমার একটা ছোট্ট ভূমিকাও ছিল। মানুষটাকে আমি পছন্দ করি। কলকাতায় বিরাট বাংলো বাড়িতে মেয়ে আর উনি থাকতেন। অবসর নিয়ে চলে গেছেন লামডিং। যোগ দিয়েছেন সেখানে এক বন্ধুর ফার্মে। ফুল ফল, তরিতরকারি নিয়ে থাকেন। রেবাও সঙ্গে গেছে। সে পাহাড়ের দরিদ্র মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কাজে সাহায্য করে। বলে, 'শুধু পাহাড়কে ভালবাসলেই হবে না। পাহাড়ের মানুষদেরও ভালবাসতে হবে।' রেবার হরেক পাগলামি সম্বন্ধে রেবার বাবার ধারণা আছে। তবু হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলে বয়স্ক মানুষটার চিন্তা তো হবেই। পালানোর অধ্যায় থেকে সেই 'দুশ্চিন্তা' কি বাদ দেওয়া যায় না?

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'কেন? জানিয়ে পালানো যাবে না কেন? পালানোর কি কোনো নিয়ম আছে? আগেকার দিনে ডাকাতরা চিঠি লিখে ডাকাতি করতে আসত। ডাকাতি যদি জানিয়ে হয়, পালানো হবে না কেন?'

রেবা হেসে বলল, 'আবার উদ্ভট থিয়োরি শুরু করলে?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'এই থিয়োরি আমার নয়, পৃথিবীর বহু মানুষের। শিল্পী কবি সবার। তারা হাজার জনের মাঝখানে থেকেও পালিয়ে যেতে পারে। জীবনানন্দ লিখেছিলেন, তাদের হৃদয় আর মাথার মতোন/আমার হৃদয় না কি?—তাহাদের মন/আমার মনের মতো না কি?—/—তবু কেন এমন একাকী?/তবু আমি এমন একাকী? এটাও একধরনের পালিয়ে যাওয়া নয় কি? শরীরের থেকে মনের পালিয়ে যাওয়া অনেক মজার।'

রেবা ভুরু কুঁচকে, মাথা নামিয়ে বলল, 'তুমি কি আমাকে মনে মনে পালিয়ে যেতে বলছ?'

আমি হেসে ওর হাত ধরলাম। বললাম, 'না শরীরে পালাব। তবে তার আগে তুমি তোমার পিতামহকে একটা টেলিফোন করে জানাও, ক-দিনের জন্য পালাচ্ছ। তিনি যেন চিন্তিত হয়ে পুলিশ পাঠিয়ে ধরে না আনেন। যাদের যাদের কাছ থেকে আমরা পালাব বলে ঠিক করছি, সেই লিস্ট থেকে তোমার বাবার নাম ঘ্যাচাং করে দাও।'

রেবা বৃষ্টির মতো হাসল। বলল, 'পাগল একটা।'

'পাগল' আমি একলা নই। রেবাও পাগল। আলিপুরের রাস্তায় দাঁড়িয়েই আমরা টস করলাম। কোথায় যাব তা-ই নিয়ে টস। এসপ্ল্যানেডের দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ড? নাকি হাওড়া স্টেশন? পাঁচটাকার কয়েন বলল, 'ওহে পাগল ছেলেমেয়ে, তোমরা ট্রেন ধর।' বৃষ্টিভেজা পোশাকেই আমরা ট্যাক্সি ধরে সোজা চলে এসেছি হাওড়া স্টেশন। তারপর...।

পালিয়ে যাওয়ার সব গল্প বলব না। আমাদের পালানো অন্যদের জানাব কেন? তবু শুরু করেছি যখন একটু বলে রাখি। হাতের কাছে প্রথম যে ট্রেন পেয়েছি সেটা ধরে চলে এসেছি সমুদ্রের কাছে। সন্ধের

BanglaBook.org

মুখে মুখে। মাঝখানে খানিকক্ষণের জন্য গাড়ি নিতে হয়েছে। বলা বাহুল্য পালানোর গোটা খরচ রেবার। আমার পকেটে সর্বমোট তেইশ টাকা। তার মধ্যে দুটো দশটাকার নোট বারিধারায় সেই যে ভিজেছিল, শুকোয়নি আর। সম্ভবত আজও ভিজেই আছে। চমৎকার গেস্ট হাউসে রয়েছি। ভিড়ভাট্টা থেকে দূরে, একা, একটা অনাড়ম্বর বাড়ি। সমুদ্রতীরের শেষবাড়ি। আমরা যখন হোটেল-টোটেল খুঁজছি, গাড়িচালক বলল, 'একটা গেস্টহাউস আছে, কিন্তু সেখানে টুরিস্ট কম যায়।'

রেবা বলল, 'কেন? ভূত আছে?'

চালক বলল, 'না, রাতে জোয়ারের জল কাছে চলে আসে বলে ভয় পায়।'

আমি বললাম, 'আমরা ভয় পেতে চাই। ওখানেই চল।'

সত্যি রাত ন'টায়, চারপাশ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর তুমুল জোয়ার ফেনা আর চাঁদের আলো নিয়ে চলে এল গেস্টহাউসের সিঁড়িতে, আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। আমরা সিঁড়িতে বসে আছি গা ঘেঁষাঘেষি করে। এসব সিচুয়েশনে সবথেকে বেশি মানায় নায়িকার মুখে গান। নায়কের কাঁধে মাথা রেখে সে গাইবে—ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার...। অথচ রেবার সঙ্গে আমার লেগে গেল ঝগড়া! কী কাণ্ড! ঝগড়া তাও মেনে নেওয়া যেত যদি বিষয় হত প্রেম, প্রকৃতি, পূজা। সেসব কিছুই নয়। আমাদের ঝগড়ার বিষয় হল, অমলেট! হ্যাঁ, অমলেট। বাড়ি থেকে পালিয়ে সমুদ্রের ধারে বসে কোনো ছেলেমেয়ে অমলেট নিয়ে ঝগড়া করেছে বলে অতীতে শোনা যায়নি, ভবিষ্যতেও শোনা যাবে বলে মনে হয় না। সাগর রেবাকে নিয়ে তো আর কেউ কখনো প্রেমকাহিনি লিখবে না, লিখলে 'অমলেট অধ্যায়' নামে অবশ্যই একটা অধ্যায় থাকত। ঝগড়ার কথা কি একটু বলব? একটু বলি। শুধু সমুদ্রের নীল অন্ধকার, চাঁদের মায়া ছড়ানো আলো, উন্মাদ জোয়ারের বারে বারে এসে পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া নিয়ে বলব, আর অমলেট নিয়ে বলব না, তা কী করে হয়?

রেবা বলল, 'খিদে পেয়েছে।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'আমারও পেয়েছে।'

রেবা বলল, 'সারাদিন পালানোর উত্তেজনায় খিদের কথা মনে পড়েনি।'

আমি বললাম, 'আমার মনে পড়েছে, কিন্তু বলিনি। প্রেমিকাকে নিয়ে পালানোর মতো বড় কাজের সময় খিদে ঘুম অতি তুচ্ছ বিষয়।'

রেবা বলল, 'গেস্টহাউসে বললে কি হালকা কিছু খাবার পাব?'

আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে না। ডিনারের আগে এরা কিছু দিতে পারবে না। কিচেনে মোমবাতি জ্বেলে রান্না করছে। সেই মোমবাতিও নিভে যাচ্ছে বারবার।'

রেবা হালকা রেগে বলল, 'কেন পারবে না? আমাদের খিদে পেলে কী খাব?'

'সমুদ্রের জল দিয়ে চাঁদের আলো। চারপাশটা কী অন্ধকার দেখেছ রেবা? খানিকটা অন্ধকারও খেতে পারো।'

রেবা বিরক্ত গলায় বলল, 'খিদের সময় ঠাট্টা ভাল লাগছে না। সব থেকে বড় কথা হল, আমি চারপাশটা ঠিকমতো এনজয়ও করতে পারছি না। তুমি ভিতরে গিয়ে এখনই কিছু টিফিনের কথা বলে এসো।'

আমি উঠতে উঠতে বললাম, 'কী খাবে?'

রেবা একটু চিন্তা করে বলল, 'অমলেট।'

'আমিও খাব।'

'সি গাল' গেস্টহাউসে কর্মচারী বলতে দুজন। তারা মোমবাতির কাঁপা আলোয় আমাদের রাতের রুটি আর চিকেন তৈরির তোড়জোড় করছিল। সমুদ্রের ধারে মোমবাতি জ্বেলে রান্না করাটা একটা শিল্প। অমলেটের কথা শুনে বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'আগে অর্ডার হয়নি, সুতরাং অমলেট মিলবে না। ডিম নেই। এখন জোয়ারের জল এসে গেছে, ডিম কিনে আনবার কোনো উপায় নেই। উপায় থাকলেও লাভ হত না। এত রাতে এখানে ডিমের দোকান খুলে কেউ বসে থাকে না।'

রেবা এই কথা শুনে দুম করে গেল রেগে।

'ডিমের সঙ্গে সমুদ্রের জোয়ারের কী সম্পর্ক? ডিম কি সমুদ্রে পাওয়া যায়?'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'ছেড়ে দাও।'

রেবা জেদ দেখিয়ে বলল, 'ছাড়ব না।'

আমি বললাম, 'সামান্য অমলেট নিয়ে ছেলেমানুষি কোরো না।'

রেবা আরো রেগে গেল। বলল, 'অমলেট সামান্য হতে পারে, আমার ইচ্ছেটা সামান্য নয়। আমার মুড নষ্ট হয়ে গেল।'

আমি বললাম, 'বাদ দাও। বেড়াতে এসে কত কী মানিয়ে নিতে হয়। তাছাড়া এটা তো ফাইভস্টার হোটেল নয়। সামান্য গেস্ট হাউস। মেনে নাও। বিস্কুট আছে। খাবে?'

রেবা ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'আমি তো বেড়াতে আসিনি। আমি কেন মানতে যাব?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি তো এরকম কখনো কর না। অমলেটের মতো ছোট জিনিস তো দূরের কথা, জীবনের মতো বড় জিনিস নিয়েও কখনো মেজাজ হারাতে দেখিনি।'

রেবা বলল, 'আগের রেবার সঙ্গে আজকের রেবাকে মেলাবে না। আমি তো আগে কখনো পালাইনি। আমার যখন ইচ্ছে হয়েছে, আমি অমলেট খাবই খাব।'

আমিও এবার রেগে গেলাম, 'জেদ কোরো না।'

রেবা বলল, 'বেশ করব। তুমি আমাকে বারণ করবার কে?'

আমি আরো রেগে গিয়ে বললাম, 'আমি তোমার কেউ নই?'

'না, তুমি আমার কেউ নও।'

আমি বললাম, 'তাহলে আমার সঙ্গে পালিয়ে এলে কেন?'

রেবা খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'কেউ নও বলে। কেউ হলে থোড়াই পালাতাম। এবার আমার অমলেটের ব্যবস্থা করো।'

আমি মাঝসমুদ্রের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে নৌকোর মতো কোনো একটা কিছু ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। এই অন্ধকার সমুদ্রে নৌকো! জেলেনৌকো? মায়ার মতো মনে হচ্ছে।

রেবা আমাকে বলল, 'হাঁ করে কী দেখছ? প্রকৃতির শোভা? প্রকৃতির শোভা পরে দেখবে। যাও লোকগুলোর সঙ্গে ঝগড়া করে আমার জন্য অমলেট নিয়ে এসো। আমি কখনো সমুদ্র দেখতে দেখতে অমলেট খাইনি। আজ খাব।'

BanglaBook.org

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'তোমার অমলেট প্রেম দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি রেবা। বেচারিদের কাছে ডিম নেই। তুমি বরং কাল সকালে খেয়ো। ব্রেকফাস্টে অমলেট টোস্ট।'

রেবা এবার খানিকটা চিৎকার করেই বলল, 'না, এখনই চাই। যেখান থেকে পারো আমাকে অমলেট দাও।'

অনেক হয়েছে, একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। অমলেট নয়, রেবার জন্য কিছু হয়েছে। কী হয়েছে? দুম করে পালিয়ে এসে এখন মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হয়নি? যাইহোক, মেয়েটাকে শান্ত করতে হবে। আমি ঘুরে বসলাম। মুখোমুখি হলাম রেবার। সমুদ্রের আলোতেই তার চোখ দেখতে পাচ্ছি। ঢেউ মাথায় করে নিয়ে আসা ফসফরাসের কিছুটা এই ছেলেমানুষ মেয়েটাকে দিয়ে গেছে। চোখ জ্বলছে। শুধুই কি রাগ? নাকি আরো কিছু আছে?

ব্যস এই পর্যন্তই। আর বলব না। বলব না সেই ছিল আমাদের প্রথম চুম্বন। বলব না সেই চুম্বন ছিল সমুদ্রের মতো গভীর এবং জোয়ারের মতো তীব্র। বলব না, এরপর আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে নেমে গেস্টহাউসের সিঁড়ি বেয়ে ডুব দিয়েছি অন্ধকারের জলে। অথবা জলের অন্ধকারে। বলব না, কিছুতেই বলব না, কলকাতা থেকে বৃষ্টিতে যে জামাকাপড় ভিজিয়ে এনেছিলাম, আবার তা ভিজিয়ে নিয়েছি। নিয়েছি সাগরজলে। বলব না, এসব বলব না। বলব না, জলে আমাদের আলিঙ্গনের কথা। বলব না, তখন যে নোনা স্বাদ পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি, তা শুধু সমুদ্রের নয়, ছিল আমাদের শরীরেরও। আর বলব না। শুধু এইটুকু বলে রাখি, রাতে বালুকণা পাতা বিছানায় শুয়ে রেবা হেসে বলেছিল, 'সাগরবাবুকে কেমন জব্দ করলাম?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'জব্দ! কখন?'

রেবা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'ওই যে, অমলেট।'

অমলেট! আমি আরো অবাক হলাম। প্রায় উঠে বসি আর কী। রেবা জড়িয়ে ধরে জোর করে শুইয়ে দিল ফের। আমার বুকের ওপর চিবুক রেখে, হাতের আঙুল দিয়ে থুতনি ছুঁয়ে বলল, 'অমলেট নিয়ে রাগারাগি না করলে তুমি এইভাবে রিঅ্যাক্ট করতে? চাইতে আমাকে

BanglaBook.org

শান্ত করতে? আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, একটা ঝগড়া পাকাব। হাতের কাছে যা পাব তা-ই নিয়ে ঝগড়া। অমলেট পেয়ে তাকেই চেপে ধরেছি, যদি তিমি মাছ পেতাম তা-ই ধরতাম। চিৎকার-টিৎকার করে একশা কাণ্ড বাধাতাম। নইলে তুমি আমাকে অমন করে আদর করতে?'

রেবা কঠিন ধরনের মেয়ে। সিরিয়াস। আজ সে তার পোশাকের মতোই যাবতীয় কাঠিন্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আজ সে কিশোরীর মতো উচ্ছল, বালিকার মতো চঞ্চল। সমুদ্রের কাছে এলে কি এমনটাই হয়? সবাই খানিকটা সমুদ্রই হয়ে যায়? উত্তাল ঢেউ তার সব অহংকার সরিয়ে রেখে যেমন তীরে এসে লুটিয়ে পড়ে?

বাইরে সমুদ্র কথা বলছে। ঢেউয়ের সঙ্গে, তীরের সঙ্গে। আমি রেবার দিকে ঘন হয়ে যাই। শিবনাথদা আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছে মাথা থেকে সেটা যে কখন ভ্যানিশ হয়ে গেছে মনেও পড়ে না। ভুলে গিয়েছি মন্মথ, মালঞ্চমালাকেও।

BanglaBook.org

উনিশ

বড়মামা ধরনের মানুষদের চেহারা কেমন হয়? বয়স হবে মিনিমাম বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে। গায়ের রং কালো। বুকে পিঠে বড় বড় লোম। মাথায় টাক। মুখটা ভ্যাটকানো। থলথলে চেহারায় লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে বসে থাকবে। সবসময়েই 'স্নান করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, স্নান করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে' ধরনের একটা ভাব। সে সকালেই হোক, আর বিকেলেই হোক। বড়মামাদের স্নানের ব্যাপারে কোনো অবসেশন থাকে?

লিডার বড়মামা একেবারে উলটো। ছিপছিপে চেহারা। মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল। ধবধবে সাদা, মাড় ভাঙা পায়জামা পাঞ্জাবি। তিনি ঘন ঘন খেয়াল করছেন পায়জামা, পাঞ্জাবির ভাঁজ ঠিক আছে কিনা। যেন পায়জামা পাঞ্জাবির ভাঁজই জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট। কথার ফাঁকে ফাঁকে দুহাতে আঙুল দিয়ে ভাঁজ টেনে টেনে নিচ্ছেন। ও আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। ওরিজিনাল বড়মামার মুখ হয় ভ্যাটকানো, নেতা বড়মামার মুখ হাসি হাসি।

শিবনাথদা বলেছিল, বড়মামার ঠিকানা জানতে হয় না। পাড়ায় ঢুকে যে বাড়ির সামনে লোকের ভিড় দেখা যাবে, বুঝতে হবে সেটাই বড়মামার অফিস। সত্যি তা-ই। ঘরে, বাইরে প্রচুর লোক। সিঁড়িতেও নানা বয়েসের অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ দর্শনপ্রার্থী, কেউ নেতার আমচা চামচা, কাউকে আবার দেখে মনে হচ্ছে, এমনিই এসেছে। সকাল বিকেল নেতার কাছে ঢুঁ মারা অভ্যেসের মতো হয়ে গেছে। আমাদের দেশের মানুষ দুধরনের লোককে সবথেকে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে ঘুরঘুর করে সবথেকে বেশি। 'নেতা' লোক আর 'বাবা' লোক। বিভিন্ন দলের নেতার মতো, বিভিন্ন ধরনের বাবা। সত্য বাবা, মিথ্যা বাবা, কাঠি বাবা, লাঠি বাবা, অমৃতবাবা, বিষবাবা। নেতা

BanglaBook.org

এবং বাবা এই দুই ধরনের লোকেরই একদিকে অভিমুখ। 'নেতা' হতে না পারলে 'বাবা', অথবা 'বাবা' হতে হতে 'নেতা'। নেতা দেয় প্রতিশ্রুতি, বাবা দেয় আশীর্বাদ। দুটোই মূলত ধাপ্পা। এই ধাপ্পাবাজির কথা মানুষ যে একেবারে জানে না এমনটা নয়। জানে। তবু একবার করে দর্শন না হলে মন ভরে না। নেতা এবং বাবায় বিশ্বাস ভারতীয়দের জিনের মধ্যে ঢুকে আছে। বহুবার ঠকলেও তা জিন থেকে বের করা যাবে না।

বড়মামা নেতার বেলাতেও কি তাই ঘটেছে? সেই কারণেই এত ভিড়? তা-ই হবে।

আমি ভিড় ঠেলে ঘরে সেঁধিয়ে গেলাম। একপাশে একটা কাঠের চেয়ার। চেয়ারের গায়ে একটা সাদা বড় তোয়ালে। তাতে হেলান দিয়ে বসে আছেন যে মানুষটি তিনিই যে বড়মামা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বড়মামার গলায় ঘিয়ে রঙের কলার। স্পন্ডেলাইটিসের ব্যথা হলে পরতে হয়। কলারের কারণে বড়মামা বিশেষ এপাশ ওপাশ করতে পারছেন না। যখন কাউকে দেখতে চাইছেন শরীরের অনেকটাই ঘোরাতে হচ্ছে। একশো ছাব্বিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘাড় বেঁকিয়ে তিনি আমাকে দরজার গোড়ায় দেখতে পেলেন। আমি মনকে শক্ত করে ঢোঁক গিলে বললাম, 'শিবনাথদা পাঠিয়েছে।'

নেতামশাই আবার তাঁর ঘাড় ঘুরিয়ে কাকে একটা ইশারা দিলেন। কোনো চ্যালাচামুণ্ডা হবে। ঘরের কোনার দিকে একটা ধুমসো প্যাটার্নের লোক মোড়ার ওপর বসে ছিল। সেই চ্যালা লোক এগিয়ে গিয়ে তাকে ঘাড় ধরে তুলে দিল। তারপর আমাকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে বসিয়ে দিল সেখানে। কাউকে ঘাড় ধরে তুলে দেওয়া মানে সরাসরি অপমান করা। তাতে বড় ধরনের আপত্তি না করুক, মুখ বেজার হয়ে যাওয়ার কথা। হুমদোর সেরকম কিছুই হল না। উলটে আমার দিকে তাকিয়ে গদগদ ভঙ্গিতে বুকে হাত দিল। আজকাল আর হাতজোড় করে প্রণাম হয় না। ডান হাত দিয়ে বাঁদিকের বুকে একটা হাত ঠেকালেই প্রণাম হয়ে যায়। ভাল সিস্টেম। দুহাত জোড় করা মানে দুটো হাতকেই ফ্রি থাকতে হবে। তাছাড়া যে কাজ এক হাতে হয় সেকাজ দুহাতে করতে হবে তার কী মানে? এরপর একটা দিন

BanglaBook.org

আসবে, যখন দুটো হাতই অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে পা দিয়েই প্রণামের কাজ হয়ে যাবে। আমরা যাকে এখন 'লাথি' বলি, একদিন সেটাই হবে 'ভক্তি শ্রদ্ধা'র প্রকাশ। ঢুকে এক লাথি, বেরোনোর সময় এক লাথি। তার মানে ঢুকতে প্রণাম, বেরোতে প্রণাম। আমার ধারণা এই সিস্টেম কোথাও কোথাও চালু হয়ে গেছে। নইলে মানুষ কোনো কোনো লাথি খেয়ে খুশি হয় কেন?

যাক, আমি মোড়ায় বসে টানা একঘণ্টা বড়মামার এজলাস শুনলাম। হরেক বিষয়। নেতার কাছে যে এতরকমের আবেদন নিবেদন আসে আমার ধারণার মধ্যে ছিল না! আমি মুগ্ধ! নেতাদের ধৈর্য সম্পর্কে আমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। এই প্রথম হল। শুধু আবেদন নিবেদন নয়, সেইসঙ্গে 'বড়মামা'র সমাধান। সমাধানের সময় ট্যাংরা নামে এক ফিনফিনে যুবককে ডেকে আবেদনকারীর কথা ভেরিফাই করিয়ে নিচ্ছিলেন। এই যুবকই আমাকে মোড়ায় বসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নেতার এজলাস চমকপ্রদ! কয়েকটা নমুনা দিই—

আবেদনকারী এক : বড়মামা, আমার ছেলেটা বেকার বসে আছে...একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন।

বড়মামা : চাকরি কি আমার বাপের লেবুগাছ? টুক করে ছিঁড়ে তোমাকে দিয়ে বলব, যাও ছেলেকে শরবত করে খাইয়ে দাও?

আবেদনকারী এক : আপনি ছাড়া উপায় নেই।

বড়মামা : এখন বলছ আমি ছাড়া উপায় নেই, কাল ক্ষমতা পড়তি থাকলে সোজা চলে যাবে নতুন যে ক্ষমতায় আসবে তার কাছে। আমার নামে দশটা খিস্তি দেবে। পাবলিক শালা হারামির জাত। বল জাত কিনা? বল, বল, বল।

আবেদনকারী এক : অবশ্যই হারামির জাত বড়মামা।

বড়মামা : গুড। ট্যাংরা এই কাকার কাছ থেকে ছেলের একটা বায়োডাটা নিয়ে রাখ। আর ওকে পরশু, না পরশু নয়, নেক্সট বুধবার আসতে বল।

আবেদনকারী দুই : বড়মামা, এবার তো পাড়া ছাড়তে হবে।

BanglaBook.org

বড়মামা কেন? পাড়া ছাড়তে হবে কেন? তোমার ইয়েতে আবার কে হুলো দিল?

আবেদনকারী দুই ইয়েতে দেয়নি, পাশের বাড়িতে একটা হুলো পুষেছে বড়মামা।

বড়মামা : হুলো মানে! ন'পাড়ার গুণ্ডাটা? যেটা রাতদিন মাল খেয়ে পড়ে থাকে আর মেয়েছেলে করে?

আবেদনকারী দুই না না, গুণ্ডা মস্তান মাতাল নয়। এটা বড়মামা ওরিজিনাল বিড়াল। পাশের বাড়িতে পুষেছে। রাতদিন বেটা ম্যাও ম্যাও করে আমাদের জ্বালিয়ে মারছে। ভোরে বউ গলা সাধতে পারছে না, বেলায় মেয়ে পরীক্ষার পড়া করতে পারছে না, রাতে আমি ঘুমোতে পারছি না।

বড়মামা : পাশের বাড়ির সঙ্গে কথা বলেছ?

আবেদনকারী দুই বলেছি। বলছে, হুলো বিড়ালের জন্য এখনো কোনো সাইলেন্সার আবিষ্কার হয়নি। হলে মুখে লাগিয়ে দেবে। এত বড় শুয়ারের বাচ্চা।

বড়মামা : আহা, শুয়োরের বাচ্চা হবে কেন? শুয়োরের বাচ্চা হলে শুয়োর পুষত, বিড়াল নয়। যাক, ট্যাংরা এই দাদার বাড়িতে ভোট ক-টা?

ট্যাংরা : রান্নার মাসিকে নিয়ে সাতটা।

বড়মামা : লাস্ট ইলেকশনে আমাদের ক-টা পড়েছে?

ট্যাংরা : ছ-টা। দাদার গিন্নি শুধু দেননি। উনি আমাদের পছন্দ করেন না।

আবেদনকারী দুই : না না একথা ঠিক নয়, একথা ঠিক নয়...

বড়মামা : আপনি চুপ করুন। একদম চুপ করুন। ট্যাংরা, খবর ঠিক?

ট্যাংরা : পাকা খবর বড়মামা।

বড়মামা আচ্ছা, এবার বিড়ালবাড়ি। বিড়ালবাড়িতে ভোট ক-টা?

ট্যাংরা : চারটে।

বড়মামা : আমাদের ক-টা?

BanglaBook.org

ট্যাংরা : লাস্ট ইলেকশনে তিনটে পেয়েছি।

বড়মামা : গুড। ওই বাড়িতে লোক পাঠাও। বলে এসো, এবার থেকে ওদের হুলো শুধু ভোরবেলা ডাকবে। যে টাইমে বউদি গলা সাধবে শুধু ওই টাইমে। বাকি সময় ডাকলে বিপদ আছে। নেক্সট।

আবেদনকারী তিন : বড়মামা, আমার মেয়ে পালিয়েছে।

বড়মামা : বিয়ে করে?

আবেদনকারী তিন : না বিয়ে করে নয়, বিয়ে করবে বলে পালিয়েছে।

বড়মামা : মেয়ের বয়স কত?

আবেদনকারী তিন মোটে উনিশ। পুরো উনিশ নয়। এগারোদিন বাকি আছে।

বড়মামা : ছেলের নাম কী?

আবেদনকারী তিন : ছেলের নাম বাতাস।

বড়মামা : বাতাসের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে আপনার আপত্তি কেন?

আবেদনকারী তিন : ছেলে কিছু করে না। বিরাট অপোগণ্ড। গায়ে হাওয়া বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বড়মামা : বাতাস নাম, গায়ে বাতাস লাগিয়ে তো ঘুরবেই। নাম জল দিয়ে হলে গায়ে জল দিয়ে ঘুরত।

আবেদনকারী তিন : সেটা কথা নয় বড়মামা, কথা হল, ওই বদ ছেলে আপনার অপনেন্ট। আমি ভিখিরির সঙ্গেও মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছি, কিন্তু আপনার বিরোধিতা মেনে নেব না। আমি আপনার দলে বড়মামা। আপনার দলে...।

বড়মামা : কথা সত্যি না মিথ্যে?

আবেদনকারী তিন : সত্যি। দিব্যি গেলে বলছি। বদটাকে ধরতে পারলে হাত পা ছিঁড়ে দেব।

বড়মামা : ট্যাংরা, ঘটনা সত্যি?

ট্যাংরা : হাফ সত্যি বড়মামা, ওই ছেলে আগে অপনেন্টে ছিল। মেয়ে নিয়ে পালানোর পর আমাদের দিকে এসেছে।

বড়মামা : ঠিক আছে। ওকে হাফ শাস্তি দাও। ওই মেয়েকে

BanglaBook.org

বিয়ে করে আজই বাড়ি ফিরিয়ে দিতে বল। তারপর চাকরিবাকরি পেলে আবার যাবে। তার আগে যদি ওই বাড়ির ধারেকাছে হারামজাদাকে দেখতে পাও ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রাখবে। নেক্সট।

এত দ্রুত এতগুলো সমস্যা এবং সমাধান আমি আগে কখনো দেখিনি। মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায়?

ঘণ্টাখানেক এরকম চলবার পর, বড়মামা কী একটা ইশারা দিলেন। ট্যাংরা নামের যুবকটি চিৎকার করে উঠল।

'ক্লিয়ার ক্লিয়ার, পাতলা, পাতলা।'

চিৎকারের সময় ডান হাতটা তুলে ট্যাংরা দরজার দিকে নাড়তে লাগল পতাকার মতো। যেন বাতাস করছে। যারা ভিড় করেছিল তারা কথা না বাড়িয়ে এক এক করে ঘর ছেড়ে বেরিয়েও যেতে লাগল লক্ষ্মী ছেলেমেয়ের মতো। আমি আবার অবাক হলাম। বড়মামার ভাগ্নে ভাগ্নিরা খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ তো! ঘর ফাঁকা হতে বড়মামা আমাকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। এমনি উঠতে যাচ্ছিলাম, বড়মামা বললেন, 'মোড়াটা নিয়ে আসুন।' মোড়া হাতে এগিয়ে গেলাম। সেই মোড়া সবে বড়মামার চেয়ারের সামনে পেতে বসতে যাচ্ছি, তখনই একটা হাড় হিম করা ঘটনা ঘটল।

বছর কুড়ি-একুশের এক তরুণকে ঘাড় ধরে বড়মামার সামনে এনে দাঁড় করাল ট্যাংরা। ছেলেটি বাঁশপাতার মতো কাঁপছে।

কলার পরা ঘাড় তুলে বড়মামা বিরক্ত গলায় বললেন, 'এটি কে?'

'বিশু। এক নম্বর রেলগেটে থাকে।'

বড়মামা আরো বিরক্ত গলায় বললেন, 'থাকে তো আমি কী করব? আমি একটা জরুরি কাজে বসেছি, এই ভদ্রলোক কতক্ষণ বসে আছেন দেখছ না?'

বড়মামার বিরক্তি ট্যাংরা গায়ে মাখল না। বলল, 'বিশুকে বারবার বলা সত্ত্বেও কালেকশন জমা দিচ্ছে না।'

বড়মামা শান্ত গলায় বললেন, 'কালেকশন? পার্টি ফান্ডের চাঁদা?'

ট্যাংরা বলল, 'বাজারের টাকা কালেক্ট করে। কথা আছে

রোজকার তোলা রোজ জমা করতে হবে। একমাস হয়ে গেল, একটা পয়সাও ঠেকায়নি। লালু বলতে গেলে তাকে দলবল জুটিয়ে মারধর করেছে।’

ছেলেটি হাতজোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘আর হবে না বড়মামা। আমাকে ছেড়ে দিন।’

বড়মামা কষ্ট করে ঘাড় ঘুরিয়ে নরম গলায় বললেন, ‘টাকা দিসনি কেন? টাকা না দিলে পার্টি চলবে কী করে বাবা?’

ছেলেটি এবার প্রায় কেঁদে ফেলল।

‘বাবার অসুখ। হাসপাতালে টাকা খরচ করে ফেলেছি। যেখান থেকে পারি জোগাড় করে দেব। দুটো দিন সময় দিন।’

ছেলেটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বড়মামা ট্যাংরার দিকে না তাকিয়ে বললেন, ‘ওর সঙ্গে কথা বলেছিস?’

‘বলেছি।’

‘গুড। কী অপশন দিচ্ছে?’

ট্যাংরা জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, ‘বলছে, বাঁ হাত।’

বড়মামা ঠাণ্ডা এবং নীচু গলায় বললেন, ‘তাহলে তা-ই কর। বাঁ হাতটা ভেঙে এবারের মতো ছেড়ে দে। বয়স কম, ওর কথাও তো শুনতে হবে। যা নিয়ে যা। আর বিরক্ত করিস না। বাপরে, ঘাড়ে ব্যথা।’

অন্যের হাড় ভাঙার অর্ডার দিয়ে নিজের হাড় নিয়ে কাতর হয়ে উঠলেন বড়মামা। স্পন্ডেলাইটিসের ব্যথা। আমার হাড়ের কোনো সমস্যা না থাকলেও এক নম্বর গেটের বিশুর ঘটনায় আমি খানিকটা হতচকিত। নিজেকে সামলাতে সময় লাগল। শিবনাথদা তাহলে মিথ্যে ভয় দেখায়নি। বড়মামা সত্যিই মটামট হাড় ভেঙে দেয়!

যদিও আমি হাড় ভাঙার ভয়ে এখানে আসিনি। আমি এসেছি অন্য কারণে। সেদিন শিবনাথদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি কলকাতা থেকে কদিনের জন্য পালিয়ে যাব। পালিয়ে যাবার অভ্যেস আমার আছে। যাতে চাকরিবাকরির জালে জড়িয়ে না পড়ি তার জন্য আগে কতবার পালিয়েছি। আর এই কাজে তো পালাবই। আমিও তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। মাঝখানে রেবা এসে পড়ায়

BanglaBook.org

সব গোলমাল হয়ে গেল। ওর সঙ্গে পালাতে হল। তবে সে তো আলাদা পালানো। সেই পালানো হল সব ছেড়েছুড়ে রেবার কাছে পালিয়ে যাওয়া।

কাল রেবা লামডিং ফিরে গেছে। আমি তাকে স্টেশনে তুলতে গিয়েছিলাম এবং ঠিক করে রেখেছিলাম আবার পালাব। এবার পালাব শিবনাথদার কারণে। পরশু শিবনাথদা আবার যোগাযোগ করেছিল।

'কীরে সাগর, তুই বড়মামার ওখানে যাসনি! তোর এত সাহস! তুই এত বড় খাচাকাও!'

খাচাকা! নতুন শব্দ। আমি নোট করে নিলাম।

'শিবনাথদা, এমারজেন্সি কাজে আটকে পড়েছিলাম। ক-দিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল।'

শিবনাথদা হিমশীতল গলায় বলল, 'তুই কি চিরকালের জন্য বাইরে থাকতে চাস সাগর? বড়মামার সঙ্গে বিট্রে করে কেউ এই শহরে থাকতে পারে না। সে যে কত বড় ফতরহাক তোর কোনো ধারণা নেই। আমি খবর পেয়েছি, সাগরকে সে লিস্টে তুলে ফেলেছে।'

ফতরহাক মানে? খতরনাক? আমি বললাম, 'কোন লিস্টে!'

'যে কাজের জন্য তোকে সে চাইছে।'

আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, 'শিবনাথদা, পালিয়ে গেলে বাঁচব?'

শিবনাথদা শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'মনে হয় না। বড়মামার হাত খুব বড়। তবে ট্রাই নিয়ে দেখতে পারিস।'

এরপরই আমি ফের কেটে পড়বার প্ল্যান করি। রেবার ট্রেন ছাড়বে আমিও আরেক ট্রেনে উঠব। রেবার সঙ্গে লামডিং চলে যাবার কথা যে একেবারে ভাবিনি এমন নয়। শিবনাথদার কথা উল্লেখ না করেই তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম।

'তোমার ওখানে ক-দিন বেড়িয়ে এলে কেমন হয়।'

রেবা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুব খারাপ হয়। আমার ওটা কাজের জায়গা। বেড়ানোর নয়।'

আমি মলিন হেসে বললাম, 'আহা, তোমার কাজে তো আর

BanglaBook.org

USG
XRAY
BLOOD
PHYSIOT
CT SCA

বিরক্ত করব না। নিজের মতো ঘুরব, ফিরব। রেস্ট নেব আর কী!'

রেবা এবার শুধু কটমট করে তাকাল না, কটমট করে কথাও বলল!

'বলছি তো না। তোমার রেস্টের কোনো প্রয়োজন নেই। তোমাকে যেন লামডিং-এর ধারেকাছে না দেখি।'

এরপর আর ঝুঁকি নেওয়া যায় না। রেবা আনপ্রেডিকটেবল। পালাতে গিয়ে সমুদ্রের কাছে যে রেবাকে পেয়েছি তার ছিটেফোঁটাও যে এখন পাওয়া যাবে না আমি জানি। সেই কারণেই সে রহস্যময়ী। এত সুন্দর।

রেবার ট্রেন ছেড়ে দেবার পর আমি হাওড়া স্টেশনে ইতস্তত খানিকক্ষণ ঘুরলাম। শিবনাথদার বড়মামা কত ভয়ংকর জানি না, তবে কলকাতা ছেড়ে যে কয়েকদিনের জন্য পালাতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নইলে শিবনাথদাই ছাড়বে না। কিন্তু কোথায় যাব? সেদিনকার মতো যেকোনো গাড়িতে উঠে বসলে কেমন হয়? মন্দ হয় না। উঠে পড়ে টানা ঘুম দেবে। লং ড্রাইভের মতো, লং স্লিপ। ঘুম ভেঙে উঠে যে অচেনা, অজানা স্টেশন দেখব নেমে পড়ব সেখানেই। বাঃ, পরিকল্পনা সুন্দর। বেশ কয়েকবছর আগে একবার জ্যোৎস্নার রেলস্টেশন দেখেছিলাম। এবার দেখব বৃষ্টির রেলস্টেশন। তার আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে। কী খাব? ভাত না রুটি? স্যান্ডউইচ না বার্গার? আচ্ছা, অমলেট খেলে কেমন হয়? রেবার সেই ঝগড়ুটে অমলেট? নিজের মনেই হেসে ফেললাম। রেবা চলে গেছে, অমলেটটা রেখে গেছে। ঠিক আছে তা-ই হোক। অমলেট ভোজন করে আবার পালানোর জন্য প্রস্তুত হই। সেই অমলেটের পিছনে ছিল রেবার ভালবাসার ফন্দি। এই অমলেটের পিছনে নেতা বড়মামার হাড়ভাঙার ভয়। কিন্তু অমলেট খাব কোথায়? স্টেশনের ভিতর কোনো ঝাঁ চকচকে রেস্টুরেন্টে? আজকাল রেলস্টেশনগুলোতে অনেক খাওয়ার জায়গা হয়েছে। আগে ছিল না। না, দামি জায়গায় ঢোকবার ক্ষমতা আমার নেই। গরম রুটি, ছাতুর লেচি, ঘুগনি, অমলেটের মতো খাবার দামি জায়গায় খেয়ে মজাও নেই। আমি স্টেশন থেকে বেরিয়ে উলটো দিকের ঝুপড়ি রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম।

BanglaBook.org

তারপরে ঘটনাটা জমজমাট।

ব্যাপারটা কী! অমলেট ঘিরে একটা না একটা ঝামেলা আমার পিছু ছাড়ছে না যে!

আমার পালানো হল না। সোজা চলে এসেছি বড়মামার দরবারে। আমার ঘোর ভাঙিয়ে বড়মামা বললেন, 'আপনি সাগর?'

আমি একটু থেমে আমতা আমতা করে বললাম, 'না, আমি সাগর নই।'

কথাটা বলেই বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। বড়মামা অ্যান্ড কোম্পানি মিথ্যেটা ধরে ফেলবে না তো?

BanglaBook.org

কুড়ি

বড়মামা হালকা চমকে উঠলেন। কলার পরা গলা তুলে তাকালেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংরার দিকে। ট্যাংরাকে আমার ভয়। অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, ছোকরা সবার হাঁড়ির খবর জানে। আমারটাও জানে নাকি?

বড়মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সাগর কোথায়?'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'আছে। বাইরে আছে।'

'তুমি কে?'

আমি হাসিমুখ করে বললাম, 'আমি সাগরের ম্যানেজার। তার যাবতীয় কাজকর্ম দেখি।'

'সাগর কাজ করে! শিবনাথ যে বলল, কাজকর্ম কিছু করে না, হাবাগোবা লোক।'

আমি হাসিমুখ মেইনটেইন করে বললাম, 'অবশ্যই হাবাগোবা। তবে একেবারে কাজ করে না এটা ঠিক নয়। কাজ না করলে বড়মামা চলবে কী করে?'

আমার 'বড়মামা' সম্বোধনে সম্ভবত একধরনের আন্তরিকতা ছিল। নেতা খুশি হলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'তা ম্যানেজারবাবু, তুমি কি জানো, সাগরকে আমার কেন দরকার?'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'জানি বড়মামা। আমাকে তো জানতে হবেই। আপনি ফুলপুর গ্রামের উপনির্বাচনের জন্য একজন প্রার্থীর খোঁজ করছিলেন। ক্যান্ডিডেট। সে সরাসরি আপনাদের দলের কেউ হবে না, কিন্তু আপনার দলের হয়েই দাঁড়াবে। আপনি আপনার দলের লোকদের পুরো বিশ্বাস করেন না বলেই অন্য লোক খুঁজছেন।'

বড়মামা কড়া চোখে তাকিয়ে বললেন, 'এত কথা তোমাকে কে বলেছে? শিবনাথ?'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'না সবটা কেউ বলেনি। খানিকটা বলেছে। খানিকটা আমি বুঝে নিয়েছি। ম্যানেজার মানুষ, না বলা কথাও বুঝতে হয়। শিবনাথদা আমাকে বলেছিল, ভোটে দাঁড়াবার জন্য একজন লোক চাই। আপনি যে দলের লোকদের বিশ্বাস করেন না সেটা বলেনি। ওটা আমার বুঝে নেওয়া। বড় নেতা হওয়ার ফার্স্ট ক্রাইটিরিয়া নিজের দলকে বিশ্বাস না করা।'

কথা শেষ করে আমি একটু হাসলাম। এই লোকের বিশ্বাসের মধ্যে ঢুকতে হবে। ক্ষমতাবান লোকের বিশ্বাসভাজন হওয়ার একমাত্র উপায় তার দুর্বলতা বলে দেওয়া। এটা একধরনের হালকা ভয় দেখানোও বটে।

বড়মামা একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'তুমি একটু বেশি বোঝ দেখছি।'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'এতদিন সাগর স্যারের মতো পাগলা ভিখিরি টাইপ মানুষের ম্যানেজারি করছি এটুকু বুঝতে তো হবে। যাক আপনি শিবনাথদার কাছে একজন হাবাগোবা লোক চেয়েছিলেন। যে ভোটে নিজে জিতলেও পুরোপুরি আপনার কন্ট্রোলে থাকবে। আপনি যা বলবেন তা-ই করবে। যা বারণ করবেন তা করবে না। সে হবে আপনার পুতুল। মেরুদণ্ড ছাড়া পুতুল। আপনাদের দলে এরকম লোকের অভাব নেই। কিন্তু আপনি একজন নতুন মুখ চেয়েছেন। পত্রপত্রিকায় থাকে না—ভোটের নতুন মুখ? ওইরকম।'

বড়মামার নাকের পাটা অল্প ফুলছে। চোখের পাতাও কাঁপছে। রাগের লক্ষণ। নেতারা রাগলে এরকমই হয়। আর একটু অপমান করলে কান লাল হয়ে যাবে।

'বড়মামা, শিবনাথদা এরপরই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে সাগর স্যারকে চাইলেন। শিবনাথদা ঠিকই বেছেছেন। সাগর স্যার একজন হাবাগোবা প্যাটার্নের ভোলেভালা ভিখিরি মানুষ। অলস, অকর্মণ্য টাইপ। সেটাই ভাল। ইলেকশনে যত অকর্মণ্যরা জয়যুক্ত হয় তত দেশের পক্ষে ভাল। বড়মামা, আমি সাগর স্যারের ম্যানেজারি করি বলে বলছি না, রাজনীতিতে তাঁর মতো মানুষ পাওয়া একটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়।'

BanglaBook.org

বড়মামার কান কি অল্প লাল হয়েছে? মনে হয় হয়েছে। জানলা দিয়ে আলো পড়েছে বলে পুরোটা দেখতে পাচ্ছি না। তিনি ঘাড় নাড়লেন। ঘাড়ের ব্যথা কমে গেছে।

'কার সৌভাগ্য?'

আমি গদগদ গলায় বললাম, 'দেশবাসীর সৌভাগ্য। আপনি যদি সাগর স্যারকে ভোটে-টোটে জিতিয়ে নিজের কবজায় বেঁধে রাখতে পারেন, এই মানুষ রাজনীতিতে একদিন অ্যাসেট হবে। একটাই দোষ।'

বড়মামার ভুরু আরো গভীর হল।

'কী দোষ?'

'উনি চুরি-টুরি করতে পারেন না। সততার কারণে নয়, পরিশ্রমের কারণে। চুরি করতেও তো নড়াচড়া করতে হয়। হয় না? ওতে উনি রাজি নন। আমি যখন বললাম, রাজনীতিতে ঢুকলে ও চিন্তা থাকবে না, হাতের কাছে চোরাই মাল পৌঁছে যাবে তখন উনি খানিকটা নিমরাজি মতো হয়েছেন। বাকিটা আপনি বুঝবেন।'

বড়মামা বলল, 'ওই লোকের চলে কী করে?'

'মূলত বিশ্রামে।'

'তোমাকে মাইনে-টাইনে দেয়? নাকি ফ্রিতে খাটায়।'

আমি অভিমানভরা গলায় বললাম, 'ওইটাই তো ঝামেলা। বিনি পয়সায় কত সার্ভিস দেব? বলুন কত দেব? আমার তো ঘর সংসার আছে নাকি। সেই কারণেই তো শিবনাথদা প্রস্তাব দিতেই লুফে নিলাম। পলিটিক্সে ঢুকে আমার স্যার চুরি-টুরি যদি খানিকটা শিখে নিতে পারে...তাহলে আমারও ভবিষ্যৎ নিয়ে আর চিন্তা থাকে না।'

বড়মামা এবার সোজা হয়ে বসলেন। ভারী গলায় বললেন, 'অনেক বকলে। তোমার স্যারটি কোথায়?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। হাত কচলে বললাম, 'বাইরের চায়ের দোকানে অপেক্ষা করছে। যদি অনুমতি দেন ডেকে আনি। একটাই কথা, বসের ছেঁড়া ময়লা পোশাক দেখে চমকে উঠবেন না। মানুষটাই ওরকম। ঝাঁ চকচকে সাজগোজের ধার ধারে না। দেখলে মনে হয় ওরিজিনাল ভিখিরি।'

বড়মামা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ওর মুখ বলছে,

BanglaBook.org

রাগলেও আমাকে বিশ্বাস করছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'ভিখিরির সাজই ভাল। মানুষ গরিব মানুষের সাজে ভড়কি খায়। যাও ডেকে আনো।'

কথা শেষ করে বড়মামা চোখের ইশারা করলেন। সেই ইশারায় ঘর থেকে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল ট্যাংরাও। বুঝতে পারছি সে আমার পাহারাদার।

বড়মামার বাড়ির রোয়াকে মলিনবেশে রোগাভোগা চেহারার যে মানুষটা শুয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে তাকে খানিক আগে আমি হাওড়া স্টেশনের ঝুপড়ি রেস্টুরেন্ট থেকে উদ্ধার করে এনেছি। হ্যাঁ, উদ্ধারই বটে। একজন সত্যি ভিখিরি। খিদের মুখে গাদাখানেক পাঁউরুটি, এক প্লেট আলুরদম খেয়ে দোকানিকে দাঁত বের করে বলেছে, 'পয়সা নেই।' পারফেক্ট হারামজাদা। দোকানদারের নির্দেশে প্রথমে তাকে জামাকাপড় খুলে তল্লাশি চালানো হয়। ভিখিরিও গোপন কোঁচড়ে কিছু পয়সা লুকিয়ে রাখে। এই লোকের কোঁচড় থেকে কিছু বেরোয়নি। তারপর শুরু হয় চড় থাপ্পড় কিল ঘুষি। মাগনায় রুটি আলুরদম খাওয়ার শাস্তি। দোকানের কর্মচারীদের সম্ভবত ইচ্ছে ছিল, পেটের খাবার বমি করে বের করে নেবে। এইরকম একটা সময় আমি ভিতরে ঢুকি এবং লোকটাকে উদ্ধার করি। ঘটনা শুনে দোকানদারকে পয়সা মেটাই। ভিখিরি মানুষটির যত্ন করে ছেঁড়া পায়জামা, জামা পরে। হাতের তেলো দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মোছে। আমি তাকে আমার পাশে চেয়ারে বসাই। কর্মচারীদের এই আপ্যায়নে আপত্তি ছিল। আমি সেই আপত্তি অগ্রাহ্য করি। ভিখিরি মানুষ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তার মনের জোর দেখে অবাক হই।

'পয়সা নেই তো কী করব? খিদে পেলে খাব না?'

আমি বলি, 'অবশ্যই খাবে।'

'খাব বললেই হবে না। কেমন করে খাব সেটা তো ভাবতে হবে। ভাবতে হবে কিনা?'

আমি বলি, 'অবশ্যই ভাবতে হবে।'

ভিখিরি মানুষ বলল, 'ভেবেচিন্তে দেখলাম চেয়ে খাওয়াটা

BanglaBook.org

সবথেকে ভাল। তা-ই খেলাম। এবার ওরা পয়সা চাইলে। আমি বললাম পয়সা তো নেই। তখন মারধর শুরু করলে। কী মুশকিল! আমি তো চুরি করে খাইনি। আমার কী অন্যায়? আমি তো কোনো খারাপ কাজ করিনি। খিদে পেলে খাওয়াটা খারাপ কাজ?'

আমি বললাম, 'কোনো খারাপ কাজ নয়। ঘুম পেলে ঘুমোবে, খিদে পেলে খাবে এর মধ্যে অন্যায়ের কী আছে! পাখিরও এই অধিকার আছে, মানুষের থাকবে না কেন? তুমি আর কিছু খাবে?'

'হ্যাঁ, খাব।'

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমি অমলেটের অর্ডার দিলাম। মনে হয় অমলেট থেকে বেরোতে পারছি না। ভিখিরি মানুষ সেই অমলেট গভীর আগ্রহ নিয়ে খেল। মনে হল, বহু বহু বছর বাদে অথবা জীবনে এই প্রথম সে অমলেট খাচ্ছে। আমি সেই খাওয়া দেখলাম। লুকিয়ে চোখ মুছে নিজেকে ধমক দিলাম, ছিঃ, সাগরকে কাঁদতে নেই।

'এঁবার বলেন কী করতে হবে।'

আমি হেসে বললাম, 'কী করতে হবে মানে?'

'বাঃ আপনি আমার জন্য এত করলেন, আমি আপনার জন্য কিছু করব না। মালপত্র কী আছে দিন ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।'

আমি হেসে বললাম, 'কিচ্ছু করতে হবে না।'

'তা বললে হবে কেন? আপনি না থাকলে এরা আমায় মেরে আধমরা করে দিত। মানুষ গরিব মানুষকে মারতে খুব ভালবাসে, আর বড়লোকদের তেলায়। আপনি যা বলবেন তা-ই করব।'

আমার মাথায় বিদ্যুৎ চমকাল! আচ্ছা, বড়মামার কাছে যদি একে নিয়ে যাই?

বললাম, 'তোমার নাম কী?'

'কোনো নাম নেই। ভিখিরির আবার নাম কী! লোকে যখন যে নামে ডাকে।'

নাম নেই! আমি নড়েচড়ে বসলাম। বললাম, 'সত্যি তুমি আমার জন্য কিছু করতে চাও?'

ভিখিরিমানুষ বলল, 'আলবাত চাই।'

BanglaBook.org

আমি নিজেই বুঝতে পারলাম আমার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছে।

'চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে কেউ তোমার নাম জিগ্যেস করলে বলবে তোমার নাম সাগর। তারপর তারা যা যা করতে বলবে সব করবে।'

ভিখিরি মানুষ বলল, 'কী নাম বলব?'

আমি মানুষটার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'বলবে সাগর। মনে থাকবে? আর যা কিছু ভুলে যাও ক্ষতি নেই, সাগর নামটা ভুলবে না। চিন্তা কোরো না ক-দিনের জন্য খাওয়া পরা পাকা। আমার পরিকল্পনা লেগে গেলে গোটা জীবনটাও নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারে। বুঝতে পারবে, সাগর নামের কত ক্ষমতা। নামটা মনে রাখতে পারবে না?'

ভিখিরি মানুষ একগাল হেসে বড় করে মাথা কাত করল। আমি বললাম, 'এখন নাও এই দশ টাকার নোটটা ধর। দোকানের যে ছেলেগুলো তোমাকে মেরেছে তাদের একজনকে ডেকে টাকাটা দাও। বল, এই নাও তোমাদের জন্য টিপস। হাতছানি দিয়ে ডাকো, ও তোমার মুখে ঘুষি মেরেছে না? টাকাটা ওকেই দাও। দিয়ে বল, তোমরা চা খেয়ো। তারপর চল।'

আমার ডাকে ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে রোয়াকের ওপর উঠে বসল ভিখিরি মানুষ। আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'সাগর স্যার, ঘুম হল?'

প্রথমটায় খানিকটা থতমত খেলেও নিজেকে সামলে নিল মানুষটা। ঘাড় নাড়ল। আমি পাশে ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংরার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'যান ভাই, সাগরবাবুকে বড়মামার কাছে নিয়ে যান। আর পারলে আজই ভোটে দাঁড়ানোর বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলুন।'

ট্যাংরা বলল, 'আর আপনি, আপনি যাবেন না।'

আমি রোয়াক থেকে রাস্তায় নেমে হেসে বললাম, 'বিনি পয়সায় আর কত করব? সাগর স্যারকে এনে দেওয়ার কথা ছিল এনে দিলাম। এবার আপনাদের কাজ। চিন্তা করবেন না। বড়মামাকে বলবেন, মঙ্গলাটিঙ্ক।'

BanglaBook.org

ট্যাংরা থমকে গিয়ে বলল, 'কী বললেন? কী টং টং!'

আমি আবার হেসে বললাম, 'টং টং নয় ট্যাংরা ভাই। মঙ্গলাটঙ্ক। এটা শিবনাথদার শব্দ। মঙ্গলাটঙ্ক মানে হল, এই মানুষটি মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি হলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হবে। যান সাগর স্যারকে নিয়ে ভিতরে যান।'

ক্লান্ত লাগছে। খুব ক্লান্ত লাগছে। ইচ্ছে করছে, তমাল, মন্মথ, শিবনাথদা, বড়মামাদের ভুলে যাই। ভুলে টানা একটা দিন ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু ভুলে থাকা গেল না। মেঘলা ফোন করে অদ্ভুত একটা খবর দিল। অদ্ভুত আর মজার।

BanglaBook.org

একুশ

শেষ মুহূর্তে মেয়েদের বিয়ে কেন ভাঙে?

এই বিষয়ে কি কোনো বই আছে? নিশ্চয় নেই। থাকতেই পারত। আজকাল কত বিষয়ে তো বই বেরোয়! কেমন করে ভালবাসবেন? কেমন করে ঘৃণা করবেন? কেমন করে সন্তান মানুষ করবেন? সন্তান মানুষ করবেন সাবজেক্টটা খুব দরকারি। আমার মাঝেমধ্যে মনে হয়, ইস এই ধরনের বই যদি আমাদের মনীষীদের বাবা-মায়েরা হাতে পেতেন তাহলে ভাল হত। মনীষীরা আরো ভাল মনীষী হতে পারতেন। যাইহোক, এই ধরনের বই লেখা হলে মেয়েদের বিয়ে ভাঙা নিয়েও বই বের হতে পারত। শেষ মুহূর্তে বিয়ে ভাঙে নানা কারণে। মেয়ের বাবা হয়তো, খোঁজ নিয়ে জানল, মেয়ের হবু শ্বশুরবাড়ির নিয়ম, রবিবার গাড়ি বেরোবে না। গোটা সপ্তাহ তার খাটাখাটনি গেছে, রবিবার তার বিশ্রাম। গ্যারেজে শুয়ে সে ঘুমোবে। তার হাজার দরকার হলেও বেরোবে না। মেয়ের বাবা বুঝতে পারলেন, এর অর্থ কী? এর অর্থ একটাই। পুত্রবধূ রবিবার বাপের বাড়ি যেতে পারবে না। তারপরেও যদি যেতে হয় তাকে যেতে হবে বাসে বা ট্যাক্সিতে। মেয়ের বাবা আরো খোঁজ নিয়ে জানলেন, তাঁর হবু জামাই যতই রোজগারপাতি করুক, আসলে সে একজন ল্যাদাভ্যাদা ছেলে। পিতার আদেশই তার কাছে শেষ কথা। এরপর মেয়ের বাবা বিয়ে ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে? এছাড়াও শুনেছি, বিয়ে ভাঙার কমন ব্যাপার হল, ভাংচি। মেয়ের নামে, ছেলের নামে লাগানি ভাগানি। মেয়ের প্রেম ছিল, চুরির দায়ে ছেলের আগের চাকরি চলে গিয়েছিল—এইসব। মোদ্দাকথা হল, বিয়ে ভাঙার হরেক কারণ। কিন্তু কারণ কি কখনো রিকশা হতে পারে?

BanglaBook.org

হয়েছে। মেঘলার বিয়ে রিকশার কারণে ভাঙতে চলেছে। সে আমাকে ফোন করেছিল।

‘সাগরদা, কেমন আছেন?’

আমি বললাম, ‘ভাল আছি। তুমি কেমন আছ মেঘলা?’

‘খুব ভাল আছি। দারুণ ভাল।’

‘তোমার বিদেশে যাবার কী হল?’

মেঘলা হেসে বলল, ‘শিগ্‌গিরই যাব। গোছগাছ চলছে। এর মধ্যে একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেছে সাগরদা।’

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, ‘মজা! কী মজা? স্বপ্নযন্ত্র বানানো হয়ে গেছে?’

মেঘলা এবার খিলখিল আওয়াজ করে হেসে ফেলল। বলল, ‘না না, অন্য মজা। সেদিন অর্ণবের এক মাসি আমাকে দেখে ফেলেছে হি হি।’

আমার কাছে হেঁয়ালির মতো শোনাল। অর্ণব কে? তার মাসিই বা কে? অর্ণবের মাসি দেখে ফেললে হাসির কী হয়েছে? বললাম, ‘আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না মেঘলা।’

মেঘলা এবার দম নিয়ে বলল, ‘অর্ণব হল সেই রাজপুত্র যার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কলেজে পড়ায়। আমার বাবা-মায়ের খুব ইচ্ছে, বিদেশে যাবার আগে অর্ণবের সঙ্গে আমার বিয়েটা মোটামুটি ফাইনাল হয়ে যাক।’

মেঘলার বিয়ে! দারুণ খবর। খুব হইচই হবে একটা। আমি উচ্ছ্বসিত গলায় বললাম, ‘কনগ্র্যাচুলেশন। অভিনন্দন মেঘলা। তোমার বিয়ের দিন আমি হব হোলডে নিমন্ত্রিত। প্রচুর খাটাখাটনি করব। এখনই বলে রাখছি, পরিবেশনের ব্যাপারটা আমি কিন্তু কারো হাতে ছাড়ব না।’

মেঘলা আবার ‘হি হি’ আওয়াজ করে হেসে উঠল।

‘আপনি কি এখনো স্বপ্ন দেখছেন? বিয়ের আগেই পরিবেশন?’

আমি আনন্দিত গলায় বললাম, ‘না, আগে থেকে বলে রাখলাম। পরে বলিনি বলতে পারবে না।’

মেঘলা বলল, ‘চুপ করে আগে মজার কথাটা তো শুনবেন।

BanglaBook.org

আপনার কি মনে আছে সেদিন গলিতে যখন রিকশা টানছিলাম তখন মাঝবয়সি একজন মহিলা আমাকে দেখে থমকে গিয়েছিলেন? মনে পড়ছে? তারপর প্রায় ছুটে পালালেন, মনে পড়েছে?'

আমি একটু ভাবতেই মনে করতে পারলাম। যতদূর মনে পড়ছে, মহিলার কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ ছিল। বললাম, 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে।'

মেঘলা বলল, 'ওই মহিলা অর্ণবের এক দূর সম্পর্কের মাসি হন। আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। তিনি আমার ফটো দেখেছেন। বিয়ের জন্য যেমন হবু শ্বশুরবাড়ির লোকজন ফটো দেখে। কিন্তু তাতেই আমাকে চিনতে পেরেছেন। বুঝুন কাণ্ড! বাড়ির হবু বউ কলকাতার গলি দিয়ে রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে তো ভদ্রমহিলার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অবস্থা। হি হি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি জানলে কী করে?'

'অর্ণববাবু বলেছেন।'

আমি বললাম, 'অর্ণবকে কি তুমি আগে থেকে চিনতে? প্রেম?'

মেঘলা বলল, 'না না প্রেম নয়। আমার প্রেম করবার সময় কোথায়? স্বপ্ন নিয়ে নাড়াঘাঁটা করি, আমার কি অত ভালবাসার স্বপ্ন দেখবার সময় আছে? বিয়ের কথা মোটামুটি পাকা হয়ে যাবার পর জানাশোনা। দু-একবার মিট করেছি। সেদিন উনি ফোন করে ঘটনা জানালেন। বললেন, ভদ্রলোকের মাসি নাকি আমার ভাবি শাশুড়িকে ফোন করেছেন।'

আমি হেসে বললাম, 'ইন্টারেস্টিং। অর্ণববাবু কী বললেন? একচোট হেসেছেন নিশ্চয়।'

মেঘলা বলল, 'হাসবে কী! গলা গম্ভীর।'

আমি বললাম, 'তাহলে?'

তাহলে কী হাসতে হাসতে ডিটেইলসে বলল মেঘলা। আমি সেই কথোপকথন যথাসম্ভব তুলে ধরছি। বিয়ে ভাঙার ইতিহাসে এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অর্ণব গম্ভীর গলায় : উনি নিশ্চয় ভুল কাউকে দেখেছেন মেঘলা।

মেঘলা হাসি হাসি গলায় না, উনি ঠিকই দেখেছেন। সেদিন আমি সত্যি রিকশা টানছিলাম।

অর্ণব অবাক হওয়া গলায় সত্যি দেখেছেন! তুমি কী বললে মেঘলা? তুমি রিকশা টানছিলে?

মেঘলা : চমৎকার অভিজ্ঞতা।

অর্ণব থমকে গিয়ে বলল : তুমি একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী। আজ বাদে কাল তুমি গবেষণার জন্য বিদেশে যাবে, তুমি বলছ চমৎকার জিনিস!

মেঘলা হেসে : রিকশা চালানোর জন্য বোকা হতে হয় নাকি? শুধু চমৎকার নয়, শেখবার মতো বিষয়। ভাগ্যিস সেদিন সুযোগ হল। দেখুন অর্ণববাবু, বিদেশে গিয়ে নানা বিষয় শিখতে পারব। গাড়ি চালানো তো শিখবই। আমার খুব ইচ্ছে প্লেন চালানো শিখব। কিন্তু রিকশা তো পারব না। একমাত্র চীনে গেলে হয়তো হতে পারে। এখানে সুযোগ হয়ে গেল।

অর্ণব বিড়বিড় করে : তুমি...আপনি কী বলছেন আপনি জানেন?'

মেঘলা ওমা জানব না কেন? খুব জানি। আপনি কি জানেন রিকশা টানবার জন্য নির্দিষ্ট ফর্মুলা আছে? হাত, পা, কাঁধ সেই ফর্মুলা মেনে চলে। হেঁচকা টানা আর ছেড়ে টানার মধ্যে ছন্দ রক্ষা করতে হয়।

অর্ণব প্রায় আপনমনে : ক-দিন পরেই বিয়ে...।

মেঘলা অবাক হয়ে : তো কী? ক-দিন পরে বিয়ে বলে কি এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া যায়?

অর্ণব : আপনি কি বুঝতে পারছেন না বিষয়টা নিয়ে আমাদের বাড়ির লোকজনের কী অবস্থা? বুঝতে পারছেন?

মেঘলা হেসে প্রথমে পারছিলাম না, আপনি যখন থেকে তুমির বদলে আমাকে আপনি করে বলতে শুরু করেছেন তখন থেকে পারছি। দেখুন অর্ণববাবু, আপনার মাসি যদি আমাকে কলকাতার রাস্তায় খুব দামি একটা গাড়ি চালাতে দেখতেন, আর সেটা যদি আপনার বাড়িতে বলতেন, তাহলে আপনার পরিবারে আনন্দের বান ডাকত। আমার মনে হয়, আপনি আমাকে এতক্ষণে কোথাও একসঙ্গে বসে লাঞ্চ করার প্রস্তাব দিতেন। দিতেন কিনা? সেখানে আপনি আমার পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে আলোচনা করতেন।

অর্ণব গম্ভীর গলায় সেটাই কি স্বাভাবিক নয় মেঘলাদেবী? আমি একজন শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছিলাম, কোনো মহিলা রিকশাচালককে তো নয়। আমার বাবা-মা আপনাকে পছন্দ করেছিলেন...।

মেঘলা শান্ত ভাবে পছন্দ অপছন্দ রিলেটিভ বিষয়। আপেক্ষিক। আমার যা পছন্দ আপনার তা অপছন্দ হতেই পারে। আমার যেন লেখাপড়াও পছন্দ, আবার রিকশা চালানোও খুব পছন্দ হয়েছে।

অর্ণব কঠিন গলায় আশাকরি ভবিষ্যতে আপনি এই ধরনের পছন্দ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন।

মেঘলা হেসে : না, রাখব না। আমার খুব ইচ্ছে বাইরে গবেষণা করতে চলে যাবার আগে আপনার ভিরমি খাওয়া মাসিকে রিকশা চালিয়ে কোথাও নিয়ে যাওয়া এবং তাঁর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া করা।

অর্ণব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ধন্যবাদ মেঘলাদেবী। সম্ভবত এটাই আপনাকে আমার শেষ টেলিফোন।

মেঘলা : টা টা। ভাল থাকবেন।

কথোপকথন শেষ হবার পর মেঘলা বলল, 'সাগরদা, আমি কি ভুল করেছি?'

আমি বললাম, 'ভুল না ঠিক বলতে পারব না মেঘলা। তবে আজ না হয় কাল তো তোমার বিয়ে হবে, খুব ভাল বিয়ে হবে, তখন তোমাকে একটা উপহার দেব। আমি কোনো বিয়েতে উপহার দিই না। কিন্তু তোমার বেলায় নিয়ম ভাঙব। তোমাকে উপহার দেব একটা রিকশা। হাতে টানা রিকশা।'

মেঘলা গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল, 'এইজন্য আপনাকে এত পছন্দ করি সাগরদা। আমার বিয়ে যদি বিদেশে হয়?'

'হলে হবে। তুমি আমাকে বিয়ের খবরটা জানিয়ো। ব্যস তারপর দায়িত্ব আমার।'

মেঘলা ফোন ছাড়ার পর মনটা একটু ভারী হয়ে গেল। যতই হোক একটা মেয়ের বিয়ে বলে কথা। তবে মেঘলার মতো সুন্দরী মেয়ে নিশ্চয় জীবনে ওই গাধা অর্ণবের থেকে একদিন অনেক সুন্দর

BanglaBook.org

বর খুঁজে পাবে। বিকেলের পর বাগবাজারের দিকে রওনা হলাম। নন্দর ঝুপড়ির একটা খবর নেওয়া দরকার। শুধু তার মোবাইল ফোন ব্যবহার করব, দায়িত্ব পালন করব না, এটা ঠিক নয়। নন্দ তো আমাকে বলে গিয়েছিল যেন গঙ্গার পাড়ে গিয়ে মাঝেমধ্যে তার ডুপলেক্স ঝুপড়ির খবর নিই।

গঙ্গার পাড়ে পৌঁছে গিয়ে দেখি তুলকালাম কাণ্ড। ঝুপড়িবাসীরা উত্তেজিত। আমাকে দেখে হইহই করে উঠল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আরে! কী হয়েছে।'

গঙ্গাপদ ঝুপড়িবাসীদের লিডার। তাকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। নেশাভাঙের মধ্যে থাকে বটে কিন্তু মানুষ খারাপ নয়। মাঝেমধ্যে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়ানো লরি-টরি থেকে জিনিসপত্র পাচার করে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ক-দিন জেল খেটে ফিরে আসে। আবার চুরি শুরু করে।

গঙ্গাপদ বলল, 'ক-দিন ধরে আমাদের ঝুপড়িতে না আছে আলো না আছে জল। আমরা দিনের পর দিন বলছি, কোনো লাভ হয়নি। এখন বলছে গঙ্গার পাড় থেকে আমাদের ঘরদোর সব তুলে দেবে।'

আমি বললাম, 'তা তো দেবেই। তোমরা জোর করে সরকারের জায়গায় ঘর বেঁধেছ, ভেঙে দেবে না?'

গঙ্গাপদ বলল, 'আমরা যাব কোথায়?'

আমি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললাম, 'আবার একটা কোথাও গিয়ে জোর করে ঘর বাঁধবে। মনে রাখবে এখন হল জোরের যুগ। যেমন জোর করে ভাঙা হবে, তেমন আবার জোর করে গড়া হবে।'

গঙ্গাপদ বলল, 'আমরা সরকারের সঙ্গে জোর করে পারব কেন?'

আমি বললাম, 'পারবে না তো।'

'তাহলে? তাহলে এত হুজ্জুতি করে লাভ কী?'

আমি হেসে গঙ্গাপদর কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম, 'বাছা, গরিব হয়ে জন্মেছ, হুজ্জুতি করেই বাঁচতে হবে। অত লাভ লোকসান দেখলে কি চলবে? যাইহোক, তোমাদের কি উঠে যাবার নোটিশ দিয়েছে?'

গঙ্গাপদর সঙ্গে ভিড় করে যারা আমার কথা শুনছিল, তারা বলল, 'না এখনো দেয়নি। তবে কানাঘুষোয় শুনেছি।'

আমি বললাম, 'তাহলে আর দেরি কোরো না, শহরের পথে তোমরা মিছিল কর। পারলে আজই কর।'

ভিড় করা গরিব মানুষের দল বলল, 'মিছিল!'

আমি আবার হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, মিছিল। এখন মোমবাতি মিছিল খুব চলছে। বড়লোকেরা চান্স পেলেই গরিবদের জন্য মোমবাতি হাতে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। আজ সরাসরি গরিব মানুষরাই মোমবাতি মিছিল করবে। মাঝখানে নো বড়লোক। কলকাতা শহর হাঁ হয়ে দেখবে। করবে? টিভিতে ছবি উঠবে। বলা যায় না তোমাদের দাবি মেনে নেওয়াও হতে পারে।'

ভিড় থেকে একজন বলে উঠল, 'খুব ভাল হবে। কিন্তু সাগরভাই, মোমবাতি পাব কোথা থেকে? আমরা তো আর কিনতে পারব না।'

আমি বললাম, 'ছি ছি। তোমরা মোমবাতি কেনবার পয়সা কোথা থেকে পাবে? আমি একটা দোকানের নাম বলে দিচ্ছি। আগুন জ্বালো। ওরা মিছিলের জন্য মোমবাতি রাখে। দোকানের মালকিন চারু দত্ত। তোমরা সবাই দল বেঁধে গিয়ে তার কাছে বিনি পয়সায় মোমবাতি চাও। উনি রাজি হবেন না, তখন দোকানে ঢুকে জোর করে নিয়ে নেবে। যত মোমবাতি আছে সব নেবে। আমি টিভির লোকদের খবর দিয়ে রাখছি। ওরা মোমবাতি লুঠপাটের ছবি তুলবে। ভিখিরিরা মিছিলের জন্য মোমবাতি লুঠ করলে চারু দত্ত পুলিশ ডাকতে পারবেন না। সবাই ছ্যা ছ্যা করবে। যাও দেরি কোরো না।'

দাঁড়িয়ে থাকা একটা টেম্পোতে ঠাসাঠাসি করে উঠে ঝুপড়িবাসী হইহই করে রওনা দিল। প্রবল উৎসাহ। আমি সরে এসে পকেট থেকে নন্দর মোবাইল বের করলাম। দুটো ফোন করব। একটা কেমিস্ট্রি সুন্দরী ঋতিশাকে। তাকে জানাতে হবে, তার শাশুড়ি ঠাকরুনের সাগর শাস্তি একটু পরেই শুরু হবে। সে যেন দোকান থেকে কেটে পড়ে। আর দুনম্বর ফোন করব টিভি অফিসগুলোতে।

আর নয়। অনেক হয়েছে। এবার আমার রেস্ট। লম্বা ঘুম।

BanglaBook.org

তা-ই করলাম। বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে ধপাস করে ভাঙা তক্তাপোশে দেহ রাখলাম। ঘুম শুধু ভাল হল না, বাড়াবাড়ি রকম ভাল হল। এমন একটা স্বপ্ন দেখলাম, যা স্বপ্ন বিশারদ মেঘলাও কল্পনা করতে পারবে না। বিদেশে যাবার সময় ছেলেমেয়েদের উপহার দিতে হয়। আমি ঠিক করলাম, এই স্বপ্নটা লিখে মেঘলাকে উপহার দেব। ঘুম ভাঙা চোখে তক্তাপোশে উপুড় হয়ে স্বপ্ন বৃত্তান্ত লিখতে বসলাম—

BanglaBook.org

বাইশ

মেঘলা, একটা দারুণ স্বপ্নের কথা তোমাকে জানাই। আমার খুব ইচ্ছে, স্বপ্নযন্ত্র তৈরি হলে এই স্বপ্নটাকে তুমি রেকর্ড করিয়ে রাখবে। মাঝেমধ্যে রিওয়াইন্ড করে দেখব। দোলের দিনের স্বপ্ন। স্বপ্ন যেমন যেমন দেখেছি, তেমন তেমন বলছি—

কোথাও একটা কোকিল ডাকছে।

কোকিলের গলা সামান্য ভাঙা। ভাঙা হোক। দোলের দিন সকালে কলকাতা শহরে কোকিল ডাকছে এই যথেষ্ট। গলা সামান্য ভাঙা হলে দোষের কিছুই নেই। ভাঙা গলায় কোকিল ডেকে যেন কলকাতাবাসীকে বলছে, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

শশাঙ্ক কবিরাজ লেন ধরে আমরা দুজনে হনহন করে হাঁটছি। আমি আর কবিগুরু। আমি হালকা টেনশনে আছি। খানিক আগে কবিগুরু চপ্পলের একটা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। আমি পড়েছিলাম অথৈ জলে। এই সাতসকালে চপ্পল সারানোর লোক পাব কোথায়? হাতিবাগানের মোড়ে? কলেজস্ট্রিটে? বসলেও কিছু করার নেই। কবিগুরুকে ওসব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। লোকজন চিনে ফেলে ভিড় করবে। ভিড় সামলানো যাবে, কিন্তু কেউ যদি নকল ভেবে কবির দাড়ি, জোব্বা ধরে টানাটানি করে? কেলেঙ্কারি হবে। দোলের দিন অনেকে পরচুলা, মুখোশ পরে ভূত পেত্নি সাজে। কেউ কেউ হয়তো ভেবে বসল, এই লোকও সেরকম। ভূত পেত্নির বদলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজেছে। অবশ্য এটাই সব নয়। বড়রাস্তায় কবিগুরুকে না নিয়ে যাওয়ার পিছনে অন্য কারণও আছে। সেই কারণ রবীন্দ্রসংগীত। রাস্তায় মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালে আজকাল রবীন্দ্র-সংগীত বাজে। ভারি সুন্দর! মনে হয়, সারাজীবন সিগন্যালে আটকে থাকি আর পেট পুরে রবীন্দ্রসংগীত খাই। কিন্তু স্বয়ং গুরুদেব নিতে

Banglabook.org

পারছেন না। খানিক আগে তিনি আমাকে জানিয়েছেন, ইদানীং রবীন্দ্রসংগীত শুনলেই নাকি তাঁর অ্যালার্জির মতো হয়। গায়ে লাল লাল গুটি বেরোয়। কবি নিজেই চিকিৎসা করছেন। দিনে দুপুরিয়া করে সালফার টু হান্ড্রেড। খুব একটা কাজ দেয় না। এই কারণেই বড় রাস্তা বাদ দিয়ে গলিগালা দিয়ে তাঁকে নিয়ে চলেছি।

একবার ছেঁড়া চপ্পল ম্যানেজ করেছি। টেনশন হচ্ছে যদি আবার ছেঁড়ে বিপদে পড়ব। গুরুদেবকে কি আমি একটু আস্তে হাঁটতে বলব? সাহস হচ্ছে না। এতদিনের অভ্যেস বলে কথা।

'স্যার, রিকশা ডাকি?'

কবিগুরু মিহি গলায় বললেন, 'কেন সাগর? পথ কি অনেক দূর?'

'না, স্যার। প্রায় এসে গেছি। রোদে আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বলে রিকশার কথা বলছি।'

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, 'না, কষ্ট হচ্ছে না। আমি এর থেকে অনেক কড়া রোদে হেঁটে অভ্যস্ত। তাছাড়া বসন্ত সকালের রোদ শরীরের জন্য ভাল।' এইটুকু বলে থামলেন গুরুদেব। ফের বললেন, 'সাগর, তুমি যা যা বললে সব সেরকমই তো?'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁ স্যার সেরকমই। আপনাকে মিথ্যে বলার মতো স্পর্ধা আমার নেই। ওরা স্যার প্রতিবছরই যেতে বলে, আমার যাওয়া হয় না। বারদুয়েক গিয়েছি। দুবারই এক ঘটনা দেখেছি।'

এই গলিতে লোকজনের যাতায়াত নেই এমন নয়। একটু পর থেকেই ছেলেপিলেরা রাস্তায় রং খেলা শুরু করে দেবে। সে এক উন্মত্তের মতো দোল খেলা! খেলার অন্যতম ইন্টারেস্টিং অংশ থাকবে ছাদ থেকে পথচারীর মাথায় বালতি বালতি জল ঢালা। এই কারণেই মানুষ বাড়ি ফেরার জন্য তাড়াহুড়ো করে। কে মাথায় জলের গুঁতো খাবে?

গুরুদেব হাঁটছেন তার চেনা ভঙ্গিতে। মাথা নামানো, দুটো হাত পিছনে। চিন্তামগ্ন, ভাবগম্ভীর, প্রশান্ত। যেমন আমরা ছবিতে দেখি। এই অবস্থাতেই তিনি ডাবের খোলা, আনাজপাতির খোসা, প্লাস্টিকে ভরা কাল রাতের এঁটো কাঁটা, মোড়া কাগজের ভেতর থেকে টুকি দেওয়া শিশুর পটি, নর্দমার খোলা মুখ, হাইড্রেনের কালো জল পেরিয়ে যাচ্ছেন অনায়াসে। আমি খানিকটা লজ্জিতই হচ্ছি। লজ্জা

BanglaBook.org

পেয়ে লাভ নেই। কী করা যাবে? কর্পোরেশন তো আর জানত না আজ এই পথ দিয়ে কবিগুরু হাঁটবেন। ওদের কী দোষ? কোনো দোষ নেই। জানলে নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে রাখত। পথচারীদের কেউ কেউ কবিগুরুর দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না। ভাবটা এমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রায়ই হাতিবাগান বাজারে দেখা হয়। ভদ্রলোক ঝিঙের মাথা ভেঙে, পুঁইশাকের পাতা ছিঁড়ে, কুমড়োর বিচি পরীক্ষা করে বাজার করেন। কেবল সন্টাইদাকে দেখলাম রিঅ্যাক্ট করতে। তবে বাড়াবাড়ি কিছু নয়। উলটো দিক থেকে তড়বড়িয়ে আসছিল। হাতে শালপাতার ছোট চাঙারি। নির্ঘাত কচুরি জিলিপি। আমি জানি, ডানদিকে গেলে একটা ছোট দোকান আছে। ওরা সকালের দিকটায় শালপাতার চাঙারিতে কচুরি, জিলিপি বিক্রি করে। পুরোনো কলকাতার ফ্লেভার। তবে ফ্লেভারের জন্য দাম বেশি পড়ে। সে হোক। ফ্লেভারের কাছে দাম কোনো বড় বিষয় নয়। কবিগুরুর জন্য নিয়ে আসব? মন্দ হয় না। আমি চট করে গিয়ে কিনে আনব, তারপর কোনো একটা রকে বসে, দুজনে মিলে...চিন্তার মাঝখানেই দেখলাম সন্টাইদা গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে হাত তুলল। বাঁহাত। বাঁহাত ছাড়া উপায় কী? ডানে তো কচুরি ধরা। হাত তোলা অবস্থাতেই গলা উঁচু করে সন্টাইদা যেন হাঁক পাড়ল।

'কী সব ভাল তো? লেখাপত্তর ঠিকঠাক চলছে?'

কবিগুরু সম্ভবত ধাক্কা মতো খেলেন। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। তাকানোরই কথা। তিনি সারাজীবন বহু সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। জটিল কুটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অজস্র। এমনকী মৃত্যুর পরেও নানা ধরনের অপ্রকাশিত, অগ্রন্থিত, অপঠিত, অগৃহীত সাক্ষাৎকার আবিষ্কার হচ্ছে। সেখানেও বহু প্যাঁচাল ঘোরাল জোরাল প্রশ্ন। কিন্তু 'লেখাপত্তর ঠিকমতো চলছে কিনা'—এমন প্রশ্ন কেউ কখনো তাঁকে করে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। সন্টাইদা অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা করল না। কচুরি জিলিপির চাঙারি হাতে একই স্পিডে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'ভেরি গুড ভাই। চালিয়ে যান।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'ভাই'! কী ভয়ংকর! লজ্জায় মুখ ফেরালাম।

BanglaBook.org

কবিগুরু সম্ভবত আমার লজ্জা আঁচ করতে পারলেন। প্রসঙ্গ পালটাতে মুখ তুলে, মাথা নেড়ে বললেন, 'সাগর, ওখানে রং খেলার সময় কি আবির থাকে? ফাগ?'

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'গোড়ায় একটু আধটু থাকে স্যার। তবে ও কিছু নয়। ওসব জিনিস কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠোঙা ধরে ফেলে দেওয়া হয়। শ্যামলদা, শ্যামলদার স্ত্রী কাজল বউদি, ওদের মেয়ে বিনি, বিনির গাদাখানেক বন্ধু, পাশের বাড়ির মেয়ে শ্রীতমা, শ্রীতমার ভাই গোবেল, গোবেলের ছোটমামা, ছোটমামার অফিসের কলিগরা কেউই দীর্ঘক্ষণ আবিরে বিশ্বাস করে না।'

গুরুদেব খুশি গলায় বিড়বিড় করে বললেন, 'চমৎকার! অতি চমৎকার! দ্রুত পা চালাও। পৌঁছোতে দেরি না হয়ে যায়।'

কবিগুরু আবার হনহনিয়ে হাঁটছেন। এই ফাঁকে আমি ছেঁড়া চপ্পল ম্যানেজের গল্পটা শুনিয়ে দিই।

কবির চপ্পল ম্যানেজ করলাম সেফটিপিনে। পুরুষমানুষের কাছে সেফটিপিন থাকে না। আমার কাছে ছিল। খালি মানিব্যাগের কোনায় ঘাপটি মেরে ছিল। নধর সাইজের এই সেফটিপিনের আসল মালিক আমি নই, মালকিন রেবা। খুব সম্ভবত আমায় ছেঁড়া জামা বা ব্যাগ সামলাতে দিয়েছিল। রেবার কোনো কিছুই আমি ফেলি না। সেফটিপিনও ফেলিনি। রেবা যে আমাকে শুধু সেফটিপিন উপহার দেয় এমন নয়, সে আমাকে মনফোনও উপহার দিয়েছে। সেই ফোনে মনে মনে কথা বলা যায়। কিছুদিন আগে লামডিং থেকে সে আমাকে একটা 'মন ক্যানভাস' পাঠিয়েছে। মনফোনের মতো। মন ক্যানভাসে যখন খুশি ছবি আঁকা যায়। এই যে হাঁটতে হাঁটতে কবিগুরুর সঙ্গে যাচ্ছি, ইচ্ছে করলে এখনই আমি ফট করে ছবি এঁকে ফেলতে পারি। হয়তো ছবির বিষয় হবে, কবিগুরু কলকাতার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে 'ব্রিগেড চলো'র পোস্টার দেখছেন। কিন্তু আমি এখন মন ক্যানভাসে ছবি আঁকব না। ক্যানভাস এখনো উদ্বোধন হয়নি। আমার একটা অন্য প্ল্যান মাথায় এসেছে। দেখা যাক। রেবা একজন রবীন্দ্র খ্যাপা মেয়ে। 'রবীন্দ্র পাগল'রা যখন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছোয় তখন তারা হয় 'রবীন্দ্র খ্যাপা'। এরা রবীন্দ্র পাগলের তিন কাঠি ওপর

দিয়ে যায়। আমি একজনকে জানি যিনি বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে সবসময় 'ঠাকুর প্রণাম' করেন। রবি ঠাকুর। বৃহস্পতিবার যেমন বাঙালির লক্ষ্মীবার, উনি তেমন বুধবারকে করেছেন 'রবীন্দ্রবার'। সকালে ফটোর সামনে বাবু হয়ে বসে গীতাঞ্জলি পাঠ করেন। ফুল, ধূপ এবং ছোট্ট থালায় গুজিয়া দেন। রেবা পুরোটা না হলেও কাছাকাছি খ্যাপা। আমি যখন তাকে বলব, 'জানো রেবা তোমার সেফটিপিন পেয়ে কবিগুরুর খুব উপকার হয়েছে। তিনি একটা বড় বিপদের হাত থেকে বেঁচেছেন। নইলে তাঁকে খালি পায়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হত।'— রেবা কি সেকথা বিশ্বাস করবে? মনে হয় না করবে। রেবা আমাকে ভালবাসে। কথা বিশ্বাস করে না। তা-ই যতবারই তাকে আমি আমার ভালবাসার কথা বলতে যাই সে বিশ্বাস করে না।

কবি বললেন, 'ওরা কীসে বিশ্বাস করে সাগর?'

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। গুরুদেবের কথা খেয়াল করিনি। কাঁচুমাচু মুখে বললাম, 'কাদের কথা বলছেন স্যার?'

'ওই যে তোমার ওই শ্যামলদারা। আবিরে যখন ওদের বিশ্বাস নেই, ওরা কি তবে পিচকারি দিয়ে রং খেলে? বৃন্দাবনের মতো?'

আমি হেসে বললাম, 'না না স্যার, শান্তিনিকেতন, বৃন্দাবন কিছুই নয় স্যার।'

গুরুদেব অবাক গলায় বললেন, 'তবে!'

আমি বললাম, 'এ একেবারে আলাদা স্টাইল। ওরা বাঁদুরে রং আর মাথায় রং গোলা জলের বালতি উপুড় করায় বিশ্বাস করে।'

কবি উদ্ভাসিত মুখে বললেন, 'অপূর্ব! অপূর্ব! আচ্ছা, বাঁদুরে রং ব্যাপারটা কী সাগর?'

আমি লজ্জা লজ্জা মুখে বললাম, 'একরকমের রং স্যার, মুখে মাখালে বাঁদরের মতো দেখায়। মনে হয় মুখ পোড়া হনুমান।'

কবিগুরু মুগ্ধ গলায় বললেন, 'তা-ই নাকি! কই আমি তো এমন রঙের কথা জানতাম না! খুবই মজার বিষয়।'

গুরুদেবের মুগ্ধতায় আমি উল্লসিত হলাম।

'অবশ্যই মজার বিষয় স্যার। পূর্বপুরুষ সাজার মজা। হনুমান

BanglaBook.org

হয়ে গেলে স্যার আর একটা সুবিধে আছে। প্রাণের খুশিতে লাফানো ঝাঁপানো যায়। দোল তো স্যার প্রাণের খুশির ফেস্টিভ্যাল, তা-ই না?’

গুরুদেবের চোখ এমনিতেই উজ্জ্বল। এখন যেন আরো উজ্জ্বল হল। তিনি চাপা গলায় বললেন, ‘অবশ্যই। অবশ্যই প্রাণের খুশির উৎসব।’

আমি বললাম, ‘এর সঙ্গে আছে স্যার বালতি উপুড়। সেটা ভারি মজার। রং গোলা জলের বালতি মাথার ওপর উপুড় করে ধরতে হয়। মনে হয়। মাথায় রঙের ঝরনা পড়ছে! দেখতে কী যে ভাল লাগে! অনেক সময় বালতি টুপির মতো করে মাথায় পরিয়েও দেওয়া হয়। যাকে পরানো হয় সে খাঁউমাউ করে বটে কিন্তু মজা পায় খুবই। বালতি খুলতে চায় না।’

কবিগুরু অস্ফুটে বললেন, ‘বাহ! দোলের কত আনন্দ আমার জানা নেই!’

মেঘলা, এবার শুরুর ঘটনা বলি।

আমরা যাচ্ছি শ্যামলদার বাড়ি। ফড়িয়াপুকুর। শ্যামলদা একজন ফুর্তিবাজ মানুষ। বাপ ঠাকুর্দা তিন তিনটে ঘুড়ির দোকান দিয়ে গেছে। লাটা মাঞ্জা, টানা মাঞ্জা, ছাড়া মাঞ্জা—তিন দোকানে তিন মাঞ্জার নামডাক। একই কাস্টমারকে ঘুরে ফিরে তিন দোকানে যেতে হয়। ফলে বিজনেস রমরমা। তবে টাকাপয়সা, লাভ লোকসানই সব কথা নয়, শ্যামলদার মনটা আকাশে ওড়া ঘুড়ির মতো। সেই শ্যামলদার বাড়ির দুকূল ছাপানো ছাদে প্রতিবছর দোলের সময় বিরাট হইচইয়ের আয়োজন হয়। বাঁধাধরা হইচই নয়। বাঁধভাঙা হইচই। রং খেলার সঙ্গে তুমুল নাচগান, খাওয়াদাওয়া। নাচে গানে নো রেস্ট্রিকশন। বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি সব অ্যালাউ। গিটার, হারমোনিয়াম, ধামসা, মাদল, টিনের ক্যানেস্তারা সব অ্যালাউ। যে যা পারে এবং যে যা পারে না। শ্যামলদা বলে, ‘আমি তো দোলের দিন বাড়ির ছাদে স্কুল খুলে বসিনি যে চোখ পাকিয়ে বলব, এটা না ওটা না। শিল্প সংস্কৃতি রুচি জাহিরের জন্য গোটা বছরটাই তো পড়ে আছে বাপু। তবে একটা বেলা হুল্লোড়ে বাধা কেন? অসভ্যতা ছাড়া আমার ছাদে কোনো কিছুতে মানা নেই।’ শ্যামলদার বউ কাজল বউদি, ওদের ফার্স্ট ইয়ারে

BanglaBook.org

পড়া মেয়ে বিনি আমাকে প্রতি বছরই নেমন্তন্ন করে। আমি দুবার গেছিও। এবার যাবার তেমন প্ল্যান ছিল না। কিন্তু সকালে একটা কাণ্ড ঘটল মেঘলা। সেই কাণ্ড শুনলে তুমি বিষম খাবে।

রোজকার মতো পচাদার চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে দেখি গুরুদেব। বেঞ্চের এককোনায় বসে কাচের গ্লাসে চা আর এস বিস্কুট খাচ্ছেন! বিস্কুটের প্রতিটা কামড়ে আওয়াজ হচ্ছে কচরমচর, কচরমচর। দোলের দিন সকালবেলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিডন স্ট্রিটে চায়ের দোকানে বসে আওয়াজ করে চা বিস্কুট খাচ্ছেন দেখলে যেকোনো মানুষই ঘাবড়ে যাবে। আমিও গেলাম। তবে অন্য মানুষের সঙ্গে সাগরের তো একটা তফাত থাকবেই। সেই তফাত কল্পনার। অসম্ভবকে সম্ভব ভাববার ক্ষমতা। আমি নিজের পেটে গোপনে চিমটি কাটলাম। মনে মনে বলি, 'ওরে বেটা সাগর, এমন সুযোগ আর পাবি না। জাপটে ধর। দেরি না করে জাপটে ধর।'

বোঝো ঠেলা। রবীন্দ্রনাথকে জাপটে ধরা কি চাট্টিখানি কথা? কীভাবে ধরব? আর যদি বা ধরতে পারি তারপর? তারপর কী করব? মানুষটাকে নিয়ে দোলের দিন আমি কি ট্যাঙস ট্যাঙস করে পথে পথে ঘুরে বেড়াব? না না, সে উচিত হবে না। ছেলেপিলেরা পাজি। জোব্বায় রং ভরা বেলুন ছুঁড়ে মারবে। বারণ করলে শুনবে না। শুনবেই বা কেন? ওদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যা ভবদুলাল পাইনও তা-ই। আচ্ছা যদি আমার এক কামরার বাসাবাড়িতে নিয়ে যাই? গলির মোড়ের ডাল ভাতের হোটেল থেকে দুপুরের খাবার আনাব না হয়। উনি কোন ডাল ভালবাসেন? মুসুর না মুগ? বিউলি নয় তো? সবথেকে ভাল হয় অধ্যাপক প্রাবন্ধিক অভিরাম পুণ্ডরীকাক্ষকে যদি একটা ফোন করি। বিশ্বকবির ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁকে নিয়ে বিবিধ গবেষণা করেছেন। কতরকম যে বই লিখেছেন! হয়তো 'ডাল ও রবীন্দ্রনাথ' নামেও তাঁর কোনো বই আছে।

নাহ, এই পরিকল্পনাও ঠিক হচ্ছে না। খাওয়াদাওয়ার পর কবি যদি হালকা গড়িয়ে নিতে চান বিপদে পড়ব। আমার তক্তাপোশের একটা পায়ায় গোলমাল। নড়বড় করে। নড়বড়ে তক্তাপোশে এত বড় মানুষকে শুতে দেওয়া ঠিক নয়। তবে যা করবার দ্রুত করতে হবে।

BanglaBook.org

হঠাৎ মাথায় বিদ্যুতের ঝলক এল। আচ্ছা, গুরুদেবকে নিয়ে যদি আমি আজ শ্যামলদার বাড়ি যাই? কেমন হবে? উনি কি ওই চ্যাংড়া ম্যাংরা দোলখেলা দেখতে রাজি হবেন? মনে হয় না। ইস, রাজি হলে একটা কাণ্ড হত। বিরাট সারপ্রাইজ। এবার যদি উইথ গুরুদেব ওই ছাদে হাজির হতে পারতাম...। গুরুদেবকে দেখে উত্তেজনায়, আনন্দে শ্যামলদা, কাজল বউদি নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যেত। ভালই হত। গুরুদেব মাথায় জলের ছিটে দিয়ে ওদের জ্ঞান ফেরাতেন। অনশনকারীরা যেমন বড় বড় মানুষের হাতে ফলের রস খেয়ে অনশন ভঙ্গ করে, ঠিক তেমন খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জলের ছিটেতে শ্যামলদাদের অজ্ঞানভঙ্গ হত। বিনি গোটা ঘটনা ভিডিয়োতে ধরে রাখত। একবার অনুরোধ করে দেখব? করি না। ক্ষতি কী? চড় মারবেন? তাতেও লাভ। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র মিউজিয়ম বা নিউটাউনের রবীন্দ্রতীর্থে গিয়ে গাল দেখিয়ে বলল, 'এই সেই গাল। যেখানে বিশ্বকবি...।' টাকাপয়সায় পোষালে সপ্তাহে একদিন রবীন্দ্রনাথের জোব্বা, জুতো, লাঠি, খাতা, কলমের পাশে তার হাতের চড় খাওয়া গাল এক্সিবিটের জন্য ঘণ্টাদুয়েক দাঁড়িয়ে আসব। আমার গায়ে লেখা থাকবে, প্লিজ ডোন্ট টাচ। দয়া করে গালে হাত দেবেন না। আমি দুষ্টুমি করে লিখে দেব—মেয়েরা বাদে।

মনে অসীম সাহস সঞ্চয় করে চায়ের কাপ রেখে কবির সামনে দাঁড়ালাম। অল্প হেসে বললাম, 'স্যার, আজ দোলের দিনে শান্তিনিকেতন ছেড়ে এখানে!'

কবি মুখ তুললেন। আমার চোখে চোখ রেখে হাসলেন সুন্দর করে। হাসলেন। আমি আবার বললাম, 'কোনো সমস্যা?'

এবার ইশারায় পাশে বসতে বললেন। বসেই বুঝতে পারলাম, বড় ভুল করে ফেলেছি। বসবার আগে প্রণাম করা উচিত ছিল। আসলে ফুটপাথের বেঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশে বসতে পারার রোমাঞ্চে মাথা গুলিয়ে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক।

'তোমার নাম কী যুবক?'

'স্যার সাগর।'

'সাগর! চমৎকার নাম। সহজ সরল অথচ গভীর। আজকাল

ছেলেমেয়েদের এমন সব নাম হয় শুনলে আমারই ভিরমি খাবার জোগাড়। শিঞ্জিত, সৌপর্ণ, তৃষ্ণীক, অরিঞ্জয়। বাপরে। ভয় হয় বলার সময় দাঁত না খুলে যায়।'

আমি ক্যাবলা হেঁসে বললাম, 'ধন্যবাদ স্যার।'

'সাগর, কী কর তুমি?'

আমি মাথা চুলকে, লজ্জা লজ্জা ভঙ্গিতে বললাম, 'কিছু করি না স্যার। বেকার। কাজ পেলেও করতে ইচ্ছে করে না। টিউশন এবং ধারবাকিতে জীবিকা নির্বাহ করি। বন্ধুরা অলস বলে গাল দেয়। তবে আমি স্যার লেখালিখি কিছু করি না।'

গুরুদেব আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। কৌতুকভরা গলায় বললেন, 'ইন্টারেস্টিং।'

আমি হাত কচলে বললাম, 'স্যার, একটা ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে প্রণাম করা হয়নি। পা দুটো যদি একটু এগিয়ে দেন প্রণামটা সেরে ফেলি।'

বিশ্বকবি আমার কাঁধে হাত রাখলেন। আমার শরীর শিরশির করে উঠল। বললেন, 'ভুল হয়নি, ঠিক হয়েছে। এই কারণেই তো তোমাকে পাশে বসতে দিলাম। প্রণাম আর রবীন্দ্রসংগীতে হাঁপিয়ে উঠেছি বাবা। আর নিতে পারছি না। এই যে আজ দোলের দিন শান্তিনিকেতন থেকে পালিয়ে এলাম, তার কারণও এটা। একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। একশো বছরের বেশি হয়ে গেল, খোল দ্বার খোল শুনে চলেছি। দ্বার এখনও খুলল না। পাগল পাগল অবস্থা। সেইসঙ্গে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবির ছোঁড়া আর রাঙিয়ে দিয়ে যা, রাঙিয়ে দিয়ে যা, রাঙিয়ে দিয়ে যা...। দমবন্ধের মতো লাগে। দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। মনে হয়, এই গান শেষ হবে না। চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। বাঁধা গতের মতো। বুলি শেখানো তোতাপাখির মতো। একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। অথচ আমি তো এমনটা চাইনি। উৎসবের আনন্দ কি শিকল বেঁধে হয়? দোল শুনলেই এখন ভয় করে।' কবিগুরু একটু থামলেন।

আমি বললাম, 'স্যার জল খাবেন? জল দেব?'

উনি আমার কথার জবাব না দিয়ে আবার শুরু করলেন।

BanglaBook.org

'আজ চুপি চুপি ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে এসেছি। ভেবেছিলাম, এখানে অন্যরকম হবে। কিন্তু কোথায় অন্যরকম। খানিক আগে দেখি, তোমাদের এই রাস্তা দিয়ে একদল ফুটফুটে মেয়ে চলেছে। লাল পাড় হলুদ শাড়ি দিয়ে মায়েরা আচ্ছা করে তাদের পেঁচিয়েছে। বেচারিরা হাঁসফাঁস করছে। মাথায় পলাশ। আসল পলাশ নয় প্লাস্টিকের কিংশুক। খুদে খুদে হাতে ধরিয়েছে বড় বড় থালা। সেই থালায় ঢিবির মাপে আবির। জিগ্যেস করে জানলাম, আজ নাকি তারা নিজের মজায় ছোটাছুটি করে রং খেলতে পারবে না। নাচের তালে তালে আবির ওড়াতে হবে। তালে ভুল হলে মায়েরা কটমট করে তাকাবে। বকাও খাবে। দোলের সময় নাচবে বলে, গত দশ দিন ধরে নাকি মহড়া হয়েছে। কী যন্ত্রণা! এখানেও সেই বসন্ত উৎসব!'

বিষণ্ণ, ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ থামলেন। আমি চাপা গলায় বললাম, 'স্যার, তাহলে আমাকে একটা চান্স দেবেন?'

গুরুদেব অবাক গলায় বললেন, 'চান্স! কী চান্স সাগর?'

আমি বললাম, 'হইচইয়ের দোল খেলা দেখানোর চান্স।'

গুরুদেব আঁতকে উঠলেন, 'এই রে! আবার দোল! আবার খোল দ্বার খোল?'

আমি উত্তেজিত হয়ে বাংলা ইংরেজি গুলিয়ে ফেললাম।

'সেখানে স্যার নো শিকল বাঁধা সংগীত, নো হাত ঘুরিয়ে আবির ছোঁড়া স্যার। সেখানে স্যার ওনলি হুল্লোড় অ্যান্ড হুল্লোড়...। স্যার, প্লিজ স্যার।'

কবিগুরু উঠে দাঁড়ালেন। জোব্বা থেকে বিস্কুটের গুঁড়ো ঝাড়লেন। মৃদু হেসে শান্ত গলায় বললেন, 'বাংলায় বল সাগর। আমি একটু একটু বাংলা জানি। কোথায় নিয়ে যেতে চাও বল!'

সেই শ্যামলদার বাড়িতেই আমরা চলেছি। যত এগোচ্ছি কবিগুরু উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। মোড়ের কাছাকাছি এসে নীচু গলায় বললেন, 'একটা রঙের দোকান পেলে বোলো তো সাগর।'

আমি বললাম, 'রং নেবার মোটে দরকার নেই। ওখানে অনেক রং আছে। বালতি বালতি রং। শ্যামলদা, কাজল বউদির অ্যারেঞ্জমেন্ট মারাত্মক।'

BanglaBook.org

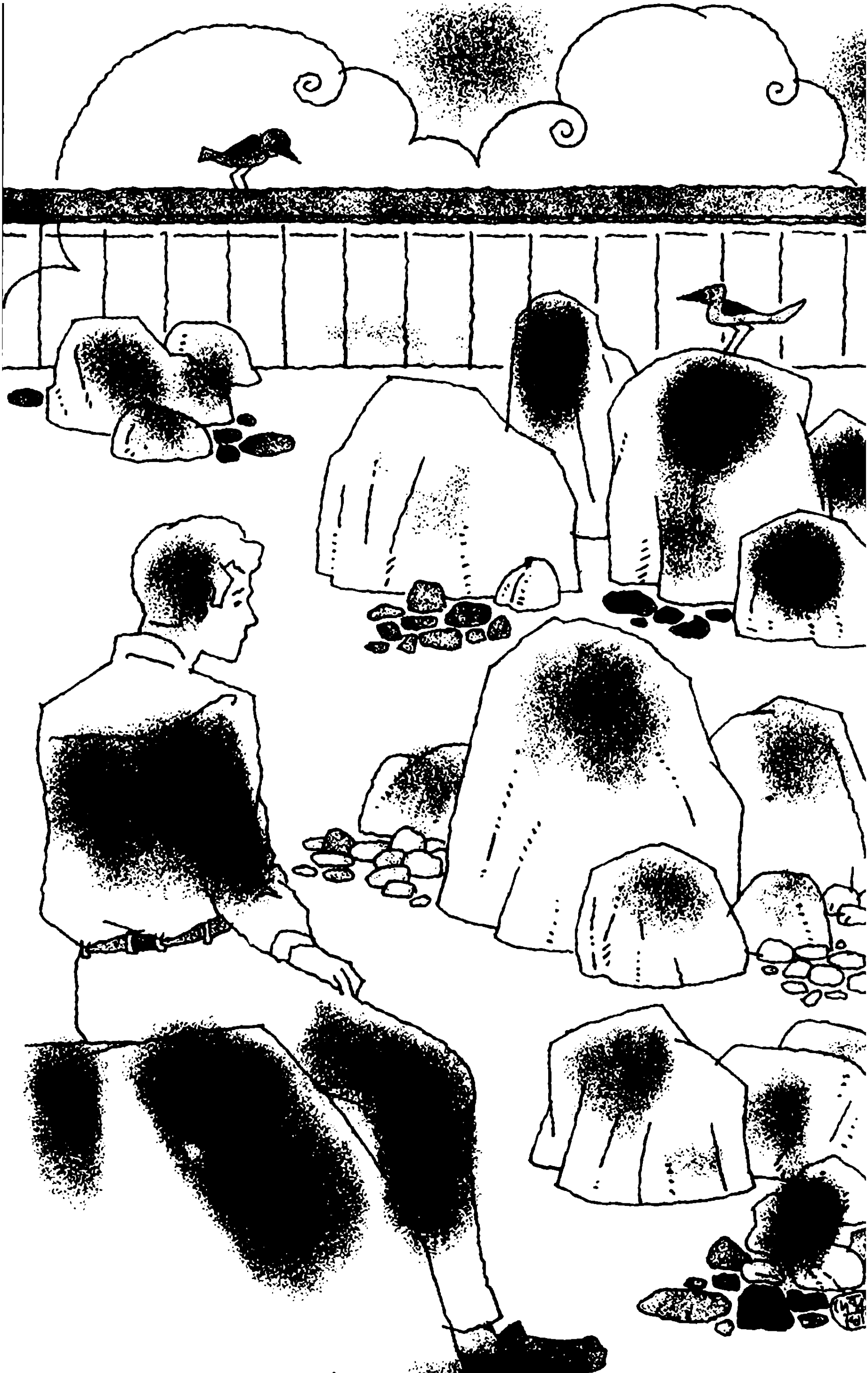

কবিগুরু লজ্জা পাওয়া মুখে বললেন, না না সাগর, মানুষের বাড়ি খালি হাতে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। আগে জানলে বোলপুর থেকে মিষ্টি নিয়ে আসতাম। যাক সে যখন হয়নি খানিকটা রংই বরং নিয়ে যাই।'

আমি সন্দেহ সন্দেহ গলায় বললাম, 'কী রং স্যার? আবির নাকি?'

গুরুদেব থমকে দাঁড়ালেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খেপেছ? ওই যে কী বললে না, বাঁদুরে রং? ওইটাই নেব।'

কথা শেষ করে শশাঙ্ক কবিরাজ লেন মাতিয়ে 'হো হো' আওয়াজে হেসে উঠলেন গুরুদেব। আর তখনই দোতলার বারান্দা থেকে পাজি ছেলেপুলের দল দিল বালতি উপুড় করে। জল? না রংও আছে।

লাল, নীল, সবুজ রঙে মাখামাখি হয়ে কবিগুরু দুহাত তুলে বললেন, 'মাভৈঃ।'

প্রিয় মেঘলা, বসন্তকাল এমন একটা সময় যখন পশুপাখি, গাছপালা এবং মানুষের মধ্যে বিচিত্র ধরনের সব বিভ্রম তৈরি হয়। কোকিল ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যায়। পলাশ উজাড় হয়ে ফোটে। মানব মানবী প্রেমে আকুল হয়। স্বপ্নের মধ্যে আমারও বিভ্রম হয়েছে। এটা বসন্তকাল নয়, তবু একে বসন্ত বলে মনে হয়েছে। এখন দোলের সময় নয়, তবু স্বপ্নে দোল উৎসব দেখলাম। সমস্যা হল, বিভ্রম খুব মারাত্মক। যতই ভাল লাগুক, বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। বরং ভাল লাগলে আগে পালায়। এটাও পালাবে। তার আগে একটা কাজ করে নিয়েছি। সেটা কি স্বপ্ন? তুমি স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা কর, তুমি ভাল বলতে পারবে। স্বপ্ন এখানে শেষ নয়। আর একটু আছে।

বিকেলে রওনা হবার আগে গুরুদেব আমার একটা আবদার রাখলেন। তিনি রেবার পাঠানো মন ক্যানভাসে ছবি এঁকে ক্যানভাস উদ্বোধন করে দিয়ে গেছেন। সেই ছবি শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের। ছবির নীচে লিখে দিয়েছেন—ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল। লম্বা চিঠি লিখেও ছিঁড়ে ফেললাম। থাক, এই স্বপ্ন কাউকে জানানোর দরকার নেই। নিজের কাছে থাক।

BanglaBook.org

তেইশ

নেতা মন্ত্রীদের কেলেঙ্কারির কথা খবর কাগজে রোজই কিছু না কিছু থাকে। কখনো টাকাপয়সার গোলমাল, কখনো স্বজনপোষণ, কখনো পুলিশের ইন্টারোগেশন, কখনো জেল। ফটোও ছাপা হয়। মনে আছে, একবার ফটো দেখেছিলাম। একটা ফটো নয়, পরপর তিনটে ফটো। ফটো সিরিজ। প্রথম ফটোতে এক নেতা হাসি মুখে জেলে ঢুকছেন। পরেরটায় আরেকজন কাঁদো কাঁদো মুখে জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন। দুজনের গলাতেই গাঁদা ফুলের মালা। একজনের বন্দি হবার মালা, আরেকজনের মুক্তির মালা। তিন নম্বর ফটোতে দেখা যাচ্ছে, জেলের সামনে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছেন।

ফটো সিরিজে হাসি কান্নার ব্যাপারটা দেখে আমার খুব আশ্চর্য লেগেছিল। লাগবারই কথা। জেলে যাবার সময় মুখে হাসি থাকবে কেন? ছাড়া পাবার পরই বা কান্না কীসের! দুটোই তো উলটো হওয়ার কথা। অনেক ভেবে বের করেছিলাম, নিশ্চয় নেতা মন্ত্রী হবার প্রাইমারি শর্ত মানা হয়েছে। মনে এক, মুখে আর এক। সেই কারণেই এরকম। হাসির বদলে কান্না, কান্নার বদলে হাসি। পরে তমাল আমাকে বুঝিয়েছিল, ঘটনা মোটেই এরকম নয়। আসলে যে নেতা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন, তিনি ভেঙে পড়েছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আগামী ইলেকশন পর্যন্ত জেলে থাকা এবং 'বন্দি সেন্টিমেন্ট' কাজে লাগিয়ে ভোটে জিতে আসা। তা হল না বলেই তাঁর দুঃখ। তা-ই ফটোতে তাঁর কান্না কান্না মুখ দেখা যাচ্ছে। উলটো দিকে যিনি নতুন করে জেলে যাচ্ছেন, তিনি বেজায় খুশি। 'জেলখাটা নেতা' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ পেয়েছেন। অনেকদিন তক্কেতক্কে ছিলেন। ক-দিন জেলে কাটিয়ে আসবার জন্য অনেক ধরাধরি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নাকি তাঁর জীবনে এই 'সুখের সময়' এসেছে!

BanglaBook.org

তমালের এই 'জেল ব্যাখ্যা' শুনে আমি থ' মেরে গিয়েছিলাম, বাপ্‌রে এরকমও হয়।

তমাল বলল, 'আলবাত হয়। এ তো কম দেখছিস। রাজনীতিতে আরো অনেক কিছু হয়। এই কারণে খবরের কাগজে নেতামন্ত্রীদের কেলেঙ্কারির খবর আর কেউ পড়ে না। কোনটা সত্যি কোনটা বানানো বোঝা যায় না। তাছাড়া এসব জিনিস পাবলিকের কাছে রাইস ওয়াটার হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'রাইস ওয়াটারটা কী!'

তমাল মুচকি হেসে বলল, 'জলভাত।'

রাজনীতির কেলেঙ্কারি নিয়ে আমার কোনো কৌতূহল নেই। আমি খবরের কাগজই পড়ি না। দুনিয়ার খবর জেনে আমার লাভ কী? আমি আমার নিজের খবরই ভাল করে জানি না, দুনিয়ার খবরে আমার কী হবে? মাঝেমধ্যে ভাত বা চায়ের দোকানে গেলে বাসি কাগজ উলটেপালটে দেখি। তাও খবরের কাগজ দেখবার ইন্টারেস্টে নয়, নিছকই সময় কাটানোর জন্য। ওই সময় খবর কাগজের বদলে হাতের কাছে অন্য কিছু থাকলে সেটাই উলটোতাম। একবার মন দিয়ে হিসেবের খাতা দেখছিলাম। মাছ, আলু, আদা, পেঁয়াজ, জিরে, হলুদ। টেবিলের ওপর কেউ ভুল করে ফেলে রেখেছিলেন। ভাত তখনো উনুন থেকে নামানো হয়নি। কী করব? বসে বসে খাতার পাতা উলটেচ্ছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে দোকানের মালিক দৌড়ে এসে হাত থেকে খাতা কেড়ে নিল। কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'এটা কী করছেন!'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'হিসেব পরীক্ষা করছি।'

মালিক গেল আরো রেগে। ধমক দিয়ে বলল, 'কেন? আপনি কি হিসেবপরীক্ষক?'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'তা নয়, আমি হিসেব করে দেখছিলাম, খদ্দের পিছু মাছের ঝোল রাঁধতে আপনাদের কত খরচ হয়, আর আপনারা কত দাম নেন। আচ্ছা, একবাটি ঝোলে জিরে আর আদার পরিমাণ কেমন থাকে? খাতায় দেখলাম, জিরের দাম তো বেশ চড়ার দিকে। আপনারা এত সস্তায় মাছের ঝোল দেন কী করে

BanglaBook.org

বলুন তো! এক কাজ করবেন, আজ থেকে আমার ঝোল থেকে জিরে বাদ দেবেন।'

মালিক দাঁত কড়মড় করে বলল, 'দুপুরবেলা রসিকতা করবেন না সাগরবাবু। খেতে এসেছেন খেয়ে চলে যান।'

এই মুহূর্তে আমার হাতে খবরের কাগজ। সেই কাগজ আমি পড়ছি। বাসি নয়, টাটকা কাগজ। যদিও আমি এখন ভাতের হোটেল বা চায়ের দোকানে নেই। আমি আছি, ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনার মন্মথ তালুকদারের বাগান অফিসে। আমি জানিয়ে আসিনি। মন্মথ অফিসে নেই। সিকিউরিটি আমাকে চিনতে পারেনি। বাগানের গেট থেকেই আমাকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল।

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া স্যার কারো সঙ্গে দেখা করেন না।'

আমি বললাম, তাতে কী হয়েছে? আমিও করি না।'

এই কথা শুনে ড্রেস পরা সিকিউরিটি আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'তারপরেও মাঝেমধ্যে হুটপাট দেখা করতে হয়। তার কারণ কিছু কথা থাকে, যেটা আগে থেকে ভেবেচিন্তে বলা যায় না। বিউটিফুলের মতো এত বড় একটা অফিসে কাজ করছ, আর এই বিষয়টা জানো না।'

ড্রেস পরা সিকিউরিটির বয়স বেশি নয়। সুঠাম, তরুণ। বলল, 'আমার বিষয় আমি বুঝব। আপনি এখন যান। স্যারের সঙ্গে কথা বলে আসবেন।'

আমি অল্প হেসে বললাম, 'ভাই, আমার হাতে সময় কম। এত যাতায়াত করতে পারব না।'

'তাহলে করবেন না। মেলা বিরক্ত করছেন কিন্তু।'

আমি বললাম, 'তুমি এক কাজ কর ভাই, স্যারকে একটা টেলিফোন কর। আমিও করতে পারতাম। কিন্তু করব না। যার যা কাজ। বাঘের কাজ হালুম করা, বিড়াল করবে মিঁউ।'

সিকিউরিটি ছেলে আমার দিকে এবার কড়া চোখে তাকাল। সম্ভবত সে মনে করছে, তাকে আমি 'বিড়াল' বলছি। প্রবাদের এই একটা সমস্যা। গুলিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

'আপনি যদি আর এক মিনিটের মধ্যে গেট ছেড়ে চলে না যান, তাহলে আমি কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করব।'

'কী ব্যবস্থা ভাই? চেয়ার এনে দেবে? আমি বাইরে বসে তোমার স্যারের জন্য অপেক্ষা করব? সেটি হবে না। আমি বাইরে বসতে পারব না। সেদিন তোমাদের বাগান অফিসে চমৎকার একটা হ্যামক দেখেছি। সেদিনই ওতে শুয়ে পড়বার খুব শখ ছিল। প্রথমদিন বলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে পারিনি। কিন্তু আজ ঠিকই করে এসেছি ওই হ্যামকে শুয়ে খানিকক্ষণ দোল খাব। সুতরাং বাইরে বসতে বললেও বসব না ভাই।'

কথা শেষ করে গা জ্বালা করা হাসলাম। সুন্দর দেখতে সিকিউরিটি ছেলেটির মুখ দেখে মনে হল, আমাকে কামড়ে দিতে পারলে সবথেকে বেশি খুশি হবে। সে দাঁত কড়মড় করে বলল, 'আপনাকে শেষবারের মতো বলছি।'

আমি বললাম, 'বালাই ষাট! শেষবারের মতো বলবে কেন? আরো অনেকবার বলবে। বারবার বলবে। তবে তুমি যদি তোমার স্যারকে একটা ফোন কর, দেখবে আমার নাম শুনে উনি সব কাজ ফেলে এখানে চলে আসবেন।'

পৃথিবীর সব অধস্তনরাই বসেদের ওপর কম বেশি বিরক্ত। কিন্তু আমার ধারণা, পৃথিবীর সব অধস্তনরাই বসকে মাথার ওপর বসিয়ে রাখে। বসের কোনোরকম অপমান সহ্য করতে পারে না। একজন 'ছোটলোক' চেহারার ছোকরা যখন বলে, 'বস' নাকি সব কাজ ফেলে তার জন্য ছুটে আসবে তখন যথেষ্ট প্রেস্টিজে লাগে। এটা একটা অপমান। সিকিউরিটি ছেলে গেটের চৌহদ্দি ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসার প্রস্তুতি নিতে লাগল। মারবে নাকি? মনে হয় মারবে। ঠিকই করবে। আমি যদি সিকিউরিটি গার্ড হতাম তাহলে একই কাজ করতাম। আমি নরম হেসে, নীচু গলায় বললাম, 'ভাই অত রাগ কোরো না। যা বলছি করে দেখ। স্যারকে ফোন করে বল, আপনি যার সঙ্গে খুনের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন সেই লোক এসেছে। নাম বলছে সাগর।'

BanglaBook.org

সিকিউরিটি ছেলে থমকে দাঁড়াল। কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা মতো খেয়ে গেল যেন। বিড়বিড় করে বলল, 'কী বললেন?'

আমি আবার হাসলাম। বললাম, 'ওই যে বললাম, তুমি খুনের কথাটা বলে দেখ।'

খানিকটা ভূতে পাওয়ার মতো করে সিকিউরিটি ছেলে এবার গেটের পাশে রাখা ফোনের রিসিভার তুলল।

'স্যার...।'

এরপর যা যা ঘটবার তা-ই ঘটল। আমাকে বিরাট খাতির যত্ন করে ভিতরে ঢোকানো হয়েছে। সিকিউরিটি ছেলেটি গার্ডেন চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'স্যার, বসুন।'

আমি টেবিলে ভাঁজ করে রাখা খবরের কাগজ হাতে তুলে নিয়ে বললাম, 'না, তোমার স্যার না আসা পর্যন্ত আমি ওই হ্যামকে শুয়ে দুলব। কিছু খাবার হবে?'

সিকিউরিটি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'অবশ্যই হবে স্যার। আমি আমাদের প্যান্ট্রিতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা এখনি দিয়ে যাবে।'

আমি হ্যামকে বসতে বসতে বললাম, 'খুব ভাল। দুটো কলা দিতে বলবে। গাছে শুয়ে কলা খাওয়ার মজাই আলাদা। নিজের মধ্যে একটা হনুমান ফিলিংস আসবে। যাক, তোমার বসের আসতে কতক্ষণ লাগবে?'

কলার কথা শুনে সিকিউরিটি ছেলেটি মনে হয় আরো ঘাবড়ে গেল। নিজের বসের সঙ্গে কথা বলবার পর থেকেই কেমন যেন ভয় পাওয়া গোছের হাবভাব। কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'একটু দেরি হবে স্যার। উনি দূরে আছেন।'

আমি বললাম, 'নো প্রবলেম। ততক্ষণ আমি খবরের কাগজ পড়ব।'

'কোনো প্রবলেম হলে আমাকে ডাকবেন স্যার।'

আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে চলে যেতে বললাম। কী অদ্ভুত! একবার খুনের কথা বলেছি সব কেমন নিমেষে বদলে গেল! গলা ধাক্কা দেওয়ার বদলে হাত কচলাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি ফেকলু পার্টি নই, আমি কোনো ইউনিভার্সিটির ভিসি। 'শিক্ষাব্যবস্থায়

BanglaBook.org

গণচেতনার উন্মেষ' ধরনের কোনো জটিল বিষয়ে সেমিনারে ভাষণ দিতে এসেছি!

হ্যামকে দুলতে দুলতে চোখের সামনে খবরের কাগজটা মেলে ধরলাম। আর তখনই খবরটা চোখে পড়ল। খবরের শিরোনাম—কেলেঙ্কারিতে নেতা! সাংবাদিক বেশ বড় করে খবরটা লিখেছে। একেবারে ডায়লগ টু ডায়লগ। আমি অতি উৎসাহে পড়ে ফেললাম।

গতকাল শনিবার বিশিষ্ট নেতা রামনিধি পাল তিনটি জনসভা করে রাতের ট্রেনে কলকাতা ফিরছিলেন। ফেরবার কথা ছিল গাড়িতে। কিন্তু গাড়ি গোলমাল করে। পার্টির কর্মীরা নেতাকে বলে, দাদা, আপনি অন্য গাড়ি নিয়ে ফিরুন। নেতা রাজি হন না। তিনি বলেন, না ট্রেনে ফিরব। রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে যাব। বিশ্রাম হবে। কাজের চাপে বিশ্রাম হচ্ছে না। রাতের ট্রেনে এসি কুপে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন রামনিধিবাবু। রাত একটা নাগাদ চিৎকার চেঁচামেচিতে তিনি ধড়ফড় করে উঠে পড়েন। একটু পরেই বুঝতে পারেন, ট্রেনে ডাকাত পড়েছে। ডাকাতদল লুটপাট শুরু করেছে। রামনিধি পাল নিজের দেহরক্ষীকেও অন্ধকারে খুঁজে পেলেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে সিটের ওপর বসে রইলেন। একটু পরেই ডাকাত দলের লিডার মুখে কাপড় বেঁধে তাঁর সামনে হাজির হল। হুংকার দিল—

'অ্যাই হারামজাদা, সঙ্গে যা আছে দিয়ে দে।'

রামনিধি পাল হাতের আংটি ঘড়ি সব খুলতে লাগলেন। ডাকাতের লিডার আবার হুংকার দিল।

'এত দেরি কেন? তাড়াতাড়ি কর।'

বলতে বলতে সে রামনিধি পালের মুখে টর্চের আলো ফেলে। ফেলেই লাফিয়ে ওঠে।

'আরে রামু না? আরে রামনিধি। আমাদের গাধানিধি পাল যে।'

রামনিধিবাবু চমকে উঠলেন। ডাকাত লিডার ফট করে কুপের আলোটা জ্বালিয়ে মুখের কাপড় সরিয়ে ফেলল। রামনিধি সহাস্যে বললেন, 'আরে গজা যে! আমাদের গজানন। তুই এখানে কী করছিস?'

BanglaBook.org

গজানন ডাকাত বলল, 'কী করছি দেখতে পাচ্ছিস না? ডাকাতি করছি। তুই গাধা এখানে কী করছিস?'

রামনিধিবাবু বললেন, 'সভা করে কলকাতায় ফিরছি।'

গজানন বলল, 'ওহ ভুলে গেছি তুই তো আবার নেতা হয়েছিস। কাগজে টিভিতে ছবি দেখেছি। হ্যাঁরে রামু, তুই নেতা হলি কী করে রে! মনে আছে তোকে আমরা স্কুলে গাধানিধি বলে ডাকতাম? কী গাধা ছিলিরে বাবা!'

রামনিধিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'আর তুই? তুই কী করে ডাকাত হলি গজা। ভিতুর ডিম ছিলি একটা! অঙ্ক স্যারের ধমক খেয়ে একবার প্যান্টে হিসি করে ফেলেছিলি, হা হা...।'

এরপর দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে গল্প শুরু করে। ট্রেনের যাত্রীরা অবাক হয়ে যায়। গোটা ট্রেন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে নেতা আর ডাকাত বন্ধু! এর মধ্যে রেলপুলিশ আসে, কিন্তু রামনিধি পালের ভয়ে গজাননকে কিছুই বলতে পারে না। বরং ওই রাতেই কোথা থেকে গরম চা আর পকৌড়া জোগাড় করে আনে। দুজনে আরাম করে খায়। আড্ডা চলে ভোররাত পর্যন্ত। গজানন দলের বাকি ডাকাতদের আদেশ দেয়, যার যা জিনিস নেওয়া হয়েছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। স্কুলের বন্ধু যে ট্রেনে চলেছে সেখানে ডাকাতি করা যাবে না। জিনিস-টিনিস ফিরিয়ে দেওয়ার পর একসময় চেইন টেনে গজানন তার দলবল নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায়। নেমে যাওয়ার আগে রামনিধি পালকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এই দৃশ্য কামরার কোনো কোনো যাত্রী মোবাইলে ধরে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু ডাকাতদের ভয়ে পারেনি। গজানন নেমে যাওয়ার পর মুখে হালকা হাসি নিয়ে রামনিধি পাল নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন।

ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে সকালবেলা। রামনিধিবাবু কলকাতায় পৌঁছোনোর পর। নেতা-ডাকাতের বন্ধুত্ব নিয়ে রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে যায়। খবর আপ্রাণ চেপে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু পারা যায়নি। রামনিধিবাবুকে তাঁর দলের নেতৃত্ব ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে জানা গেছে। রামনিধি পাল একে নিছক বন্ধুত্ব বলতে চাইলেও তাঁর বিপক্ষ দল একে 'ভয়ংকর কেলেঙ্কারি' বলে প্রচার শুরু

করেছে। আজ বিকেলে কলকাতায় এর প্রতিবাদে মিছিল বের করা হবে।

খবর আমার দারুণ লাগল। এমন মজার খবর আমি আগে কখনো পড়েছি বলে মনে হয় না। রামনিধিবাবুর মতো মুখে হাসি নিয়ে হ্যামকে হালকা দুলতে দুলতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। দোলা ঘুম। স্বপ্ন দেখলাম, হনুমান হয়ে গাছে বসে কলা খাচ্ছি। মালঞ্চমালা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমাকে একটা একটা করে কলা এগিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, 'লক্ষ্মী সোনা, আরেকটা খাও। লক্ষ্মীটি, না খেলে যে গায়ে জোর হবে না। মন্মথকে মারবে কী করে?'

BanglaBook.org

চব্বিশ

মালঞ্চমালার মুখটা ধীরে ধীরে মন্মথ তালুকদারের মুখে বদলে গেল। ঘুম আর জেগে থাকার এটাই কি তফাত? মুখ বদলে যায়? মনও কি বদলায়? মনে হয় বদলায়।

মন্মথ তালুকদার ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল। সে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

'সাগর, সাগর, ওঠ সাগর...আমি এসেছি। সরি একটু দেরি হল। একটা সাইট দেখতে গিয়েছিলাম।'

আমি ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। বাঃ, হ্যামকের দোলায় এমন চমৎকার ঘুম হয় আমার জানা ছিল না। শুধু হ্যামকের দোলায় নয়, তার সঙ্গে গাছপালার সান্নিধ্য আছে। ফুরফুরে তাজা বাতাস আছে। পাখির কিচিরমিচির আছে।

মন্মথ আবার ডাকল, 'সাগর, এসো, এসো আমরা টেবিলে বসে কথা বলি।'

গলায় যতই নরম ভাব থাক, মন্মথ তালুকদারের ভুরু কোঁচকালো। বোঝাই যাচ্ছে, কোনো কারণে সে আমার ওপর বিরক্ত। মনে হয় আমি কারণটা ধরতে পারছি। থাক। ওর বিরক্তি নিয়ে ও থাক। আমার ঘ্যাচার মাথা। কাজ শেষে আমাকে ঠিকমতো পেমেন্ট দিলেই হবে। আমি ওঠবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলাম না। একটা হালকা হাই তুললাম। খোলা মুখের সামনে ডান হাত এনে তুড়ি দিলাম। হাইয়ের ক্লাস ক্যারেক্টার আছে। যাকে সাদা বাংলায় বলা যায় শ্রেণী চরিত্র। ঘাটে মাঠে শোয়া পার্টি যেভাবে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, ইয়া বড় মুখ করে হাই তুলবে, ফুরফুরে এসি ঘরে শোয়া মানুষ নিশ্চয় সেইভাবে হাই তুলবে না। হ্যামকনিদ্রার পর বত্রিশ পাটি বের করা হাই মানায় না। এইভেবে আমি হালকা হাই ছেড়েছি। মন্মথ তালুকদার একই কথা বলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

‘আমরা কথা শুরু করি। আমার একটু তাড়া আছে।’

আমি শুয়ে শুয়েই বললাম, ‘কী বিষয়ে তাড়া।’

মন্মথ তালুকদারের ভুরু আরো একটু গভীরভাবে কোঁচকাল। ভাবটা এমন, আমার কী বিষয়ে তাড়া তা নিয়ে তোমার কী ছোকরা? একটু ইতস্তত করে বলল, ‘টাকির কাছে একটা জমি কেনবার ব্যাপারে মিটিং করব।’

‘ও। জমি কতখানি? ছোট?’

মন্মথর বিরক্তি এবার ভুরু থেকে গলায় এল। নিজেকে ভদ্রতার মধ্যে বাঁধলেও সেই বিরক্তি বোঝা গেল।

‘না বড়। বেশ বড়। কিন্তু তা দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন সাগর?’

আমি নিস্পৃহভাবে বললাম, ‘কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি জমির কথা বললেন, তা-ই প্রশ্নটা মাথায় এল। আপনি যদি জমি না বলে আকাশের কথা বলতেন, তাহলে কি আর ছোট বড়র প্রশ্ন মাথায় আসত?’

মন্মথ তালুকদার হাত তুলে গলা খাঁকারি দিল। বলল, ‘যাক, এসো আমার কথা সেরে ফেলি।’

আমি এবার দুটো হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলাম। হ্যামকে দিলাম অল্প দোলা। তারপর বললাম, ‘সরি স্যার। আমি এখন নামতে পারছি না। আপনার এই শয্যাব্যবস্থা খুবই আরামের। আমি আর একটু ঘুমোব। এতক্ষণ চিত হয়ে ঘুমিয়েছি, এবার পাশ ফিরে ঘুমোব। যদি ঘুম না আসে তাহলে ঘাপটি মেরে থাকব। স্যার, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে যে একটু অপেক্ষা করতে হবে।’

হ্যামক আমার ঘরের ভাঙা তক্তপোশ নয় যে ইচ্ছে করলেই পাশ ফেরা যাবে। আমি পাশ ফিরতে পারলাম না, তবে কথা বলতে বলতে আমি সত্যি উলটো দিকে মুখ ফেরালাম। বুঝতেই পারছি, পাশে দাঁড়ানো বাগান বিশারদের হাল কঠিন হয়ে গেছে। আমার মতো একটা ফালতু ছোকরা, ঘুমোনোর জন্য তাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে এটা সে নিশ্চয় কল্পনাও করতে পারেনি। তারওপর সঙ্গে দুজন পিয়োন, একজন অফিস কর্মচারী, গেটের সেই সিকিউরিটি গার্ডও আছে।

BanglaBook.org

তাদের সামনে আমার এই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া খুবই অপমানজনক। মন্মথ তালুকদার তো আর হেঁজিপেঁজি কেউ নয়। বিউটিফুল-এর মতো বড় কোম্পানির মালিক। তবে সাগরও কি হেঁজিপেঁজি কেউ? একেবারেই নয়। বড় কোম্পানি না থাকতে পারে কিন্তু সাগরেরও কম কিছু নেই। তার ভাঙা তক্তাপোশের পাশে রাজকন্যা এসে বসে। তার টেবিল খটখট ভাতের হোটেল আছে। মাইনে না দেওয়া টিউশন বাড়ি আছে। তমালের মতো একগাদা বিপজ্জনক ভালবাসার বন্ধু আছে। আছে রেবার মতো বুঝতে না পারা রহস্যময়ী, মনে আর শরীরে অপরূপ সুন্দরী প্রেমিকা। আছে ভিক্ষুক নন্দর মতো ধনী মনের মানুষ। আছে বাঁধা গতে জীবন না কাটানোর সাহস। আছে যখন খুশি মন খারাপ করা আর মন ভাল করবার স্বাধীনতা। সাগর হাসতেও ভয় পায় না, কাঁদতেও লজ্জা পায় না। মন্মথ তালুকদার তো কোন ছার, টাটা বিড়লা আম্বানিরা পারবে যখন মনে হবে হো হো করে হাসতে? কান্না পেলেও হাউমাউ করে কাঁদতে পারবে? হাজার ন্যাকড়া। টিসু আনো রে, কালো চশমা আনো রে। সাগরের কিস্সু লাগে না। তাহলে? কম কীসের? তারওপর সাগরের আছে মন ক্যানভাস। যেখানে মনে মনে ছবি আঁকা যায় যখন খুশি। তুলির রং লাগে না। মনে রং থাকলেই হল। আর আছে মনফোন। যখন তখন যাকে খুশি ফোন করবার আয়োজন। যেখানে কথাটা সত্যি, ফোনটা ম্যাজিক। সাগরের মতো এত কিছু এই দুনিয়ার কার আছে? কারো নেই।

মনফোনের কথা মনে পড়তে মনটা খুশি খুশি লাগছে। অনেকদিন মনফোনে কথা হয়নি। হাতে সময় আছে। মন্মথ তালুকদার অপেক্ষা করুক। আমি চোখ বুজে ঘাপটি মেরে মনফোনে কতগুলো দরকারি কথা সেরে নিই।

'হ্যালো, হ্যালো ঋতিশা?'

ঋতিশা উত্তেজিত গলায় বলল, 'হ্যাঁ বল। সাগর তুই কোথায়?'

আমি হেসে বললাম, 'হ্যামকে।'

'কোথায় বললি?'

'হ্যামক শয্যায়। সেখান থেকে বলছি। তুই ঘটনা বল ঋতিশা।'

ঋতিশা উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'ঘটনা এক্সেলেন্ট। তোর

BanglaBook.org

পাঠানো বিদ্রোহী মানুষের দল এসে সেদিন 'আগুন জ্বালো'র ওপর জল ঢেলে দিয়ে গেছে। শুধু 'আগুন জ্বালো' নয়, আমার শাশুড়ির অবস্থা সবথেকে খারাপ। তিনি ভিজে বিড়াল হয়ে বাড়িতে বসে আছেন।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'বলিস কী রে ঋতিশা! এতটা হয়ে গেছে!'

'হয়ে গেছে মানে সাগর শাস্তি কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ওই মহিলা। সেদিন, তুই ফোন করবার খানিকক্ষণের মধ্যে, টিভিওলারা ক্যামেরা বাগিয়ে এসে হাজির হল। তারা চারু দত্তকে বলল, আমরা খবর পেয়ে গেছি মাসিমা। উনি তো অবাক। বললেন, কী খবর? টিভিওলারা বলল, আপনি আপনার "আগুন জ্বালো" বুটিকের দামি নামী মোমবাতিগুলো গঙ্গাপাড়ের ঝুপড়িবাসীকে বিনি পয়সায় বিলিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কথা শুনে আমার শাশুড়ির তো খাবি খাওয়ার মতো অবস্থা, উনি তো কিছুই জানেন না...গঙ্গার ঘাট থেকে কারা আসছে? কেন আসছে? কিছু জানেন না...হি হি...উনি হ্যাঁও বলতে পারছিলেন না, আবার নাও বলতে পারছিলেন না। বোঝ কাণ্ড!'

আমি এক কান থেকে অন্য কানে মোবাইল ফোন বদল করে বললাম, 'তারপর কী হল?'

ঋতিশা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আর কী হবে? শাশুড়ি ঠাকরুন মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়ে, ঠোঁটে লিপস্টিক, চোখে মাসকারা লাগিয়ে ভিতরের কান্না চেপে টিভি ক্যামেরার সামনে গদগদ গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সবাইকে ডেকেছি। লাভ নয়, প্রতিবাদের জন্য আমি ব্যবসা শুরু করেছি। সেই প্রতিবাদে যদি উজাড় করে দিতে না পারি তাহলে কীসের জন্য আমার পথচলা...হি হি...।'

আমি বললাম, 'বলিস কী রে ঋতিশা! এ তো সিনেমা।'

'সিনেমার থেকেও বেশি। তোর ঝুপড়ি পার্টি টেম্পো করে এসে দোকানে ঢুকে মনের আনন্দে সব সাফা করে দিল। তারপর হাতে সেই মোমবাতি জ্বেলে শুরু করল হাঁটা। চারু দত্ত ছল ছল চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'আহারে!'

ঋতিশা বলল, 'আহারে বলে আহারে। পাজি মহিলা একেবারে ঘরে সেঁদিয়ে গেছে। আমার সঙ্গেও আর চ্যাটাং চ্যাটাং করছে না। শুনলাম, ঝুনঝুনওলা নাকি রেগে বোম। এইভাবে পয়সা নষ্ট সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। বলেছে, "আগুন জ্বালো" জ্বালিয়ে দেবে। সেখানে এগ রোলের দোকান খুলবে।'

আমি বললাম, 'চমৎকার।'

ঋতিশা বলল, 'অ্যাই সাগর, তোর সঙ্গে কবে দেখা হবে?'

'ডেট টাইম বলাটাই তো ঝামেলার। চিন্তা করিস না হয়ে যাবে। এখন ছাড়ি?'

ঋতিশা উদগ্রীব ভাবে বলল, 'সাগর, শোন সাগর, ফোন ছাড়িস না...।'

এবার পরের ফোন। মেঘলাকে।

'মেঘলা। খবর কী?'

'খুব খারাপ।'

আমি চিন্তিত গলায় বললাম, 'কী হয়েছে?'

মেঘলা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অর্ণব প্রায় কান্নাকাটি করছে। হাতে পায়ে ধরবার মতো অবস্থা।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'অর্ণব! সে কে?'

মেঘলা বলল, 'উফ সাগরদা, তুমি এত সহজে সব ভুলে যাও কী করে বল তো?'

আমি বললাম, 'সরি।'

'অর্ণব আমার হবু বর। রিকশাকাণ্ডে যে আমার সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক শেষ বলে ঘোষণা করছিল।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'বুঝতে পেরেছি, তার আবার কী হল?'

মেঘলা হেসে বলল, 'তার বোধোদয় হয়েছে। বোধোদয় নয়, রিকশাদয় হয়েছে। আমাকে বলল, সেদিন রিকশা টানা নিয়ে অতগুলো কড়া কড়া কথা বলার জন্য সে খুবই অনুতপ্ত। আমি যেন সব ভুলে যাই এবং তাকে ক্ষমা করি।'

BanglaBook.org

'খুব ভাল কথা। তুমি ভুলে যাও মেঘলা। তোমার সুন্দর বিয়ে হোক। আমি কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে খাই।'

মেঘলা বলল, 'সাগরদা আমি ঠিক করেছি, ভুলে যাব। ভুলে গিয়ে বিদেশে যাবার আগে অর্ণবকেই বিয়ে করব। কিন্তু তার জন্য একটা কন্ডিশন ওকে মানতে হবে।'

'আবার শর্ত দেওয়ার কী হল?' আমি বিরক্ত হলাম। একটা হ্যাপি এন্ডিং হতে চলছে, তার মাঝে ব্যাগড়া।

মেঘলা বলল, 'আমি বলেছি, বিয়ের সময় আমি রিকশা করে বিয়ে করতে যাব। যদি রাজি থাকো তো বল।'

আমি বললাম, 'রিকশা করে যাবে মানে! সামনে ব্যান্ড বাজবে?'

'ব্যান্ড বাজবে না ঢাক বাজবে আমি জানি না সাগরদা, তবে রিকশা করেই যাব।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মেঘলা।'

'হোক বাড়াবাড়ি। বাড়াবাড়ি কি শুধু ছেলেদের জন্য। মেয়েরা বাড়াবাড়ি করতে পারে না? যাইহোক এখন রাখলাম সাগরদা। লাইব্রেরিতে ঢুকছি। আর হ্যাঁ, তোমার স্বপ্নযন্ত্র বানানোর কাজ শুরু করেছি। খুব চেষ্টা করছি, বাইরে চলে যাবার আগে যাতে তোমাকে দিয়ে যেতে পারি।'

আমি মনফোন কানে নিয়েই প্রায় লাফিয়ে উঠি। স্বপ্নযন্ত্র হচ্ছে! ফোন কেটে দিল মেঘলা।

শেষ ফোন রেবাকে।

রেবা কড়া গলায় বলল, 'কী চাই?'

আমি গদগদ গলায় বললাম, 'কিছু না। এমনি এমনি করলাম।'

'তুমি কি খুন করে জেলে যেতে পেরেছ?'

'এখনো পারিনি রেবা। চেষ্টা চালাচ্ছি।'

'তোমার দ্বারা কিছুই হবে না।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। যা করতে যাই সব উলোটপালোট হয়ে যায়। এই যে একটা খুনের কাজ পেলাম, সেটাও মনে হচ্ছে উলটে যাবে।'

‘আমি জানি। শুধু খুন কেন? ভালবাসার কাজও তুমি উলটে দাও।’

বিষণ্ণ গলায় বললাম, ‘আমি কিন্তু চেষ্টা করি রেবা। খুব চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত পারি না।’

‘দুনিয়ায় পারার মানুষ দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত সাগর। তুমি পারো না বলেই তোমাকে এত ভালবাসি সোনা।’

আমি কিছু বলার আগেই রেবা মনফোন কেটে দিল। এমনটাই সে করে। আমার জন্য অপেক্ষা করে না।

মনফোনের পাট শেষ করে আমি হ্যামক থেকে নামলাম। মন্মথ কিছু বলতে গেল। আমি হাত তুলে বললাম, ‘আগে চা দিতে বলুন। তারপর কথা।’

মন্মথর পিছনে পিয়োন গোছের একজন। মন্মথ তাকে ইশারা করল। চায়ের ইশারা। আমি ঝুঁকে বললাম, ‘ভাই, একটু কষা চা আনবে। বেকার মানুষদের পলকা চা সহ্য হয় না।’

গার্ডেন চেয়ারে টেবিলে বসে চা খেলাম। মন্মথও খেল। শর্ত অনুযায়ী এই সময়ে আমরা কোনো কথা বললাম না। বিকেল শেষ হতে বেশি দেরি নেই, কিন্তু রোদের দাপট আছে। আমরা বসে আছি সুন্দর রঙিন ছাতার তলায়। ফিনফিনে চায়ের কাপ রেখে বললাম, ‘একটা প্ল্যান করছি। সেই প্ল্যান বলতেই আপনার কাছে আসা স্যার।’

‘কীসের প্ল্যান?’ মন্মথ ভুরু কুঁচকে বলল।

আমি নির্লিপ্ত মুখে বললাম, ‘শ্রীমতী মালঞ্চমালাকে হত্যার প্ল্যান।’

মন্মথ একটু নড়েচড়ে বসে বলল, ‘ভাবা হয়ে গেছে?’

আমি বললাম, ‘পুরোটা হয়নি। খানিকটা হয়েছে।’

মন্মথ তালুকদার বলল, ‘প্ল্যানটা কী আমি শুনতে পারি।’

আমি বললাম, ‘পারেন। কিন্তু তার আগে কতগুলো শর্ত আছে। সেগুলো আপনাকে মানতে হবে স্যার।’

শর্তের কথা শুনে মন্মথ তালুকদার ভুরু কোঁচকাল। কেউ শর্তের বাইরে নয়। একজন মানুষকে গোটা জীবন শুধু শর্ত মেনেই চলতে হয়। যে যখন পরাধীন তখন তার সামনে থাকে হাজার শর্ত। এটা

BanglaBook.org

করা যাবে না, সেটা করা যাবে না। এখানে বাধা, সেখানে বাধা। সে যখন স্বাধীন তখন তার সামনে আরো বেশি শর্ত। স্বাধীনতা উপভোগ এবং রক্ষার জন্য তাকে শর্তের পর শর্ত মানতে হবে। সংসারীর যেমন শর্ত আছে, সন্ন্যাসীরও আছে। দরিদ্র মানুষের শর্ত কষ্ট করে বাঁচতে হবে। ধনীর শর্ত ফেলে ছড়িয়ে জীবন কাটাও। আমার মনে হয়, ধনীর শর্ত বেশি ঝামেলার। নিজেকে ধনী করবার ঝামেলার সঙ্গে থাকে অন্যকে গরিব রাখবার ঝামেলা—দুটোই সামলাতে হয়। কবিকে মানতে হয় ছন্দের শর্ত, বিজ্ঞানীর ছন্দ ফর্মুলা। রাজার শর্ত মাথা উঁচু করে রাজধর্ম পালন, প্রজার শর্ত কুঁজো হয়ে থাকো। প্রেমের শর্ত যুক্তি বুদ্ধি বিসর্জন। বিরহের শর্তও সেই এক। যুক্তি বুদ্ধি ছুঁড়ে ফেল। মজার কথা, সবাই জানে তবু, শর্তর কথা শুনলে, সবাই ভুরু কুঁচকোয়। মন্মথ তালুকদারও কুঁচকেছে।

আমি একটু হেসে বললাম, 'চিন্তা করবেন না, শর্ত খুব কঠিন নয়।'

মন্মথ এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'টাকা বাড়াতে হবে।'

আমি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললাম, 'হতে পারে। এখনই বলা যাচ্ছে না।'

মন্মথ আমার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সাগর, আমার একটা কথা আছে।'

'বলুন স্যার।'

'অফিসের সিকিউরিটি গার্ডকে খুনের কথা না বললেই কি হত না?'

আমি বুঝেছিলাম, মন্মথ জেনেছে। সেই কারণেই আমার ওপর বিরক্ত। ও যদি জানত, আমি ওকে বিরক্ত করবার জন্যই সিকিউরিটি ছেলেটিকে ওসব বলেছি তাহলে বোধহয় বিরক্ত হত না। শুধু খুনের কথা বলে বিরক্ত করা নয়, আমি ওকে অপেক্ষা করিয়ে হ্যামকে ঘুমের ভানও একই কারণে করেছি। মালঞ্চমালাকে কন্ট্রোলে আনবার জন্য একরকম পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলাম। সে-পদ্ধতি ছিল তার ঠোকা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির নিয়ম হল মোটামুটি সবকথায় 'হুঁ হাঁ' করে যেতে

BanglaBook.org

হবে। তার স্বামীর জন্য আবার এই পদ্ধতি চলবে না। তার ওপর আরেকরকম পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করছি। বিরক্ত পদ্ধতি। এটাই আসল। কার জন্য কোন পদ্ধতি সেটা বুঝতে হবে। একই পদ্ধতি সবসময় কাজ করবে এমন নয়। মালঞ্চমালার ক্ষেত্রেই তো তাল ঠোকা পদ্ধতি কাজ করতে সময় লেগেছে। অনেক লড়তে হয়েছে। তার স্বামীর বেলায় অতটা সময় নেবে বলে মনে হচ্ছে না। গেটের সিকিউরিটিকে খুনের কথা বলে দেওয়ায় সে খুবই বিরক্ত। পুরোটা আমায় দেখাচ্ছে না।

আমি হেসে বললাম, 'ওই ছেলেটিকে একটু ঘাবড়ে দিলাম।'

মন্মথ তালুকদার কঠিন চোখে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, 'কেন?'

'আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, আপনার এই গার্ডেন অফিসের কর্মচারীরা এতক্ষণে আমাকে পাগল ছাগল ভেবে নিয়েছে। ওদের আমি খুনই বলি আর চুমুই বলি—সব সমান। ওরা কোনো গুরুত্ব দেবে না। আমি যদি মালিকের লোক না হতাম, তাহলে প্রথম দিনই আমার পশ্চাৎদেশে একটি লাথি কষিয়ে বিদায় করে দিত। মালিকের লোককে পশ্চাৎদেশে লাথি কষানোর দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই এমন নয়, অনেক আছে। কিন্তু "বিউটিফুল" কোম্পানির লোকরা মনে হয় না সেই দলভুক্ত। যতই হোক, তারা সৌন্দর্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ফুল, পাখি, বাগান নিয়ে তাদের কারবার। লাথি কষানো কি তাদের সাজে?'

কথা শেষ করে আমি সুন্দর করে হাসলাম। মন্মথ তালুকদারের বিরক্তি কি বাড়ছে? হ্যাঁ, বাড়ছে। নাকের পাটা ফুলে উঠছে। বিরক্তি বাড়িয়ে দিতে হবে। ধমক জাতীয় কিছু একটা দিতে গিয়ে মন্মথ যেন ব্রেক কষল। বাঁ হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছল। মনে হল, মুখ নয়, মুখে যে কথা আসছে সেই কথা মুছল।

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, এই ধরনের কথা না বলাই ভাল। এতে মানুষ ঘাবড়ে যায়।'

আমি বিনয়ের গলায় বললাম, 'মাঝেমাঝে ঘাবড়ালে শরীর ভাল থাকে স্যার। বিশেষ করে হার্টের জন্য তো খুব জরুরি। নিউজিল্যান্ডের এক গবেষণা কেন্দ্রে ঘাবড়ে যাওয়া মানুষের ওপর কাজ হচ্ছে। দেখা

গেছে, ঘাবড়ে যাওয়া মানুষের হার্টে রক্ত চলাচলের পরিমাণ বেশি। ফলে তারা শরীরের দিক থেকে অনেকটা বেশি সুস্থ। আপনি যদি চান স্যার আপনাকে ওদের ওয়েবসাইটটা দিতে পারি। দেব?'

মন্মথ তালুকদার ঠোঁটের কোণে ক্রূর ধরনের হাসল।

'কাজের কথায় এসো সাগর।'

'অবশ্যই স্যার।'

'তোমার শর্ত জানাও।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমি মালঞ্চমালাদেবীর কাছে গিয়েছিলাম।'

'আমি জানি।'

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'অনুমান করছেন?'

'না, আমি জানি তুমি গিয়েছিলে। বিয়াল্লিশ মিনিট ছিলে। মালঞ্চ ছাদে যে রক গার্ডেন তৈরি করেছে সেখানে বসে কথা বলেছ। বেরোবার মুখেও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা হয়েছে।'

আমি নিজের মনেই হাসলাম। এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। এত টাকাপয়সা খরচ করে একজন মানুষ খুনি নিয়োগ করেছে, তারওপর নজরদারি থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। আমার পিছনে 'লোক' লাগানো হয়েছে। তবে ফ্ল্যাটের ভিতরের ঘটনাও জানে দেখছি। স্পাই তাহলে ভিতরেও আছে। মালঞ্চমালার সহকারী মেয়েটি? না, তাহলে মন্মথ এইভাবে আমাকে বলে দিত না।

'স্যার, আপনি যখন এতটা জানেন এটাও নিশ্চয় জানেন আমার সঙ্গে মালঞ্চমালাদেবীর কী কী কথা হয়েছে?'

মন্মথ এমন একটা হাসল, যার অর্থ হ্যাঁও নয়, নাও হয়।

'আমি কী জানি সেটা বড় কথা নয়, তুমি আমাকে জানাবে।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'ঠিক। আগে শর্তের কথাটা বলব নাকি আগে আপনার স্ত্রী কী বলেছেন সেটা জানাব।'

মন্মথ একটু নড়েচড়ে বসল। বলল, 'যেটা আগে বলা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করছ। সাগর, একটা কথা মনে রেখো, কাজটা তোমাকে এমনি এমনি দেওয়া হয়নি। আবার বলছি, এই শহরে পয়সা নিয়ে ভালবাসার লোক যেমন আছে, খুনখারাবি করবার লোকও

BanglaBook.org

আছে। তবু তোমাকে ডাকবার একটাই কারণ। তুমি এমন কিছু ভাববে যা প্রফেশনালরা পারবে না। তাদের মাথায় আসবে না। কিন্তু তার মানে এই নয়...এই নয় তুমি কোনো গেম খেলবে...।'

আমি ক্যাচ ধরার মতো করে বাগানবিদের এই কথা লুফে নিলাম। মুখটা শক্ত করে বললাম, 'আমার এটাই শর্ত। আমি খেলব এবং সেই খেলা আপনাকে মেনে নিতে হবে।'

'সেটা কীরকম?'

'খুব সহজ। যাকে বলে জলবৎ তরলং। অনেকদিন জীবন নিয়ে খেলেছি, এবার মৃত্যু নিয়ে খেলব। মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান। আমি ঠিক করেছি, এক বাগান পাগলের গান পাগল স্ত্রীকে আমি খেলাচ্ছলে হত্যা করব। আমার কাজ আমি কীভাবে করব সেটা আমার ইচ্ছে। আমি আপনার কাছে টাকা নেব আমার কাজের জন্য, আমার ইচ্ছেকে বিসর্জন দেবার জন্য নয়। সাগরের কিচ্ছু নেই, শুধু ইচ্ছে আছে। আমার শর্ত হল আমার খেলায় আপনি বাধা দিতে পারবেন না।' আমি একটু থামলাম। ফের বললাম, 'তাড়া নেই, আপনি ভাবতে পারেন। যদি মনে হয়, আমাকে দিয়ে কাজ করাবেন না তমালকে বলে দিতে পারেন।'

মন্মথ একটু চুপ করে থেকে মাথা নামিয়ে বলল, 'মালঞ্চমালার সঙ্গে তোমার কী কথা হয়েছে আমি কি জানতে পারি।'

'অবশ্যই জানতে পারেন। আমি যেমন তাকে খুনের কথা বলেছি, সেও আমাকে খুনের কথা বলেছে।'

'খুন! কাকে? আমাকে?'

'না, স্বপ্ন।'

'সাগর, তুমি কি হেঁয়ালি বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে।'

আমি গলা ঝাড়া দিয়ে বললাম, 'অবশ্যই বলব। মালঞ্চমালাদেবী আমাকে জানিয়েছেন, খুন-টুনে তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পান না। কারণ আপনি তার স্বপ্ন খুন করেছেন।'

মন্মথ মুখে চেহারা বদলাল। রাগ, অভিমান খেলে গেল যেন। নিজেকে সামলে বলল, 'কী ধরনের স্বপ্ন?'

আমি হালকা হাসলাম। বললাম, 'আপনি জানেন স্যার। তবে

সেটা আপনাদের বিষয়, এটা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার মাথাব্যথা আমার কাজ নিয়ে। ম্যাডাম বললেন, উনি আপনার "বিউটিফুল" লাটে তুলতে চান। আমি বললাম, খুব ভাল কথা। শুধু লাটে তুলবেন না, একেবারে বাঁধাছাঁদা করে তোরঙ্গতে এমনভাবে তুলে রাখুন যাতে মন্মথ তালুকদার আর কোনোদিন নাগাল না পায়।'

মন্মথ তালুকদার চোখ বড় করে বলল, 'তুমি বললে?'

'অবশ্যই বললাম। শুধু তা-ই বলিনি, বলেছি, এই কাজে যদি আমার সাহায্য লাগে আমাকে নিতে পারেন। আমি কম পয়সায় করে দেব। ভালই হবে। একটা কাজ করতে গিয়ে দুটো কাজ। ডবল রোজগার। স্যার, আমার মতো বেকার মানুষ বছরে ক-টা কাজ পায় বলুন?'

মন্মথ মাথা নামিয়ে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সাগর, তুমি খেলা শুরু করে দিয়েছ।'

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'হ্যাঁ, স্যার শুরু করে দিয়েছি। শুভেচ্ছা, জানান খেলায় যেন আমি জিততে পারি।'

মন্মথ মুখ না তুলেই বলল, 'তুমি কি রসিকতা করছ?'

'যা বলবেন। রসিকতা বললে রসিকতা, সিরিয়াস বললে সিরিয়াস। খেলা জিনিসটাকে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই। কবিগুরু খেলা নিয়ে কত গান লিখেছেন। খেলা ভাঙার খেলা। এরকম ফিলজফি ক-টা পাবেন?'

মন্মথ তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার মতো খেল। আমার কাজ হলেই হবে।'

চমৎকার। বিরক্ত পদ্ধতি কাজ করেছে। উৎসাহিত গলায় বললাম, 'তাহলে আমার শর্ত আপনি মেনে নিচ্ছেন?'

মন্মথ তালুকদার মুখে কিছু বললেন না। মাথা কাত করলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। মন্মথ অবাক হয়ে বলল, 'উঠে দাঁড়ালে! আমাকে তোমার প্ল্যান বললে না!'

আমি আরো অবাক হয়ে বললাম, 'সেকী স্যার! এতক্ষণ ধরে তাহলে কী বললাম? প্ল্যানই তো বললাম। এই যে আমি খেলব বললাম। খেলতে খেলতে কাজ করব। এটাই তো আমার প্ল্যান।'

BanglaBook.org

মন্মথ এবার ঝুঁকে পড়ে দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে বলল, 'মালাকে কীভাবে মার্ডার করবে?'

আমি হাই তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললাম, 'কীভাবে করলে ভাল হয়?'

'এটা ঠিক করা তো তোমার কাজ।'

আমি লজ্জা পাওয়া হেসে বললাম, 'না, একটা পরামর্শ নিচ্ছিলাম। আমি আপনার মিসেসের ফ্ল্যাট দেখে এসেছি। সিকিউরিটির বড্ড কড়াকড়ি। তারপরেও ভাবছি কাজ ওখানেই করব। দুম করে একদিন ঢুকে...।'

আমি চুপ করে গেলাম। মন্মথ তালুকদার চোখ সরু করে বলল, 'দুম করে ঢুকে কী? গুলি? নাকি ছুরি-টুরি ব্যবহার করবে। ওয়েপন ঠিক হয়েছে?'

আমি মাছি ওড়াবার ভঙ্গিতে মন্মথ তালুকদারের কথা উড়িয়ে বললাম, 'সেটা ঘটনার সময় দেখা যাবে। ছুরি, গুলি না গলায় ফাঁস সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, মোটিফ। খুনের মোটিফ কী হবে। অকারণে মেরে দিয়ে গেলে পুলিশ প্রথম আপনাকে সন্দেহ করবে।'

মন্মথ বিড়বিড় করে বলল, 'ঠিক ঠিক...।'

আমি আধখানা চোখ বুজে বললাম, 'আমি একটা ভেবেছি।'

'কী?' বউ খুনের ব্যাপারে মন্মথর আগ্রহ আমাকে মোহিত করে দিচ্ছে।

আমি মনে মনে ঝানু অপরাধী সাজবার চেষ্টা করলাম। ঝানু অপরাধীদের চেহারায় কি আলাদা কোনো বিশেষত্ব থাকে? মনে হয় না। বরং অপরাধী দেখলে, অবাক হতে হয়। ওমা! এমন ভদ্রলোকের মতো দেখতে! এই মানুষ এমন কাজ করতে পারে। ছি ছি। ভাবটা এমন যেন ছোটলোকের মতো দেখতে হলে অপরাধ করবার ব্যাপারে বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে। সত্যি কথা বলতে কী ভদ্রলোক-ছোটলোক চেহারা বলতে ঠিক কী বোঝা যায় তা স্পষ্ট নয়। এই বিষয়েও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন। খবরের কাগজের পাত্র চাই কলমে একদিন বিজ্ঞাপন বেরোবে—আমার একজন পাত্র চাই। ছোটলোকের

BanglaBook.org

মতো দেখতে হলেও চলবে। কিন্তু ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই বলে যারা বিজ্ঞাপন দেয় তাদের মতো ছোটলোক হলে চলবে না।

আমি মন্মথর দিকে মাথা এগিয়ে বললাম, 'স্যার, ভাবছি খুনের সঙ্গে ডাকাতিও রাখব।'

'মানে!'

'মানে ডাকাতির জন্য খুন। পুলিশ ধন্দে পড়বে। আপনার কথা মাথাতেই আসবে না। একজন শিক্ষিত, ধনী, শিল্পী মানুষ তো আর ডাকাতির ব্যবসা চালাতে পারে না।'

মন্মথর মনে হয় পছন্দ হল। বলল, 'মন্দ নয়।'

আমি আরো একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, সঙ্গে যদি রেপ রাখি? রেপ অ্যান্ড মার্ডার?'

মন্মথ সোজা হয়ে বসল। আমি ষড়যন্ত্র টাইপ মুখ করে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না আপনার স্ত্রী...তাছাড়া রেপ হলে কী হবে জানেন, আপনার ওপর কোনো সন্দেহ থাকবে না। স্বামী তো আর স্ত্রীকে রেপ করতে যাবে না। তা-ই না?' কথা শেষ করে আমি 'কেমন দিলাম' গোছের হাসলাম।

মন্মথ তালুকদার নিমেষে বদলে গেল। চোখ কঠিন। ঠোঁট কাঁপছে। চাপা গলায় বলে উঠল, 'ইউ স্কাউন্ড্রেল! ইউ...।'

আমি হেসে বললাম, 'খেলায় এত রেগে গেলে হয় স্যার?'

BanglaBook.org

পঁচিশ

আমার ঘরে আলো জ্বালানোর মন্ত্র আছে। শুধু সুইচ টিপলেই হয় না। মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। মন্ত্রটা এরকম—

ঘরের আলো জ্বাললে পরে ঘরের আঁধার মরে
তাতে যে ভাই মন ভরে না আরো কিছুর তরে।
সেই কিছুটাই আসল জানি, তারেই আমি মানি,
সেই আলোতে সরাতে চাই মনের আঁধারখানি।

মন্ত্র কীভাবে পড়া হবে সে ব্যাপারে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। মনে মনে পড়া যেতে পারে, আবার উচ্চস্বরে পড়া যেতে পারে। পড়বার সময় সুর দিলে সমস্যা নেই। আবার না দিলেও সমস্যা নেই। শুধু 'সেই আলোতে সরাতে চাই মনের আঁধারখানি' লাইনটা বলবার সময় মনে এবং শরীরে জোর দিতে হয়। পলকাভাবে বললে মন্ত্র কাজ করে না। ব্যস, তাহলেই ঘরের নিয়ন জ্বলে উঠবে।

সমস্যা হল, আমার মন্ত্রের কথা মানুষ বিশ্বাস করে না। তা নিয়ে আমার আপশোস নেই। যার বিশ্বাস তার কাছে। আমার বেশিরভাগ কথাই অন্যরা বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে, হয় আমি বাজে বকছি, নয় বানিয়ে বলছি। আসলে কথাকে গুরুত্বপূর্ণ করবার রহস্য লুকিয়ে থাকে ভঙ্গিতে। কথা আসল নয়, বলবার ভঙ্গিটাই আসল। কেউ যদি হাসিমুখে বলে, 'বাস উলটে গেছে,' মানুষ পাত্তা দেবে না। অথচ কেউ যদি গম্ভীর গলায় বলে, 'পা মচকে গেছে' সবাই 'গেল গেল' করে উঠবে। বিজ্ঞাপন যাঁরা বানান তাঁরা এই ফর্মুলায় চলেন। কী বলছি বড় কথা নয়, কীভাবে বলছি বড় কথা। আমার এটারই অভাব। কথা শিখেছি, কথা বলতে শিখিনি। ফলে যা বলি বেশিরভাগ মানুষই ভাবে 'ফালতু'। তবে তা নিয়ে আমার দুঃখ নেই। 'ফালতু' না থাকলে 'দামি' জিনিসের ফারাক বোঝা যেত না। কালো থাকলে

তবেই না সাদার কদর। মন্দ থাকলে ভালকে চেনা যায়। শুধু ভালর দাম কী? ফুটো পয়সা। টাকার দাম পড়ছে বলে ফুটো পয়সারও দাম কম। ঠিক সেরকমই, সাগর থাকলে তবেই না চারপাশের ধড়িবাজ, স্বার্থপর, লোভী মানুষজনদের চেনা যাবে।

যাইহোক, জ্ঞানের কথা থাক। লোকে বিশ্বাস না করলেও আমার আলোর মন্ত্র নিয়ে একবার খুব মজা হয়েছিল। মূল গল্পে যাওয়ার আগে মজাটা বলে নিই।

এক সন্ধেবেলা আকাশ কালো করে ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। আমি ভিজতে ভিজতে কুশলদার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। মানুষ লোকের বাড়িতে কী নিয়ে যায়? কমন জিনিস হল্ল মিষ্টি। যদিও আজকাল মিষ্টির ব্যাপারে খুঁতখুঁতানি শুরু হয়েছে। অনেকে খেতে চায় না। তা-ই ভাজাভুজি নিয়ে যাওয়ার হিড়িক বেড়েছে। মিষ্টি, নোনতা, ঝাল, তেতো আমি কখনোই কিছু নিয়ে যাই না। আমার কাছে এই ভদ্রতা কেউ আশা করে না। সেদিন কুশলদার বাড়িতে গেলাম হাতে দুটো বড় সাইজের বেগুন নিয়ে। নধর বেগুন। বৃষ্টির জল গায়ে পড়ায় মনে হচ্ছে, বেগুন দুটো হাসছে। বেগুন নিয়ে যাওয়ার কারণ আছে। কুশলদার গিন্নি সোহাগবউদি হলেন বেগুনি এক্সপার্ট। দুর্দান্ত বেগুনি বানাতে পারেন। বেগুনি ভাজার জন্য কোনো পুরস্কার-টুরস্কার থাকলে হাসতে হাসতে প্রাইজ নিয়ে আসতেন। ট্রফির গায়ে লেখা থাকত—'শ্রীমতী বেগুনি'। আমার ধারণা, বেগুন কাটা, বেসন ফেটানো, তাতে বেগুনের লম্বা লম্বা পিস চোবানো এবং শেষ পর্যন্ত তেলে ছাড়া—এই দীর্ঘ পরিক্রমার কোনো একটা অংশে সোহাগ বউদির বিশেষ কারিকুরি আছে। সেই কারিকুরি তিনি কাউকে বলেন না। আমি সোহাগবউদিকে বলেছিলাম, 'চল, আমি আর তুমি মিলে বেগুনির দোকান নিই। দোকানের নাম হবে ওনলি বেগুনি, লোনলি বেগুন। দেখবে ক-দিনে ফুলে ফেঁপে ঢাঁই হয়ে যাবে। গাড়ি বাড়ি হয়ে যাবে।'

সোহাগ বউদি বলল, 'দোকান চলবে না রে সাগর।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন! মানুষ এই চমৎকার বেগুনি কিনবে না? এইটুকু আত্মবিশ্বাস তোমার নেই!'

BanglaBook.org

সোহাগ বউদি একগাল হেসে বলল, ‘বেগুনির টেস্ট যে তখন এমন চমৎকার থাকবে না।’

আমি বললাম, ‘কেন? সবকিছু এ গ্রেড কোয়ালিটির কিনব। বেগুনের জন্য কাছাকাছি কোনো গ্রামে চলে যাব।’

সোহাগ বউদি বলল, ‘রান্না শুধু জিনিসের কোয়ালিটির ওপর নির্ভর করে না সাগর। কার জন্য বানাচ্ছি তার ওপরও নির্ভর করে। গাড়ি বাড়ির জন্য বানানো বেগুনি আর তোর জন্য বানানো বেগুনির মধ্যে বিরাট তফাত হয়ে যাবে।’

এরপর আর এই বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়। মনে মনে সোহাগবউদিকে পেন্নাম ঠুকে চেপে পেলাম।

সেদিন বেগুন নিয়ে গিয়েছিলাম ওই বেগুনির লোভে। সেদিন আবার সোহাগবউদির এক দূর সম্পর্কের বোন এসেছিল। ছিপছিপে লম্বাপানা মেয়ে। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। চোখদুটো বড় বড়। সুন্দর দেখতে হওয়ার কারণে খানিকটা নাক উঁচু ভাব। তারপর বুঝলাম শুধু সুন্দর দেখতে নয়, আরো কারণ আছে। সোহাগবউদি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

‘শ্রীমন্তী, সম্পর্কে আমার বোন হয়। কদিন পরেই বিয়ে করে আমেরিকা রওনা দেবে। যাওয়ার আগে আমাদের কাছে দুদিন থাকতে এসেছে।’

আমি বোকা ধরনের রসিকতা করে বললাম, ‘সুন্দরীরা সবাই দেশ ছেড়ে চলে গেলে তো খুব মুশকিল।’

‘কথার থেকে ভঙ্গি বড়’ সেই থিয়োরি অনুযায়ী, শ্রীমন্তী কোনো কথা না বলে, আলাপের গোড়া থেকেই ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, আমাকে মোটে তার পছন্দ হচ্ছে না। রসিকতা শুনে আমার দিকে কড়া চোখে তাকাল। কুশলদা ম্যানেজ দেবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে হেসে বলল, ‘যাবে না? তোদের মতো অপগণ্ড পুরুষে দেশ ভরে গেছে। সুন্দরীরা মনের মতো মানুষ পাবে কোথায়? এই পোড়ার দেশে মরতে থাকবে কেন?’

আমি বললাম, ‘অবশ্যই থাকবে না। সুযোগ থাকলে মনের মানুষের সন্ধানে আমিও বাইরে চলে যেতাম।’

BanglaBook.org

কুশলদা বলল, 'তোর মতো অলস, বেকারকে কোনো দেশ অ্যালাও করত না। ভিসাই পেতিস না। বিদেশে যাবার জন্য যোগ্যতা লাগে।'

আমি বললাম, 'এত হেয় জ্ঞান কোরো না কুশলদা। সেদিন বিজ্ঞাপন দেখলাম, জাপান কনসুলেট অলস মানুষ খুঁজছে। ওদের দেশে সবাই এত কেজো যে ওরা মুশকিলে পড়ে গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করছে, মা, অলস কেমন দেখতে? এই কারণেই ওরা বাইরে থেকে দেশে কয়েক পিস অলস ইমপোর্ট করতে চায়। যারা শুধু খাবে দাবে ঘুমোবে। মাঝেমধ্যে হেলতে দুলতে রাস্তা দিয়ে হাঁটবে। জীবনে কোনো তাড়া থাকবে না। ট্রেন ট্রেন ধরছি ভাব থাকবে না। ভাবছি অ্যাপ্লাই করব। শ্রীমন্তী তুমি কী বল?'

শ্রীমন্তী আবার কড়া চোখে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'এই চিপ রসিকতাগুলো বন্ধ করলে ভাল হয় না সাগরবাবু?'

মেয়েটা উঠেই যাচ্ছিল, সোহাগ বউদি গাদাখানেক বেগুনি এনে সামনে রাখতে ফের বসে পড়ল। আমি বললাম, 'বেশি করে খাও শ্রীমন্তী। বাইরে গেলে কবে আবার বেগুনি পাবে ঠিক আছে? ওসব দেশে মানুষ বেগুনি খায় না, ডলুনি খায়।'

শ্রীমন্তী এমন একটা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকাল যেন মানুষ দেখছে না। কুকুর বিড়াল দেখছে। কুশলদা বেগুনিতে কামড় দিয়ে বলল, 'ডলুনি! ডলুনিটা আবার কী?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'বেগুনির মতোই জিনিস। ডলার দিয়ে বানানো হয়। ভাল করে বেসনে চুবিয়ে কড়া তেলে ভাজতে হয়।'

কুশলদা আর সোহাগ বউদি গলা খুলে হেসে উঠল। শ্রীমন্তীর দাঁতে কড়মড় আওয়াজ পেলাম। আমি যদি মানুষ না হয়ে বেগুনি হতাম তাহলে এতক্ষণে কামড়ে খেয়ে, টিসুতে হাতের তেল মুছে নিত। খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই নানারকম গল্প গুজব হতে লাগল। শ্রীমন্তী সেই গল্পে খুব কমই অংশ নিচ্ছিল। যেটুকু যা বলছিল, সোহাগবউদির সঙ্গে বলছিল। সোহাগবউদি বলল, 'বড়লোক দেশে কাজকর্মে অনেক সুবিধে। সব যন্ত্রে হয়।'

BanglaBook.org

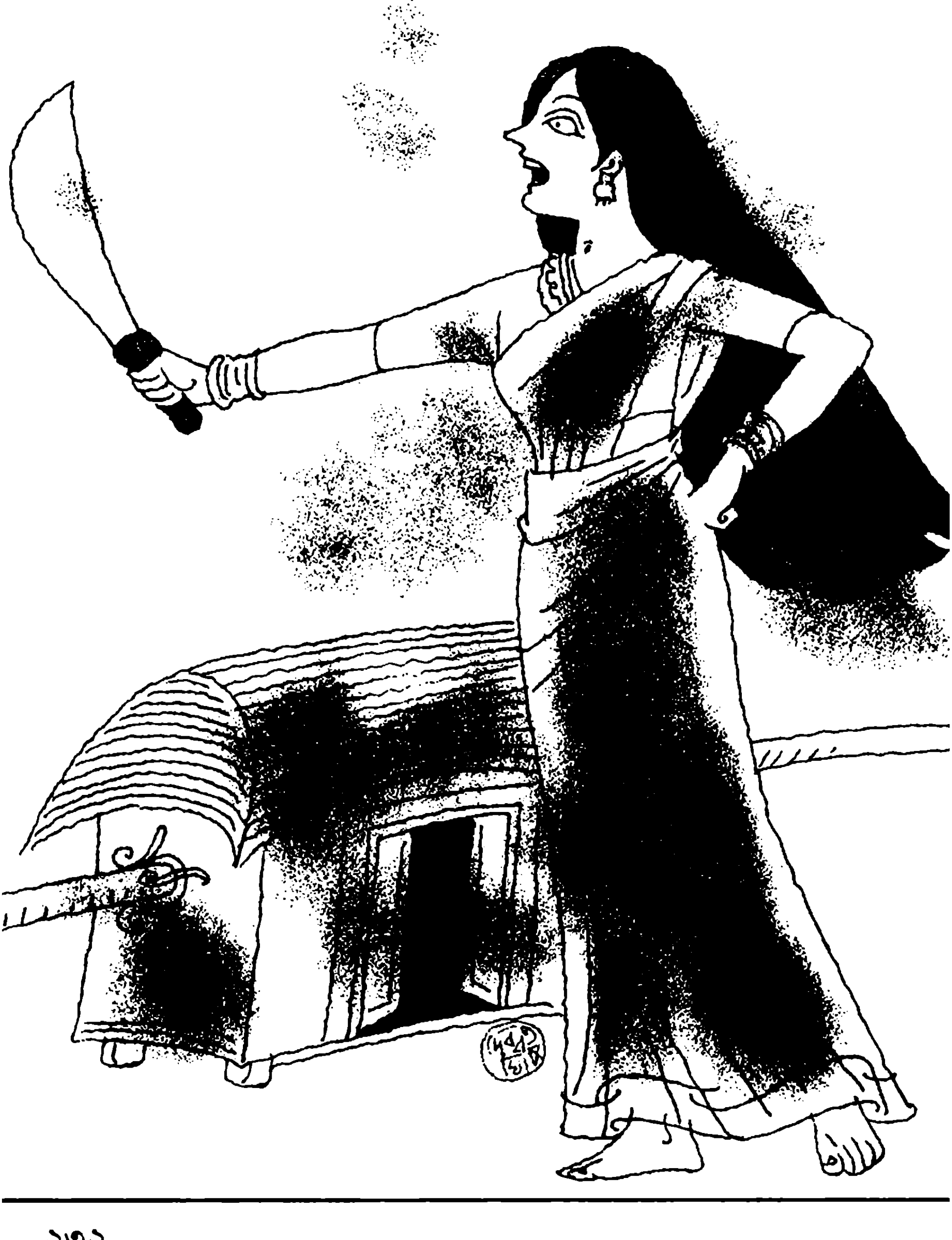

শ্রীমন্তী বলল, 'দিদি যন্ত্র থাকলেই তো হবে না, চালাতে হয়। তার খাটনি আছে। ও বলছিল, সারাক্ষণ খালি গাড়ি চালাও আর গাড়ি চালাও। সবকিছুই দূরে দূরে। তারপর ও বলছিল, অফিসে ঢুকে কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকো তো বসে থাকো। এই তো ও বলছিল, ঘরে থাকলে হয় মেশিন চালিয়ে ওয়াশিং, নয় মেশিন চালিয়ে ডাস্টিং। খুব পরিশ্রম গো মাসি দিদি।'

'ও' শব্দটা বলার পিছনে শ্রীমন্তীর মধ্যে একটা 'গদগদ' ভাব লক্ষ করলাম। আমি পাশে বসা কুশলদার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললাম, 'ও কে কুশলদা?'

কুশলদা হেসে বলল, 'শ্রীমন্তীর হবু বর।'

আমি নীচু গলায় বললাম, 'আচ্ছা। আমি ভাবলাম প্রেসিডেন্ট ওবামা।'

কুশলদা হো হো আওয়াজে হেসে উঠলেন। সোহাগবউদি ফিরে তাকালেন। বললেন, 'কী হল? হাসছ কেন?'

কুশলদা তাড়াতাড়ি বললেন, 'কিছু নয়। অ্যাই সোহাগ, শ্রীমন্তীকে সাগরের সেই আলো জ্বালানোর মন্ত্রটার কথা বল না। বল, মন্ত্র ভুলে গিয়ে ছেলেটা একদিন কী গাড্ডায় পড়েছিল। সারারাত অন্ধকার ঘরে ছিল।'

শ্রীমন্তী নড়েচড়ে বসল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আলো জ্বালানো মন্ত্র! সেটা কী ব্যাপার?'

আমি লজ্জা পাওয়া গলায় বললাম, 'ও কিছু নয়।'

সোহাগবউদি সহজ সরল মানুষ। একগাল হেসে বলল, 'তোদের যেমন যন্ত্র, সাগরের তেমন মন্ত্র।'

শ্রীমন্তী আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'মন্ত্রটা কী?'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'বলা যাবে না। মন্ত্র বাইরে বলার নিয়ম নেই।'

শ্রীমন্তী সোহাগ বউদির দিকে তাকিয়ে কটমট গলায় বলল, 'নিশ্চয় আরেকটা রসিকতা।'

'নারে, রসিকতা নয়। সাগরের ঘরে সুইচ টিপলে আলো জ্বলে না, সঙ্গে মন্ত্র বলতে লাগে।'

BanglaBook.org

শ্রীমন্তী কড়া গলায় বলল, 'দিদি তোমরা এসব বিশ্বাস কর? তোমরা কি পাগল?'

কুশলদা ঢোঁক গিলে বলল, 'বিশ্বাস করি না। কিন্তু ঘটনা সত্যি।'

শ্রীমন্তী বলল, 'কী করে বুঝলেন?'

'আমরা নিজে গিয়ে দেখে এসেছি।'

শ্রীমন্তী বলল, 'হয় বাজে কথা, নয়তো কোনো সেন্সর লাগানো আছে। কথা বললে সেন্সর কাজ করে।'

সোহাগ বউদি বলল, 'খেপেছিস? সাগরের আলো জ্বালানোর সুইচ বোর্ডে সেন্সর লাগানো থাকবে! থাকে ভাঙা তক্তাপোশে। পাখায় ঘটাং ঘটাং আওয়াজ। ঘরের ভাড়া বাকি তিনমাস। সে লাগাবে সেন্সর?'

আমি কোনো কথা না বলে মিটিমিটি হাসি মুখে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবার কথা শুনতে লাগলাম। শ্রীমন্তী বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না।'

এবার মুখ খুললাম। বললাম, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত শ্রীমন্তী। আমিও বিশ্বাস করি না।'

আমি যতবার 'শ্রীমন্তী' নামে নরম গলায় ডাকছি ততবার মেয়েটা কড়া চোখে তাকাচ্ছে। অন্য কেউ হলে বিচ্ছিরি অপমান করত। কুশলদা, সোহাগবউদির জন্য এই মেয়ে করতে পারছে না।

অপমানের বদলে শ্রীমন্তী এবার দুম করে এমন একটা কথা বলল, যাতে আমরা তিনজনেই চমকে গেলাম।

'সাগরবাবু, আমি যদি এখন আপনার বাড়ি যাই আমাকে আপনার মন্ত্রের কেরামতি দেখাতে পারবেন?'

আমি কুশলদা, সোহাগ বউদির মুখের দিকে তাকালাম। কুশলদা তাড়াতাড়ি বলল, 'তার দরকার নেই। তুমি আমাদের কথা বিশ্বাস কর।'

শ্রীমন্তী চোখ মুখ শক্ত করে বলল, 'অবশ্যই দরকার আছে। আমি যাব। শুধু আমি যাব না তোমরাও আমার সঙ্গে যাবে। তোমরা বোধহয় ভুলে গেছ, আমি শিবপুর থেকে ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে পাশ করেছি।'

BanglaBook.org

আমি এবার একটু ঘাবড়ালাম। শুধু সুন্দরী বা আমেরিকা বলে নয়, এই মেয়ের নাম উঁচু হওয়ার অনেক কারণ। মেয়ে বিদ্বানও। সোহাগ বউদি বলল, 'পাগলামি করিস না শ্রী।'

কুশলদা বলল, 'তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে।'

শ্রীমন্তী সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। তার ভঙ্গিতে জেদ। কুশলদার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখনই যাব। জামাইবাবু, গাড়ি বের করুন। একজন মিথ্যে বুঝিয়ে আপনাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে রাখবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। এই মানুষটির প্রতি আপনারা খানিকটা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এটা কাটানো দরকার।'

আমি মিনমিন করে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি স্বীকার করছি, আলো জ্বালতে মন্ত্র লাগে না। আমি মিথ্যে বলেছি। তাহলে হবে?'

শ্রীমন্তী ঠোঁটের কোনায় নিষ্ঠুর হাসল। বলল, 'না, তাহলে হবে না। আপনার মিথ্যে হাতেনাতে প্রমাণ হওয়া দরকার।'

সোহাগবউদি কাঁচুমাচু গলায় বললেন, 'কেন ছেলেমানুষি করছিস? বেশ গল্প-টল্প হচ্ছিল।'

শ্রীমন্তী 'চোর ধরা' টাইপ হেসে বলল, 'আমি রেডি হয়ে আসছি। জামাইবাবু গাড়ি বের করুন।'

আমার ঘরে তালা দেওয়া থাকে। কিন্তু সেই তালায় চাবি লাগে না। পাল্লায় চাপ দিলেই দরজা খুলে দেয়। তালাটা ফলস। এ খবর খুব কম মানুষই জানে। সেদিন ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, বেরোনোর সময় ফলস তালা লাগাতেও ভুলে গিয়েছি। তিনজন অন্ধকার ঘরে পা দিলাম। আমি ফিসফিস করে কথা বলতে থাকলাম—

'শ্রীমন্তী, দরজার ডানদিকে সুইচবোর্ড। প্রথমে তুমি মন্ত্র ছাড়া সুইচ টেপো। আলো জ্বলবে না। এরপর মন্ত্রটা বলতে বলতে সুইচ টিপবে। মনে রাখবে, সেই আলোতে সরাতে চাই মনের আঁধারখানি...লাইনটা বলবার সময় মনে জোর রাখবে। মনের জোর যেন শরীরে নেমে আসে। একটা বিন্দুতে মিলিত হয়। মন্ত্র অবহেলায় বললে কাজ দেবে না। অন্তর থেকে যেন আসে।'

শ্রীমন্তী চাপা গলায় আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ করুন।'

ঘটনা যা ঘটবার তার থেকে একটু বেশি ঘটল। মন্ত্র ছাড়া আলো

BanglaBook.org

জ্বলল না। মন্ত্র বলাতেও জ্বলল না। আমি বললাম, 'মন্ত্রপাঠে তুমি অবহেলা দেখাচ্ছ। মন থেকে বল, জোর দিয়ে বল।'

শ্রীমন্তী তা-ই করল এবং আলো জ্বলে উঠল।

সেই আলোতে দেখলাম, আমার ভাঙা তক্তাপোশে কে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে!

মুখে অস্ফুটে আওয়াজ করে শ্রীমন্তী আমার হাত চেপে ধরল।

BanglaBook.org

ছাব্বিশ

অভ্র হেসে বলল, 'উফ, তোমার ওই শ্রীমন্তী পার্টি যা ঘাবড়ে গিয়েছিল।'

আমি বললাম, 'ঘাবড়াবে না? অমন ভূতের মতো চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলে সবাই ঘাবড়াবে।'

অভ্র মজা পাওয়া গলায় বলল, 'তুমিও ঘাবড়েছিলে সাগরদা?'

'না, আমি ঘাবড়াইনি, তবে চিন্তা করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমার তালা-রহস্য যারা যারা জানে তাদের মধ্যেই কেউ শুয়ে আছে। ভাবছিলাম, সেটি কে?'

তক্তাপোশে পা গুটিয়ে অভ্র আর আমি অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম। বহু দিন পর ওর সঙ্গে দেখা হল। পাঁচ বছর তো হবেই। বেশিও হতে পারে। মনে আছে, তমালকে বলে আমি ওর একটা কাজের ব্যবস্থা করেছিলাম। জামশেদপুরের এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে জয়েন করল। পরে শুনেছিলাম, ভাল কাজ করছে। পদোন্নতিও হয়েছে। অভ্র চমৎকার ছেলে। কাজের ছেলে তো বটেই, তার ওপর মাথা উঁচু করে থাকে। মনে আছে ওকে নিয়ে যখন তমালের কাছে গিয়েছিলাম, বলেছিল, 'অনুগ্রহ করে আমাকে কোনোরকম দয়া দেখাবেন না। যদি কোথাও লোক প্রয়োজন হয় তবেই আমাকে রেফার করবেন।' এই সোজা কথা তমালেরও পছন্দ হয়েছিল।

'তোমার কথা না হয় বললাম, তারপর কাজ যদি না পারো? আমার তো লস অফ ফেস হবে।'

অভ্র বলল, 'আমি পারব। যদি কাজটা নিই তাহলে পারব। আর যদি বুঝতে পারি কাজটা আমার নয়, গোড়াতেই বাদ দিয়ে দেব। আপনি চিন্তা করবেন না, শুধুমাত্র একটা চাকরি করতে হবে ভেবে কোথাও ঢুকব না।'

BanglaBook.org

তমাল সময় নিয়েছিল সাতদিন। অভ্রর চাকরিটা হয়ে যায়। তমালের ওপর এত রাগারাগির পরও ওকে যে এত পছন্দ করি তার কারণ এটা। সে শুধু মানুষের উপকার করে না, যোগ্য মানুষকে চিনতে পারে। সেই তমাল যে কী করে একটা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল! অবশ্য শুধু তমাল কেন, আমিও তো আছি। একেই কি নিয়তি বলে? নিয়তি কাউকে বানায় রাজা, কাউকে বানায় ফকির। কেউ হয় খুনি, কেউ সাধু। যুক্তিবাদীরা অবশ্য অন্য কথা বলে। তারা বলে, নিয়তি বলে কিছু হয় না। জীবন অনেকটাই নিজে কন্ট্রোল করা যায়। তা-ই কি? কে জানে। আমি কোনোটাই পুরো বিশ্বাস করি না। আবার অবিশ্বাসও করি না। আমার মনে হয়, নিয়তি যেমন নেই, তেমন আছেও। তাকে যেমন কন্ট্রোলে রাখা যায়, তেমন আবার রাখা যায়ও না। চেষ্টা চলে অনর্গল। কেউ বিশ্বাস দিয়ে, কেউ যুক্তি দিয়ে। এটা একটা খেলার মতো। এই খেলায় মানুষ নিজেকে নিরন্তর ব্যস্ত রাখে।

আমি অভ্রকে বললাম, 'তোর কথাটা একদম মাথায় আসেনি। তুই আমার তালা-রহস্য জানলি কী করে? আমি তো ভেবেছিলাম, আজ বেরোনোর সময় তালা ঝোলাতে ভুলে গিয়েছি।'

'তুমি নিজেই একবার বলেছিলে। এখন ভুলে গেছ। তোমার সেই তালাতত্ত্ব আমি মনে রেখে দিয়েছিলাম। সেই তত্ত্ব কাজে লাগালাম।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'আমার তালাতত্ত্ব? সেটা আবার কী?'

অভ্র হেসে বলল, 'যা বাবাঃ সাগরদা, নিজের কথা নিজেই ভুলে মেরে দিয়েছ! স্বাভাবিক। তোমার মাথায় সারাক্ষণ এত থিয়োরি গিজগিজ করে যে সব মনে রাখা অসম্ভব। তুমি বলেছিলে, দুনিয়ায় সমস্ত তালাই মিথ্যে। অর্থহীন। চাবি ঘুরিয়ে, হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে, হাত দিয়ে ঠেলে, অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে খুলে ফেলা যায়। শুধু মনের ভিতর একবার তালা পড়ে গেলে বিরাট বিপদ। হাজার চেষ্টা করেও সে-তালা আর খোলা যাবে না। সুতরাং বাইরের তালা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সেই তালা খুলবেই। সাগরদা, আমিও তোমার

BanglaBook.org

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম, তালা খুলবেই। ঠিক করেছিলাম, খানিকটা অপেক্ষা করব, তারপর একটা থান ইঁট জোগাড় করে তালা ভাঙব। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, তালার খুব বেশি জোর হবে না। দুবার ঠুকলেই ঘটাং। তোমার ঘরে আছেটা কী যে তুমি জোরদার তালা লাগাবে? তার ওপর আবার আমার বেজায় ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। অনেকটা পথ জার্নি করেছি। তালাটা হাতে তুলে নাড়াচাড়া করে দেখছিলাম, ভাঙার জন্য ইঁট কত বড় লাগবে। আর তখনই বুঝতে পারলাম তালা ফলস। তোমার ঘর তোমার মতোই উন্মুক্ত। খোলামেলা। আমি দরজায় চাপ দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। তারপর সটান তোমার তক্তাপোশে। চাদর টেনে ঘুম। তোমরা ঘরে ঢুকে ঘাবড়ে-টাবড়ে একাকার।'

কথা শেষ, অভ্র খুব একচোট হাসল। আমি হাসলাম। সত্যি তা-ই। শ্রীমন্তী যেমন আমার হাত চেপে ধরেছিল, সোহাগ বউদির তো মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। আমাদের আওয়াজে অভ্র ধড়ফড় করে উঠে বসে। আমি চমকে উঠে বলি, 'অভ্র! অভ্র তুই কোথা থেকে?'

তারপর পরিস্থিতি নর্মাল হয়। মজার কথা হল, ভয় পাওয়ার কারণে শ্রীমন্তী অনেকটাই লজ্জিত হয়ে পড়ে। তার ওপর আবার হাত চেপে ধরেছিল। ভয় কী আশ্চর্য জিনিস! যাকে এতক্ষণ হেয়জ্ঞান করছিল, ভয়ের কারণে তার কাছেই আশ্রয়! ভালবাসাও কি কখনো কখনো এমন? নাকি উলটোটা? যার কাছে ছিল তাকেই একসময় হেয়জ্ঞান করতে শেখায়? হয়তো তা-ই। নইলে মন্মথ আর মালঞ্চমালার সম্পর্ক এরকম খুনোখুনিতে এসে ঠেকবে কেন? যাই হোক অভ্রর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পর আমি কুশলদাদের বললাম, 'তোমরা একটু বসো। আমি বেরিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।'

শ্রীমন্তী বলল, 'না না তার কোনো দরকার নেই। আমরা এখন যাব।'

আমি আপত্তি করলাম না। আমার ঘরে এত মানুষের বসবার জায়গা নেই। সোহাগবউদিও চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ওদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। গাড়ি রাখা আছে গলির মুখে। জলে কাদায় খানিকটা হাঁটতে হবে। টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে।

কুশলদারা হনহনিয়ে চলে গেল। শ্রীমন্তী আর আমি একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। গলা নামিয়ে বললাম, 'মন্ত্রের বিষয়টা আপনার বিশ্বাস হয়েছে তো?'

শ্রীমন্তী আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। তার দৃষ্টি বলল, সে বিভ্রান্ত। আমি হেসে বললাম, 'দয়া করে বিশ্বাস করবেন না। আসলে আমার আলোর সুইচটা নড়বড়ে। জোর না দিলে কানেকশন পায় না। তা-ই বলেছিলাম, যখন মন্ত্র বলবেন জোর দিয়ে বলবেন। মন আর শরীরের জোর দুটোই যেন একটা বিন্দুতে এসে মেলে। স্বাভাবিকভাবেই সেই জোর হতে আসে। সুইচে চাপ পড়ে। আলো জ্বলে ওঠে। ব্যস এইটুকুই, আর কিছু নয়।'

শ্রীমন্তী আমার দিকে আবার মুখ ফেরাল। সব মিলিয়ে সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কুশলদার ওখানে আমার ওপর রেগে যাওয়া, আলো জ্বালানোর মন্ত্র শোনা, আমার ভণ্ডামি ফাঁস করে দেবার ছেলেমানুষি ইচ্ছে, মন্ত্রে আলো জ্বলে ওঠা, তক্তাপোশে 'ভূত' দেখে আমার হাত চেপে ধরা—সবটাই মিলে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে এসেছিল দিদি জামাইবাবুর ঘোর কাটাতে, এখন মনে হচ্ছে সে নিজেই আটকে পড়েছে। বুদ্ধিমতী, শিক্ষিত এই তরুণীর এটাই কি নিয়তি ছিল? সাগর নামে এক গুড ফর নাথিং যুবকের ঘোরে আটকে যাওয়া?

শ্রীমন্তী বিড়বিড় করে বলল, 'আর মন্ত্রটা?'

আমি গদগদ গলায় বললাম, 'ওটা আমার বানানো। একদম ওরিজিনাল। মন্ত্রটা কেমন?'

'এই গল্পটা বলে আপনার কি লাভ হয় সাগরবাবু? সরল মানুষরা তো বিশ্বাস করে ফেলে। যেমন আমার মাসি...এটা কি একধরনের ঠকানো নয়?'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমি কাউকেই বলতে চাই না। বলিওনি তেমন কাউকে। খুব চেনাজানা দু-একজন ছাড়া কেউ এই মজাটা জানে না। আসলে কী জানো শ্রীমন্তী, এই মন্ত্র আমি আমার জন্যই বলি। নিজেকেই শোনাই। শুনিয়ে নিজের মধ্যে মনের আঁধার সরানোর ছটফটানি তৈরি করি।'

BanglaBook.org

শ্রীমন্তী বাকি পথটুকু চুপ করে রইল। গাড়িতে ওঠবার সময় বলল, 'মন্ত্রটা কি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন?'

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। গাড়ি রওনা দিল। মন্ত্র পাঠাব না। পাঠানোর দরকারও হবে না। মনের ভিতর আলো জ্বালাবার মন্ত্র এই সুন্দর মেয়ে নিজেই নিজের মতো করে খুঁজে নেবে।

আমি অভ্রকে বললাম, 'কাজকর্ম কেমন চলছে?'

অভ্র হাই তুলে বলল, 'খুব ভাল।'

আমরা হোটেল থেকে রুটি আর চিকেন খেয়ে এসেছি। সঙ্গে স্যালাড। হোটেলের কর্মচারীরা তো অবাক। বলাবাহুল্য বিল মিটিয়েছে অভ্র।

আমি বললাম, 'বাঃ, ভাল হলেই ভাল।'

অভ্র বালিশটা মাথার পিছনে টেনে বলল, 'সাগরদা, চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এলাম।'

অন্য কেউ হলে আঁতকে উঠত। পরিচিত লোক ভাল চাকরি ছেড়ে দিলে, আঁতকে ওঠাটাই স্বাভাবিক। আমি বললাম, 'ভালই করেছিস।'

অভ্র হেসে বলল, 'জানতাম তুমি এই কথাটাই বলবে। সেই কারণেই তো কলকাতায় এসে এখনও অন্য কোথাও যাইনি, সটান তোমার কাছে চলে এসেছি।'

'এখন কী করবি?'

'ভাবিনি।'

'ক-টা দিন সাগরজীবন যাপন কর। খাওয়াদাওয়া কর আর ঘুমোও।'

অভ্র সামান্য হেসে বলল, 'ভাঁড়ার ফুরিয়ে গেলে কী হবে?'

আমি মেঝেতে মাদুর পাতলাম। আজ আমি নীচে শোব, ভাঙা তক্তাপোশে রাত কাটাবে অতিথি।

'সাগরজীবনে ভাঁড়ার ফুরোয় না। জুটে যায়।'

অভ্র বলল, 'সবাই তো আর সাগর হয় না। চাকরি কেন ছাড়লাম জানতে চাইলে না?'

আমি মাদুরে চিত হয়ে বললাম, 'তোর চাকরি তুই ছেড়েছিস,

BanglaBook.org

আমি কারণ জেনে কী করব? তবু যদি ইচ্ছে হয় বলতে পারিস। আবার নাও পারিস।'

অভ্র সংক্ষেপে যা জানাল তা হল, তার অফিস তাকে একটা বড় ধরনের চুরিতে অনুমতি দিতে বলেছিল। সে ছিল কোয়ালিটি কন্ট্রোলার। এই চুরিতে রাজি হলে কাজটাই বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারত। কোম্পানি বলেছিল, 'তাতে তোমার কী? বাড়ি তৈরি করে তো আমরা বিক্রি করে দেব। ঘাড় থেকে দায় নেমে যাবে।' অভ্র রাজি হয়নি। তারপরও চাপ বাড়াতে ইস্তফার চিঠি জমা দিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরেছে।

আমি হাই তুলে বললাম, 'পুরোনো দিনের বাংলা সিনেমা। বিয়ে করেছিস?'

'করব ভেবেছিলাম। এখন তো পিছিয়ে দিতে হবে।'

'কেন? পিছিয়ে দিবি কেন! বিয়ের সঙ্গে চাকরির কী সম্পর্ক?'

'রূপরেখাও তা-ই বলছিল।'

আমি বললাম, 'রূপরেখা কে!'

'যাকে বিয়ে করব।'

আমি বললাম, 'তাহলে অসুবিধে কী? করে ফেল। আমরা হইচই করে নেমন্তন্ন খাব। অ্যাই, শ্রীমন্তীকে কিন্তু নেমন্তন্ন মাস্ট। ওই পাকা মেয়ে নিশ্চয় কখনো ভূতের বিয়ে দেখেনি।'

অভ্র হেসে উঠল। বলল, 'বিয়েরই ঠিক হল না, তুমি একেবারে নেমন্তন্নের লিস্ট বানিয়ে ফেললে সাগরদা?'

আমি বললাম, 'ওটাই আসল। বেকার থাকতে থাকতে বিয়েটা সেরে ফেল অভ্র। তুই যা কাজের ছেলে বেশিদিন বসে থাকতে হবে না। বেকার অবস্থায় নতুন বউকে যতটা সময় দিতে পারবি, অন্য সময় পারবি না। রূপরেখা কিছু করে? নাকি তোর মতো বেকার?'

অভ্র লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, 'রূপরেখা গান করে।'

আমি অন্ধকার সিলিঙের দিকে তাকিয়ে পা নাড়াতে নাড়াতে বললাম, 'খুব ভাল। ভেরি গুড। কী ব্যাপার বল তো অভ্র? ক-দিন ধরে এত গানের মধ্যে ঢুকে পড়েছি কেন?'

BanglaBook.org

অভ্র খানিকটা উঁচু হয়ে বলল, 'গানের মধ্যে ঢুকে পড়েছ মানে! তুমি কি গান-বাজনা করছ নাকি?'

আমি হেসে বললাম, 'তা একরকম বলতে পারিস। গান-বাজনাই বটে। জীবন-মৃত্যুর গান-বাজনা।'

'হেঁয়ালি করছ কেন? কী হয়েছে?'

আমি আপনমনে বললাম, 'হেঁয়ালিই বটে। তবে ধীরে ধীরে জট খুলছে। পুরোটা খুলতে মনে হয় আর বেশিদিন লাগবে না।'

অভ্র তক্তাপোশ থেকে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কী বেশিদিন লাগবে না?'

'সবটা পরিষ্কার হতে।'

'সাগরদা তুমি কিন্তু আরো গোলমাল করে দিচ্ছ। কী হয়েছে খুলে বল।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'বলব। আর একটু অপেক্ষা কর।'

অভ্রকে না বললেও জট যে খুলছে আমি বুঝতে পারছি। নইলে রেপের কথা শুনে মন্মথ তালুকদার সেদিন অমন খেপে যেত না। আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, খুনের কাহিনি বানানো। মন্মথর রাগে সেটা স্পষ্ট হল। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম যে পথে হাঁটছি সেটাই ঠিক। সেটাই কাজ দেবে। মন্মথ গাল দেবার পরও রাগে ফুঁসেছে অনেকক্ষণ। শেষপর্যন্ত রাগ সামলে আমাকে বলল, 'এই ধরনের রসিকতা আর যেন না শুনি। তুমি কথা কম বলে কাজ কর। আমার হাতে বেশি সময় নেই।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে স্যার, তা-ই হবে। খুনের পরিকল্পনার অংশ আপনাকে আর বলব না। কিন্তু আমি যা বলব আপনাকে করতে হবে।'

'কী করতে হবে?' মন্মথ সন্দেহের চোখে তাকাল।

আমি বললাম, 'সময় হলে বলে দেব।'

রাতে অভ্র একটা মারাত্মক খবর দিল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

BanglaBook.org

সাতাশ

দরজায় গায়ে একটা কাগজ লাগানো। তাতে প্যাস্টেল দিয়ে এলোমেলো হাতে ছবি আঁকা। খাঁচার ভিতর একটা পাখি মুখ গোমড়া করে বসে আছে। আমি মনে মনে বললাম, 'বাঃ'। পাখির মুখে গোমড়া ভাব ফোটানো সহজ কথা নয়। বড় বড় আর্টিস্টরা পারবে কিনা সন্দেহ। এই আর্টিস্ট পেরেছে।

আমি এসেছি পাখিদের বাড়ি। পাখি আমাকে চিঠি পাঠিয়েছে। সুদর্শনদা অফিসে যাবার পথে মেয়ের সেই চিঠি আমার ডাল ভাতের হোটেলে পৌঁছে দিয়েছে। খেতে গিয়ে চিঠি পেলাম। তিন-চার লাইনের চিঠি—

'সাগরকাকু, সাইক্লিং করতে গিয়ে পা ভেঙেছি। বিছানায় চিতপটাং। পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্লাস্টার। অনেকেই আমাকে দেখতে আসছে এবং আমার পায়ের প্লাস্টারে শুভেচ্ছাবাণী লিখে দিয়ে যাচ্ছে। তুমি এখনো আসোনি। শিগগিরই এসো। নইলে দুনিয়ার এক নম্বর সুন্দরী কিশোরীর পায়ের প্লাস্টারে শুভেচ্ছাবাণী লেখা থেকে বঞ্চিত হতে হবে।'

দুনিয়ার এক নম্বর সুন্দরী কিনা জানি না, সুদর্শন, নিবেদিতার এই কন্যাটি যে অতি চমৎকার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাইরে ভিতরে সবদিক থেকে চমৎকার। আমার মনে হয়, এই মেয়ের ভিতরটা বেশি সুন্দর। কম বয়েসে যতই রংচঙ মেখে সুন্দর সাজো, ভিতর লড়ঝড়ে হলে ধরা পড়ে যায়। গাড়ির ইঞ্জিনের মতো। খানিকটা যাওয়ার পর মুখ থুবড়ে পড়ে। আর ইঞ্জিন যদি টগবগে হয় তাহলে গায়ে ধুলো কাদা লেগে থাকলেও ক্ষতি হয় না। বেশি বয়েসে আবার এই সমস্যা নেই। বহু পচা, রদ্দি মানুষকে দেখেছি দামি পোশাক পরে 'সুন্দর' সেজে দিব্যি করে কম্মে খাচ্ছে। আজকাল ভাল

BanglaBook.org

ছেলেমেয়ের সংজ্ঞা বদলে গেছে। আগে বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের বলত, 'দেখ, দেখ পাশের বাড়ির নন্তু বৃত্তি পরীক্ষায় জলপানি পেয়েছে। লেখাপড়া করতে ওকে আর একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না।' আর এখন? এখন গর্বের ব্যাপার হল নন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাচ্ছে। খরচ যত বেশি ছেলেমেয়ে তত ভাল। খরচ যদি আরো আরো বেশি হয়, ছেলেমেয়ে তাহলে আরো আরো বেশি ভাল। একটা সময় ছিল যখন ছেলেমেয়ে অঙ্ক পারলে মাস্টারমশাইরা খুশি হতেন। সবাই বলত, 'গুড বয়। অঙ্কে ফুল মার্কস পেয়েছে।' সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম লিখেছে—অঙ্ক পড়বার ছেলেমেয়ে কমে যাচ্ছে। নামিদামি কলেজেও অঙ্কের স্টুডেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। আসন ভর্তি হয়নি। সমীক্ষা বলছে, ভাল ছেলেমেয়েরা আজকাল অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করে না। তারা প্রায় সবাই ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। বোঝো কাণ্ড! এই কারণে আমি খবরের কাগজ পড়ি না। মন খারাপ করে দেয়। ভাল ছেলেমেয়েরা অঙ্ক পড়বে না। তারা কি শুধুই অন্য অঙ্ক কষবে? নিজেদের বেতনের অঙ্ক? যে চাকরিতে মোটা বেতন সেটাই করব। পরের প্রজন্ম অঙ্ক শিখবে কাদের কাছ থেকে? ভাল মাস্টার দিদিমণি ছাড়া হবে? দেশে তাহলে ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, হিসেব পরীক্ষক হবে কী করে? অঙ্ক না জেনে? চিত্তবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। চিত্ত মণ্ডল। স্কুলে পড়বার সময় মানুষটার কাছে অঙ্ক শিখতাম। সাদামাটা মানুষ। শীত পড়তে না পড়তে হাফ হাতা সোয়েটার গায়ে দিয়ে ফেলতেন। গলায় মাফলার। সাইকেল চালিয়ে কেষ্টপুর থেকে অঙ্ক টিউশন করতে বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। অঙ্ক মাস্টাররা ছাত্রদের কাছে হয় বিভীষিকা। চিত্তবাবু ছিলেন প্রিয়। কামাই করলে ভাল লাগত না। আমার মতো গাধাকে পর্যন্ত এই উনি বেশ খানিকটা অঙ্ক শিখিয়ে ছেড়েছিলেন। উইদাউট চড় অ্যান্ড কানমলা! পরে খবর পেয়েছিলাম, ভদ্রলোক ক্যান্সারে মারা গেছেন। জীবনে বহু তাবড় তাবড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, সাংবাদিক, লেখক, বড় চাকুরেকে ভুলে মেরে দিয়েছি, চিত্ত মণ্ডলকে ভুলিনি। একজন সত্যিকারের মানুষের এর থেকে আর বেশি কী চাই?

বর্তমান লেখাপড়া বিষয়ে আমার বিশেষ জানবার কথা নয়।

লেখাপড়া থেকে আমি বহুদূরের মানুষ। চিরকালই পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া ছেলে। সেদিন টালিগঞ্জে বসে এ সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধি হল। ট্রামডিপোর পাশে বসে তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, গাদাখানেক মহিলা আর দুই না তিনজন পুরুষ দোকানে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিল। বেঞ্চে বসল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তা দুশ্চিন্তা ভাব। আমি অবাক হলাম। গণদুশ্চিন্তা! চায়ের দোকানের ছেলেটাকে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলাম, 'ব্যাপার কী? এরা কারা?'

'এরা বাবা-মা।'

বাবা-মা! একটু পরে বুঝতে পারলাম, ঘটনা তা-ই। বাবা, মা-ই বটে। ছেলেমেয়েকে মাস্টারের কাছে টিউশন করতে ঢুকিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কান খুলে কিছু কথাবার্তা শুনলাম। নাটকের মতো! আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হল। এই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা, সন্তান 'মানুষ' করতে পিতামাতার পরিশ্রমের কথা জেনে চমকে চমকে উঠলাম। সুযোগ যখন পেয়েছি সেইসব সংলাপের খানিক খানিক বলে নিই।

BanglaBook.org

এক নম্বর মা—ছোটছেলেটাকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি।

দু নম্বর মা—কেন?

এক নম্বর মা—বাঃ, চিন্তা করব না? তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে চিন্তায় নেই?

তিন নম্বর মা—ছেলেমেয়ে নিয়ে আমরা সবাই চিন্তায় থাকি কিন্তু তোমার চিন্তাটা বেশি মনে হচ্ছে।

এক নম্বর মা—ঠিকই। কাল থেকে চিন্তা বেড়েছে। শর্মি কাল গুজরাট চলে গেল।

চার নম্বর মা—শর্মি কে?

এক নম্বর মা—আমার বড়জায়ের ছোটবোন।

পাঁচ নম্বর মা—গুজরাট কেন গেল? বিয়ে না চাকরি?

এক নম্বর মা—দুর, তাহলে কী আর চিন্তা ছিল?

দুনম্বর মা—তাহলে?

এক নম্বর মা—শর্মি গেল পড়তে।

তিন নম্বর মা—সে তো ভাল কথা। পোড়ার বাংলায় না থেকে সোনার গুজরাটে চলে গেছে। কলেজের নাম কী?

এক নম্বর মা—নতুন কলেজ। এখনো নাম ফাইনাল হয়নি। নিউ কলেজ বলে চালাচ্ছে। খুব ডিমান্ড। আমার বড়ছেলে বলল, নেটে হাই র‍্যাঙ্কিং পেয়েছে। এখন তো ভাল মন্দ সবই নেটে ঠিক হয়।

দুনম্বর মা—তাহলে আর কিসের চিন্তা।

এক নম্বর মা—সেটাই তো চিন্তার। চিন্তা আমার বড়ছেলেকে নিয়ে। ওকে সাউথে পড়তে পাঠালাম মোটে বাইশ লক্ষ দিয়ে, এদিকে ওই মেয়েকে দিতে হয়েছে বত্রিশ। দশ লাখ টাকার ডিফারেন্স। আমি যদি আগে জানতাম, বড়ছেলেকেও ওখানে দিতাম। দশ লাখের ডিফারেন্স তো আর এমনি এমনি নয়। নিশ্চয় কারণ আছে। পাশ করলে চাকরিও তেমন হবে। ইস, খুব ভুল করেছি। আমি এখন থেকেই ভেবে রেখেছি, ছোটটাকে ওখানেই পাঠাব। আমার কর্তাও তা-ই বলেছে। ছেলে যখন ভাল তখন পিছনে খরচও করতে হবে বেশি। কিপটেমি করলে চলবে না।

এক নম্বর বাবা—যে কলেজের এখনো নামই ঠিক হয়নি, তার জন্য এত টাকা খরচ করা কি ঠিক হবে?

দুনম্বর বাবা—আলবাত ঠিক হবে। নাম দিয়ে কী হবে? প্লেসমেন্টটাই আসল।

তিন নম্বর বাবা—চাকরিবাকরির অবস্থা ভাল নয়। গাদা গাদা টাকা খরচ করে ইঞ্জিনিয়ার হয়েও বেকার বসে থাকছে।

এক নম্বর মা—সেইজন্যই তো বেশি টাকা ঢালতে হবে। এই দেশে না হলে বাইরে গিয়ে যেন চাকরি পায়।

তিন নম্বর বাবা—শুধু টাকা ঢাললেই তো হবে না। টাকাটা যাতে ফেরত হয় সে-হিসেবও করতে হবে। ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে লেখাপড়া করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে বিপদ। লোন শোধ হবে না।

দুনম্বর মা—আমার কর্তার অফিসে একজন বিপদে পড়েছে।

এক নম্বর মা—অত বিপদের কথা ভাবলে মুশকিল। ব্যবসায় চোখ কান বুজে টাকা ঢালতে হয়। যত গুড় তত মিষ্টি।

আমার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। এরা সব বলছে কী!

BanglaBook.org

এত লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ানো! তাও পড়বার জন্য পড়া হলে একটা কথা ছিল, এ তো বিজনেস! লেখাপড়ার হাল এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে!

পাখি এখনও এসবের মধ্যে ঢোকেনি। ঢুকবেও না। সবে হায়ারসেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছে। বাবা-মাকে জানিয়ে দিয়েছে, টাকা পয়সা খরচ করে সে কিছুতেই পড়বে না। রেজাল্ট যেমন হবে তেমন পড়বে। মাথার ওপর লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবার কোনো শখ তার নেই। বাবা-মায়েরা বুক ফুলিয়ে বলবে, 'আমার মেয়ে অমুক জায়গায় তমুক পড়ছে', এদিকে টাকার জন্যে এখানে ওখানে হাত পেতে বেড়াবে সেটা চলবে না। নিজের যোগ্যতায় লেখাপড়া শিখে যদি প্রাইমারি স্কুলেও চাকরি করে তাতে ক্ষতি নেই। ঋণ করে ঘি খেতে সে রাজি নয়। নিবেদিতা মেয়ের এই ঘোষণায় খুবই ব্যথিত। নিজের কেরিয়ার নিয়ে একমাত্র মেয়ে যদি এরকম জেদ ধরে তাহলে ব্যথিত না হয়ে উপায় কী? সে সর্বদাই মুখ গোমড়া করে থাকে। গাধা মেয়ে কোথাকারে। টাকা কি তোকে জোগাড় করতে হবে? টাকা তো তোর বাবা এনে দেবে। পরে রোজগার করে সেই টাকা শোধ করবি। এতে সমস্যা কোথায়? পাখি নাকি বলেছে, 'সমস্যা আছে। বুঝবে না, আমি টাকা খরচ করে ভাল মেয়ে সাজতে রাজি নই।'

এই মেয়েকে চমৎকার না বলে পারা যায়?

পাখির ঘরে ঢুকে দেখি, মেয়েটা সত্যি চিতপটাং। হাফপ্যান্ট পরে বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে। ডান পায়ে প্লাস্টার। প্লাস্টারের ওপর নানা রঙে হরেক লেখা আর ছবি। আমাকে দেখে পাখি বড় করে হাসল। গলা নামিয়ে বলল, 'দরজাটা বন্ধ কর, তোমার সঙ্গে গোপন কথা আছে সাগরকাকু।'

দরজা বন্ধ করে এসে খাটের ওপর বসলাম। বললাম, 'পাখি খাঁচায় আটকে পড়েছে?'

পাখি বলল, 'হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছ না?'

'তোর মতো ছটফটে মেয়ের জন্য ভাল শাস্তি।'

পাখি কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'ইস, ভেবেছিলাম পরীক্ষার পর কত

BanglaBook.org

মজা করব। সব প্ল্যান ভেস্তে গেল। সবাই আহা উহু করছে তাতে আরো অসহ্য লাগছে।'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'আমি করছি না। হাত পা ভাঙা ভাল। কিছুদিন আগে আমি একটা চান্স মিস করেছি।'

পাখি অবাক হয়ে বলল, 'কী চান্স?'

'হাত পা ভাঙার চান্স। এক নেতার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি রাগ করলে হাত পা ভেঙে দেন। খুব আশা করেছিলাম, আমারটাও দেবেন। হল না। গোলমাল হয়ে গেল। পরে গল্পটা বলব।'

পাখি হেসে বলল, 'সাগরকাকু, তোমার জীবনে কি সবই গোলমাল হয়ে যায়?'

আমি দার্শনিক ভঙ্গি করে বললাম, 'না। আমার জীবনে সবই ঠিকঠাক ঘটে। কীভাবে পা ভাঙলি সেটা বল।'

'দীপম ভেঙে দিয়েছে।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'দীপমটা কে?'

পাখি গলা নামিয়ে বলল, 'আমার বয়ফ্রেন্ড।'

'প্রেম করিস?'

পাখি খুব সহজভাবে বলল, 'আমি করি কিনা জানি না। দীপম ইডিয়টটা করে। খুব জ্বালায়।'

পাখি আমাকে চিরকালই বন্ধুর মতো দেখে। ফলে প্রেমের কথা বলতে দ্বিধার কোনো ব্যাপার নেই। থাকবেই বা কেন? ছেলেমেয়েরা এই বয়েসে প্রেম করবে না তো কবে করবে? পরে দরকচা মেরে যায়।

আমি বললাম, 'ইডিয়ট ছেলেটা কি তোকে ঠেঙিয়েছে? সে তোর পা ভাঙল কী করে?'

পাখি মুখ ভেটকে বলল, 'ইস, আমাকে ঠেঙাবে...দেব না ঘাড় মটকে...।'

আমি বললাম, 'তাহলে? তাহলে সে তোর পা ভাঙল কী করে?'

'সাইক্লিং করছিলাম, এমন সময় ফোন করে ঝগড়া শুরু করল। গর্তে পড়ল চাকা, ব্যস হুড়মুড় করে পড়লাম। সাইকেলটা পড়ল ডান পায়ের ওপর। এটা অন্যায় কিনা তুমি বল সাগরকাকু।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, ‘খুব অন্যায়। ঝগড়ার বিষয় বলা যাবে?’

পাখি একবার আমার দিকে তাকিয়ে চট করে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, ‘না। সিক্রেট।’

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ‘তাহলে তো বেশি অন্যায়।’

‘সাগরকাকু, আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই।’

‘খুব ভাল সিদ্ধান্ত। ডেকে এনে পা ভেঙে দে।’

পাখি উৎসাহের ভঙ্গিতে বলল, ‘সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। বাবা-মা কোথা থেকে যেন দীপমের খবর পেয়ে গেছে। আমরা দুজনে কবে কফিহাউসে বসেছিলাম, বাবার এক কবি বন্ধু দেখে ফেলেছে। দেখে বাবাকে রিপোর্ট করেছে।’

আমি বেদনাকাতর গলায় বললাম, ‘ছি ছি একজন কবি এই কাজ করতে পারল!’

পাখি বলল, ‘দীপমের এই বাড়িতে আসা নিষিদ্ধ।’

‘তাহলে সমস্যা। তুই প্রতিশোধ নিবি কী করে?’

পাখি হাসি হাসি মুখে ফিসফিস করে বলল, ‘একটাই পথ পেয়েছি। কাল ডাক্তারের কাছে চেক আপে যাওয়ার কথা। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। সেখানে ইডিয়টটাকে আসতে বলব। আমি জানি তুমি ঠিক বাবা-মাকে ম্যানেজ করতে পারবে। পারবে না? প্লিজ সাগরকাকু, একমাস দেখা হয়নি।’ পাখির চোখ চকচক করছে।

আমি হেসে বললাম, ‘এটা কোনো ব্যাপারই না। অবশ্যই পারব। তোর বাবা-মা দুজনেই খুশি হবে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব। কিন্তু একটা শর্ত আছে পাখি।’

পাখি চোখ বড় বড় করে বলল, ‘কী?’

‘দরজার ছবিটা বদলে ফেলতে হবে। পাখির মুখ করতে হবে হাসি হাসি। তুই বরং এক কাজ কর, পাখিটার মুখে হাসি দিয়ে দে।’

পাখি হাসতে লাগল। আমি ওর মা-বাবাকে ম্যানেজ করতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

আটাশ

'...আমি তোমাদের সকলকে অনেক দুঃখ দিয়েছি এবং দুঃখ পেয়েছি। আমার মনের মধ্যে কোথাও একটা ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা থাকবে না। তোমরা যখন ফিরে আসবে তখন দেখতে পাবে আমি নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছি। আমার সেই স্থানটি হচ্ছে বিশ্বের বাতায়নে, সংসারের গুহার মধ্যে নয়। তোমাদের সংসারকে তোমরা নিজেদের জীবন দিয়ে এবং পূজা দিয়ে গড়ে তুলবে—আমি সন্ধ্যার আলোকে নিজের নির্জন বাতায়নে বসে তোমাদের আশীর্বাদ করব।

আমাকে তোমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকবে না—ঈশ্বর তার থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। সংসার যাত্রার যা কিছু উপকরণ সে আমি তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার সঙ্গে তোমাদের বিনা প্রয়োজনের সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের টানে তোমরা আমার কাছে যখন আসবে তখন হয়তো আমি তোমাদের কাজে লাগব।

তোমাদের পরস্পরের জীবন যাতে সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা রেখো। মানুষের হৃদয়ের যথার্থ পবিত্র মিলন, সে কোনোদিন শেষ হয় না—প্রতিদিন তার নিত্য নতুন সাধনা। ঈশ্বর তোমাদের চিত্তে সেই পবিত্র সাধনাকে সজীব করে রেখে দিন এই আমি কামনা করি।...'

এই পর্যন্ত পড়ে আমি থামলাম। মুখ তুলে মুচকি হেসে বললাম, 'এই চিঠি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা সবাই জানি, আচ্ছা, বলো তো চিঠিটা কাকে লেখা হয়েছে?'

অভ্র হাই তুলে বলল, 'তাও সবাই জানে সাগরদা। চিঠিটা লিখেছিলেন প্রতিমাদেবীকে। কিন্তু তুমি হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি নিয়ে পড়লে কেন?'

'ভাবছি, চিঠিটা কপি করে মন্মথ তালুকদার আর মালঞ্চমালার কাছে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। সংসার, মিলন কথাগুলো যদি ওদের টাচ করে।'

অভ্র বলল, 'কচু করবে। দুজনেই যেমন তেড়েফুঁড়ে আছে, তাতে কোনো কথাই ওদের ছোঁবে না। তুমি যে প্ল্যানটা করেছ একমাত্র তাতেই...।'

অভ্র আমার কাছে রয়ে গেছে। সে বাড়ি যেতে চেয়েছিল, আমি তাকে ছাড়িনি। মালঞ্চমালা হত্যাকাণ্ডে তাকে আমার দরকার। দুনিয়ার সব গোয়েন্দার সহকারী আছে, খুনিরও থাকা উচিত। আমরা ভাগ করে ভাঙা তক্তাপোশে শুচ্ছি। খাওয়াদাওয়ার দায়িত্বে অভ্র। আমি আপত্তি করেছিলাম।

'দোকানে আমার ধারের ব্যবস্থা আছে।'

অভ্র বলল, 'থাকুক। ক-টা দিন নগদে খাও।'

আমি বললাম, 'আমি ক্যাশ নিয়ে ডাল ভাত চচ্চড়ি খাচ্ছি দেখলে হোটেলের মালিক ঘাবড়ে যাবে।'

অভ্র হেসে বলল, 'যাক। তুমি তো মানুষকে ঘাবড়াতেই ভালবাসো।'

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, 'আমি মোটেই ভালবাসি না। মানুষ ঘাবড়ে যায়, আমি কী করব? ভাই অভ্র, আমার কিন্তু ভয় ভয় করছে। এতদিন ধারবাকিতে খেয়ে আসছি। আজ হঠাৎ টাকা দিয়ে খেলে হজম হবে তো?'

অভ্র হাসতে হাসতে বলল, 'না হলে না হবে। এখন চলো তো।'

'তোর অনেক খরচ হয়ে যাবে। বেকার মানুষ।'

অভ্র হেসে বলেছে, 'খরচ কেন? ইনভেস্টমেন্ট বলো। খুনটা করতে পারলে সহকারী হিসেবে একটা পারিশ্রমিক পাব না?'

এরপর আর কিছু বলা যায় না। আমার শোয়া আর অভ্রর খাওয়া—এই দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়েছি। এই মুহূর্তে অভ্র শুয়ে আছে খাটে। আমি বই খুলে রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি পড়ে শোনালাম। অভ্রকে ধরে রাখবার কারণ দুটো। একটা এখন বলব,

BanglaBook.org

একটা আপাতত গোপন থাকবে। সেদিন রাতে অভ্রর যে কথা শুনে আমি ধড়মড় করে উঠে বসেছিলাম—

'জানো সাগরদা, রূপরেখা গানের জন্য মাঝেমধ্যে একজনের কাছে যায়। ভদ্রমহিলার নামটা ভারি সুন্দর। মালঞ্চমালা। মালঞ্চমালা সেন। শুনে তো আমি অবাক। আজকের দিনে এরকম নাম হয় নাকি। মহিলা নাকি দেখতে যেমন সুন্দর, গানও করেন তেমন সুন্দর।'

আমার চোখ কপালে ওঠবার জোগাড়। উঠে বসেছি। বললাম, 'কী নাম বললি অভ্র? আরেকবার বল।'

অভ্র আমার উত্তেজনায় খানিকটা অবাক হয়েই বলল, 'মালঞ্চমালা। মালঞ্চমালা সেন।'

'ভদ্রমহিলা গান শেখান? গানের স্কুল-টুল আছে?'

অভ্র গায়ের চাদর সরিয়ে উঠে বসেছে। আমিও 'মন্ত্রপূত সুইচ' টিপে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছি। অভ্র বলল, 'না না স্কুল-টুল কিছু নয়। উনি গানের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। ওঁর কীসের একটা বিজনেস আছে। রূপরেখা অতটা বলতে পারেনি।'

আমি উত্তেজনায় অভ্রর হাত চেপে ধরলাম। বললাম, 'অভ্র, তুই তোর মোবাইল ফোন থেকে এখনই রূপরেখাকে ফোন কর। আমি কথা বলব।'

'এত রাতে! কাল করলে হত না? তাছাড়া...।'

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, 'তাছাড়া কী? তোর গার্লফ্রেন্ড কি ছেলেমানুষ যে রাতে ফোন করলে বাবা-মা বকবে?'

অভ্র কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'না না তা নয় সাগরদা। আসলে কলকাতায় এসে এখনও তো ওর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। যদি চটে যায়। তা-ই একটা দিন সময় নিচ্ছি।'

প্রেমের এইসব চটামটি আমি ঠিক বুঝতে পারি না। একরকম ভাবি ঘটে আরেকরকম। এই ফাঁকে পাখির গল্পটা বলে নিই। যদিও ঘটনাটা ঘটেছিল দুদিন পরে। পাখির ঘর থেকে বেরিয়ে ওর মাকে ধরেছিলাম।

'পাখিকে কোন ডাক্তারবাবু দেখছে?'

নিবেদিতা কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'ডা. বিষ্ণুচরণ মুখার্জি। যাদবপুরের ক্লিনিকে বসেন।'

BanglaBook.org

আমি খুশি মুখে বললাম, ‘বিষ্ণুবাবু। আরে আমাকে আগে বলবে তো। তোমরা যে কী কর, বিষ্ণুবাবু আমার ছাত্রীর মামা হয়। যাদবপুরের হাড়ের ডাক্তার তো? খুব ভাল ভাল...ইস আগে বলবে তো।’

নিবেদিতা বলল, ‘ওমা! তুমি চেনো?’

আমি একটা অপমানিত অপমানিত মুখ করে বললাম, ‘চিনব না। শুধু ছাত্রীর মামা বলে চিনি না, আমার সেবার হাতে লাগল আমি ওর কাছে গেলাম...তিনদিনে ব্যথা-ট্যথা উবে গেল। ভেরি গুড ডক্টর।’

নিবেদিতা বলল, ‘চিন্তায় আছি সাগর। এইটুকু বয়স, পায়ে যদি কোনো খুঁত থেকে যায়?’

আমি ক্যাচটা লুফলাম। হেসে বললাম, ‘কিচ্ছু চিন্তা নেই। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলে নেব।’

নিবেদিতা বলল, ‘তাহলে তো খুব ভাল হয়। তুমি বরং একবার দাদার সঙ্গে কথা বলে নাও।’

আমি বললাম, ‘দাদার সঙ্গে কথা বলে কী হবে। তোমার বর কি ডাক্তার? পাখি আবার কবে ডাক্তারের কাছে যাবে?’

‘কাল যাবে।’

আমি চিন্তার ভান করলাম, ‘কাল? এই রে কাল যে আমার একটা জরুরি কাজ আছে। ইস নইলে আমি নিয়ে যেতাম। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসতাম।’

নিবেদিতা অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল, ‘দেখ না সাগর, মেয়েটাকে যদি তুমি নিয়ে যেতে খুব ভাল হত।’

আমি একটু ভাবলাম। বললাম, ‘ঠিক আছে, পাখির জন্য কাজ ক্যানসেল। আমিই কাল নিয়ে যাব।’

নিবেদিতা নিশ্চিন্ত হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘খুব ভাল হল, আমি আর তুমি সকালবেলা চলে যাব। তোমার দাদাকে বলব, অফিসে নেমে গাড়িটা পাঠিয়ে দেবে।’

আমি অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললাম, ‘তুমি যাবে কেন? আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? গাড়িই বা কীসের জন্য লাগবে? ট্যাক্সিতে আমি

পাখিকে নিয়ে যেতে পারব না? এইটুকু তো পথ। এক কাজ করো, আমার ওপর যখন ভরসা করতে পারছ না, আমাকে বাদ দাও। আমি বরং ডাক্তার মুখার্জিকে ফোন করে দিচ্ছি। তোমরা গাড়িতে চলে যাও।'

নিবেদিতা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'না না, তুমি যাও।'

আমি উদাসীন ভঙ্গিতে বললাম, 'পাখি বাবা-মা ছেড়ে যেতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ। আমাকে বাদই দাও। আসলে কী জানো, ডাক্তাররা খারাপটা ফট করে বলতে রাজি হয় না। যদি দেখা যায়, মেয়েটার ভাঙা হাড় এখনো সেট করেনি, আবার অপারেশন করতে হবে, তখন বলতে গিয়ে হেজিটেট না করে। যতই হোক মানুষ তো। সেই সময় থার্ড পার্টিকে লাগে। রোগীও নয়, আবার রোগীর বাবা-মাও নয়। যে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করবে। যাইহোক, তোমরা যাও, আমি না হয় পরে ফোন করে জেনে নেব।'

নিবেদিতা এবার এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরল। আমি একটু থেকে বললাম, 'পাখি রাজি হয় কিনা দেখ।'

গঙ্গার পাশটায় সাজগোজ হয়েছে। বাঁধানো পথ, রকমারি আলো, ঝকঝকে বেঞ্চ। এই সাজগোজ আমার যে পছন্দ হয়েছে এমন নয়। আগে বেশ একটা জংলা জংলা ভাব ছিল। যে কারণে সুইমিং পুলের থেকে যেকোনো পুকুর আমার ভাল লাগে। তবে আমার উদ্ভট পছন্দে তো আর দুনিয়া চলবে না। চললে বিপদ।

সেদিন ডাক্তার দেখানোর পর ট্যাক্সি ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিলাম গঙ্গার ঘাটে। অপেক্ষা করছিল পাখির 'ইডিয়ট প্রেমিক'। দীপম। সেও দেখলাম প্রায় কিশোর। সবে মেডিকেল কলেজে ছাত্র হয়ে ঢুকেছে। হবু ডাক্তার আমাকে বলল, 'সাগরকাকু, আমরা কি একটু কথা বলতে পারি?'

আমি ট্যাক্সির সিটে হেলান দিয়ে বললাম, 'অবশ্যই পারো। তবে এখানে নয়। ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন, পেশেন্ট খুব ভাল আছে। একটু আধটু হাঁটাচলা করলে অসুবিধে হবে না। সুতরাং তুমি ওকে ধরে ধরে গঙ্গার ধারের ওই বেঞ্চে নিয়ে যাও। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।' তারপর ট্যাক্সি চালকের উদ্দেশে বললাম, 'ভাই, ওয়েটিং

BanglaBook.org

চার্জ দেব। যান ওই দোকানে চা খেয়ে আসুন। এই দুই ছেলেমেয়ের মারপিটের কী যেন একটা ব্যাপার আছে। এসবের সাক্ষী না হওয়াই ভাল।'

যত দিন যাচ্ছে বুঝতে পারছি, সব প্রেম সুন্দর হয় না। কিছু কিছু প্রেম সুন্দর হয়। যেমন এই দুই প্রায় কিশোর কিশোরীর প্রেম। নদীর ব্যাকগ্রাউন্ডে, বিকেলের ভাঙা আলোয় দুজনকে যে সেদিন কী ভাল লাগছিল! মনে হচ্ছিল, দুজনেই নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে। দুজনেরই পিঠে ঝলমলে ডানা আছে।

এবার রূপরেখাদের কথায় ফিরি।

রূপরেখা-অভ্রর ঝগড়ার কথায় আমি গুরুত্ব দিলাম না। পরদিন সকালেই রূপরেখাকে ফোনে ধরা হল। মজার ব্যাপার হল, অভ্রর ওপর সে বিন্দুমাত্র বিরক্ত নয়। বরং যে কারণে চাকরি ছেড়েছে তাতে সে খুবই খুশি হল। দুনিয়ায় কতরকম মানুষই না থাকে! বিয়ের মুখে মুখে ছেলে চাকরি ছেড়ে বেকার হয়েছে, পাত্রী আহ্লাদিত। আহা।

'সাগরদা, কেমন আছ?'

'ভাল। তুমি কেমন আছ রূপরেখা? তোমার সঙ্গে খুব দরকার।'

'বল সাগরদা।'

'মালঞ্চমালা সেন সম্পর্কে কী জানো?'

রূপরেখা যা বলল তার মূল পয়েন্টগুলো হল—মালঞ্চমালা সেন নিজে আর্কিটেক্ট ব্যবসায় জড়িত থাকলেও গান তাঁর জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গান নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন। গান জানে এমন কাউকে পেলে তিনি তার সঙ্গে আলাপ করে তবে ছাড়বেন। একটা সিডির দোকানে তাঁর সঙ্গে রূপরেখার আলাপ। দুজনেই বেগম আখতারের সিডি কিনতে গিয়েছিল। সেই আলাপ গড়িয়ে যায়। মালঞ্চমালার নিউটাউনের ফ্ল্যাটে প্রায়ই গানের আড্ডা বসে। গোপন আড্ডা। রূপরেখারা দল বেঁধে যায়।

সবটা শোনবার পর আমি চাপা গলায় বললাম, 'রূপরেখা, আমাকে একটা সাহায্য করতে হবে।'

'কী সাহায্য?'

'একটা খুনের ব্যাপার।'

BanglaBook.org

অন্য কেউ হলে চমকাত। রূপরেখা চমকাল না। বরং খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। বলল, 'সাগরদা, তুমি ঠিক আগের মতোই আছ। সবসময় উলটো কথা বল। খুনের কথা বলছ মানে নির্ঘাত কাউকে বাঁচানোর ইচ্ছে হয়েছে।'

মেয়েটার বুদ্ধি দেখে অবাক হলাম। বললাম, 'কাউকে নয়। দুটো মানুষের সম্পর্ককে, ভালবাসাকে বাঁচাতে হবে। ওদের নিয়ে বড্ড বিপদে পড়েছি।'

রূপরেখা বলল, 'বল কী করতে হবে।'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'আজই তুমি মালঞ্চমালা সেনের সঙ্গে দেখা করবে। তাকে বলবে, তোমার কাছে একটা কাজের প্রস্তাব এসেছে। সেই কাজের ব্যাপারে তুমি সাহায্য চাও।'

রূপরেখাও আমার মতো ফিসফিস করে বলল, 'কী কাজ?'

আমি কাজটা বুঝিয়ে বললাম। ঠিক যেমন যেমন ভেবে রেখেছিলাম। ফোন রেখে স্নান-টান করে অভ্রকে নিয়ে সোজা চলে গেলাম 'বিউটিফুল'-এর অফিসে। সিকিউরিটি যুবক সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে দিল। মন্মথ অফিসেই ছিল। অভ্রকে দেখে ভুরু কোঁচকাল।

'স্যার, আজ একটা অন্য বিষয় নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। বিজনেসের কথা।'

মন্মথ অবাক গলায় বলল, বিজনেস! বলুন।'

'এই ছেলেটির কাছে একটা দারুণ প্রজেক্ট আছে। কিন্তু টাকা ঢালবার লোক নেই। আপনার নতুন জমিটায় যদি প্রজেক্টটা করেন।'

খুনের বদলে প্রজেক্ট! মন্মথর চোখ সরু হয়ে গেল। নেহাত আমার খেপামি সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা হয়ে গেছে, মানুষটা মনে হয় তা-ই নিজেকে সামলে নিল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কী প্রজেক্ট?'

আমি প্রজেক্ট বললাম। মন্মথ চমকে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, 'আবার বলুন।'

আমি আবার প্রজেক্ট বললাম। মন্মথ আবার চমকে উঠল। এতবড় একজন ব্যবসায়ীকে চমকাতে দেখে মজা লাগছে।

BanglaBook.org

উনত্রিশ

দুপুরে মন্মথ তালুকদারের গার্ডেন অফিসে ছায়া নেমে এল। মুখ তুলে দেখি, আকাশভরা মেঘ। বিউটিফুল কোম্পানির মালিক আর বেকার অভ্র অন্য একটা টেবিলে কাগজপত্র খুলে বসেছে। অভ্রর হাতে পেনসিল। সে কাগজে কিছু নকশা আঁকছে মনে হয়। মন্মথ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। আমি খানিকটা সরে এলাম। এই কাজে আমার কোনো ভূমিকা নেই।

আহা! ঝড় উঠবে নাকি? হলে দারুণ হয়। কালবৈশাখী এলেই আমার বিলু নিলুর গল্পটা মনে পড়ে যায়। ওদিকে কাজ চলুক, এই ফাঁকে গল্পটা বলে নিই।

সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ।

পয়লা বৈশাখ বাঙালির কাছে গদগদ একটা দিন। নতুন পাঞ্জাবি, ঘাড়ে পাউডার, পাট পাট করে চুল আঁচড়ে বেরিয়ে পড়। দিনের শেষে গাদাখানেক পাকানো ক্যালেন্ডার আর খানকতক কোয়ার্টার সাইজ মিষ্টির বাক্স নিয়ে বাড়ি ফিরবে। সারাদিনের সংগ্রহ। হোল ডে কালেকশন। পরিশ্রম তেমন কিছু নেই। শুধু পরিচিত অপরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে দাঁত বের করে বলতে হবে 'শুভ নববর্ষ'। মেসেজ শুভেচ্ছাও আছে। 'জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক' ধরনের কোনো লাইন মোবাইলে এলে দেরি করা যাবে না। মামণিকে বা ফটাইদাকে ফরোয়ার্ড করে দিতে হবে। ভাবটা এমন, এই লাইন রবিঠাকুরের নয়, এই লাইন নিজের। পথে যেতে যেতে হঠাৎ মাথায় এল, তাই লিখে পাঠানো হল। নইলে হত না।

BanglaBook.org

সেবারের পয়লা বৈশাখ আমার কাছে ছিল রোমাঞ্চকর। যদিও রোমাঞ্চ শুরু হয়েছিল বিকেলের পর থেকে। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই চাপা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। ভেতরে কী হয়, কী হয়

ভাব। মন বলছে, ‘সাগর, চিন্তা করিস না। একটা কিছু হলেও হতে পারে। তোর কপাল ভাল।’

কথাটা ঠিক। বেকার ছেলেমেয়েদের কপাল ভাল হয় না। চাকরির জন্য দুয়ারে দুয়ারে কপাল ঠুকে তাদের কপালে আলু হয়ে যায়। তারা ‘ভাল’র বদলে কপালে ‘আলু’ নিয়ে ঘোরে। কিন্তু যারা বেকার এবং অলস তাদের কপাল অনেক সময়েই ভাল যায়। যেমন আমার। আমি বেকার এবং অলস। নর্মাল বেকার নয়, স্বেচ্ছাবেকার। নিজের পাকাপাকি কাজকর্মের নামে গায়ে জ্বর আসে। আড়াইখানা টিউশন, খানিকটা প্রুফ দেখা, বাকিটা ধারদেনায় অতি আনন্দের সঙ্গে ‘জীবন ও জীবিকা’ নির্বাহ করি। ‘জীবন ও জীবিকা নির্বাহ’ কথাটা ক্লাস ফোরে পড়া ভূগোল বই থেকে ব্যবহার করলাম। কথাটা ইন্টারেস্টিং। চাষি ভাইয়ের জীবন জীবিকা, শ্রমিক ভাইয়ের জীবন জীবিকা, কামার ভাইয়ের জীবন জীবিকা। আমার হল বেকার ও অলস ভাইয়ের জীবন জীবিকা। সেই ছোটবেলা থেকেই মনে হত, জীবন এবং জীবিকা কি এক? তাদের কি আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই? যদি থাকে, তাহলে দুটোকে একসঙ্গে লেখা কেন! বড় হয়ে বুঝতে পারি, না আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। জীবন আসলে শুধু জীবিকাই। সে-ই জীবনকে নির্দিষ্ট করে। সে ই জীবনের নিয়ন্তা। আমার এক খুড়তুতো পিসেমশাইয়ের ঘটনা বলি।

আমার সেই খুড়তুতো পিসেমশাই একসময় খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করে ‘জীবন ও জীবিকা নির্বাহ’ করতেন। তখন তাঁর জীবন ছিল নেতা মন্ত্রী, পুলিশ জীবন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাত প্রতিঘাত থেকে সরকার পরিচালনার ঘাঁতঘোঁত সব বিষয়ে মতামত দিতেন। কে কোন পথে যাবে, পথ কার কাছে যাবে সেইসব বিষয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশেষ ‘পথপ্রদর্শক’। সেই খুড়তুতো পিসেমশাই একসময় খবরের কাগজের কাজ ছেড়ে এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে যোগ দিলেন। বেতন বেশি। সুযোগ বেশি। বাড়িঘর, কালভার্ট, জেটি, সেতুর মধ্যে ডুব দিলেন খুড়তুতো পিসেমশাই। অতি আনন্দে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাত প্রতিঘাত বিষয়ক চিন্তা ত্যাগ করে জীবন চালিত করলেন ইট বালি সুরকিতে। দেখা হলেই লোহার

BanglaBook.org

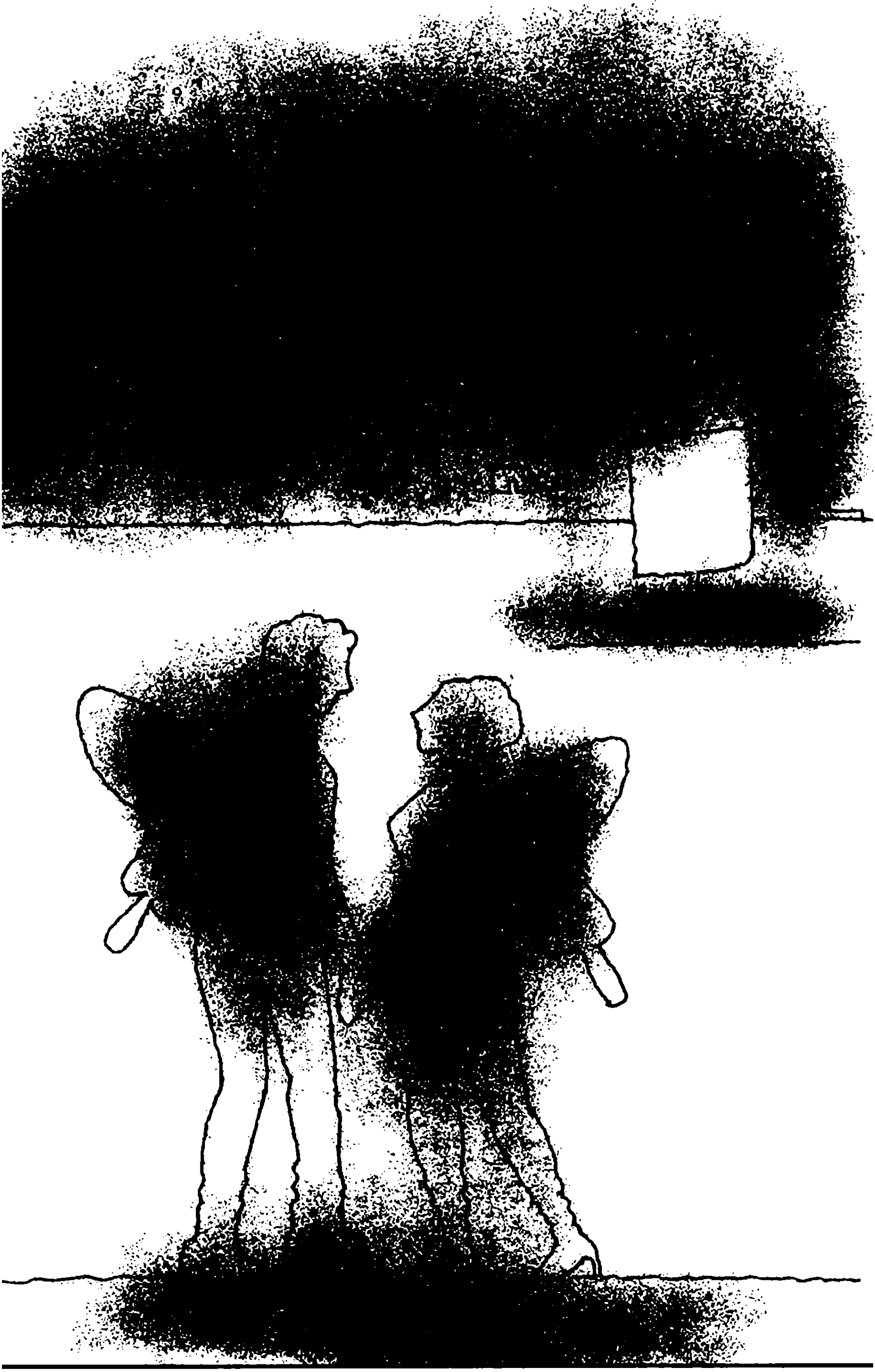

রড, স্টোন চিপস নিয়ে কথা বলতেন। নেতা মন্ত্রী সরকারের প্রসঙ্গ তুললে যেতেন খেপে। বলতেন, 'আরে ভাই ওসব বোগাস দিকে তাকানোর সময় কোথায়? বালির দানা নিয়ে মাথা পাগল অবস্থা। আমার এখন বালির জীবন রে ভাই।'

কী সব গোলমালে সেই কাজও চলে গেল। পিসেমশাই করিতকর্মা মানুষ। তিনি নিজে অফিস দিলেন। কোট টাই, ইনটিরিয়র ডেকরেশন, রিসেপশনিস্ট নিয়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের অফিস খুলে বসলেন। ফ্যাশন শো বিশেষজ্ঞ। আজকাল ফ্যাশন শো-এর রমরমা বাজার। শনিপুজো টু শোকসভা—সবেতে ফ্যাশন শো। খুড়তুতো পিসেমশাইয়ের অফিসে গিয়ে টাকা এলে ঝাড়া হাত পা। সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে আর সুন্দর সুন্দর পোশাক নিয়ে ঠিক সময় উনি হাজির হয়ে যাবেন। সঙ্গে ফোল্ডিং র‍্যাম্প (যার ওপর দিয়ে ছেলেমেয়েরা বাজনার তালে হাঁটবে), ফোল্ডিং লাল নীল আলো, ফোল্ডিং টেপে ধরা ফোল্ডিং মিউজিক। চল্লিশ মিনিটের শো। শেষ পাঁচ মিনিট দমবন্ধ কেলেঙ্কারি! হাসি হাসি মুখে হাঁটবার সময় সুন্দরীর জামার স্ট্র্যাপ ফটাস করে ছিঁড়ে যাবে। একদিন যাবে না, রোজ যাবে। কোনোদিন কাঁধে, কোনোদিন পিঠে, কোনোদিন...। খুড়তুতো পিসেমশাইয়ের ইভেন্ট সুপার ডুপার হিট। খুড়তুতো পিসেমশাই খুশি। খুড়তুতো পিসিমা খুশি। এই খুশির মূল কারণ কী? খুশির মূল কারণ পিসেমশাই জীবিকার দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করেছেন। জীবনকে মাথায় চাপাতে দেননি। সবজান্তা সাংবাদিক জীবন টু বালি সুরকি জীবন টু সুন্দরীর ছেঁড়া স্ট্র্যাপ জীবন অতিবাহিত করেছেন স্বচ্ছন্দে। কোনো বিভ্রান্তি নেই। তিনি বুঝেছিলেন, 'বল বীর, বল উন্নত মম শির' বাঙালি জাতির জীবন ভিখিরিরও নয়, রাজারও নয়। জীবন আসলে ঘেঁচুপোড়ার। বড়মানুষরা বলেন, জীবন জটিল। আমার মতো ছোটমানুষদের কাছে, জীবন অসহায়। নিজেকে ভালবাসা বা ঘৃণা করবার ব্যাপারেও তার কোনো হাত নেই।

থাক, পয়লা বৈশাখ নিয়ে বলতে এসে বেশি গুরুগম্ভীর কথায় আর না যাওয়াই ভাল। মূল কথায় ফিরি।

আগেই বলেছি মাঝেমধ্যে চেনা পরিচিতরা আমাকে কিছু কিছু

কাজ দেয়। একে বলে 'অড জব'। আমি বলি, উদ্ভট কাজ। এই উদ্ভট কাজ দেওয়ার কারণ দুটো। যারা কাজ দেয় তারা কখনো কখনো আমাকে করুণা করে। আহা রে, ছেলেটার পকেট খালি। বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না। ভাত-ডালের হোটেলে ধার জমেছে। কাজ দিয়ে সাহায্য করি। দুনম্বর কারণ হল, যে কাজ দেয় সে ওই উদ্ভট কাজ নিজে পারবে না বুঝতে পারে। যেমন পেরেছে মন্মথ তালুকদার। আমার এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। টাকা পেলেই হল। অর্থের একটাই অর্থ। তার অন্য অর্থ খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। তবে বেশিরভাগ সময়েই কাজ ঠিকমতো হয় না। যা করবার কথা, তার উলটো করে ফেলি। নিয়মের বাইরে চলে যাই। গাধার মতো জীবনকে জীবিকার মাথায় নিয়ে গিয়ে বসাই। ভিখিরি হয়ে রাজা সাজার চেষ্টা। শেষপর্যন্ত ফেল মারি। সংসারে গাধা নিয়ে যত বিপত্তি। গাধারা বার বার ফেল করে, কিন্তু বুঝতে পারে না।

জানতাম, পয়লা বৈশাখে আমি যাচ্ছেতাই রকম ব্যস্ত থাকব। একেই বলে ব্যাডলি বিজি। ব্যাডলি না গুডলি? আমার মতো অলস মানুষের জন্য অবশ্যই গুডলি। যাইহোক, পয়লা তারিখ আমার দম ফেলবার উপায় থাকবে না। সারাদিন টই টই করে বেড়াব। অনেক প্রোগ্রাম। অনেক নেমন্তন্ন। তবে সন্ধের পর আর টই টই নয়। তখন নজরুল মঞ্চে শান্ত হয়ে বসে গান শোনার ব্যাপার। তাও আবার একেবারে ফার্স্ট রো-তে। পুরোনো দিনের বাংলা গান। আজ কেন/ও চোখে লাজ কেন/মিলন সাজ যেন বিফলে যায়...। গান শুনতে শুনতে তালে তালে মাথা নাড়ব। পুরোনো দিনের গানে তালের ব্যাপারটা জটিল। দুমদাম মাথা নাড়লে চলে না। সতর্ক হয়ে মাথা নাড়তে হয়। মাথা কোনদিকে নাড়তে হবে তারও নিয়ম আছে। দুপাশে? নাকি ওপর নীচে? সব গানে একরকম নয়। যেমন এই গানে, মন যেন/ফুলেরও বন যেন/আঁখিরও কোণ যেন/তোমারে চায়...-এর সময় মাথা নাড়তে হবে আধা দুপাশে, তারপর কোয়ার্টার ওপর নীচে, একেবারে শেষে সেমি হাফ সার্কেল পদ্ধতিতে ডান থেকে বাঁয়ে। নইলে লোকে কড়া চোখে তাকাবে। আজকালকার ধাঁই ধাক্কা গানে এই ঝামেলা নেই। যেকোনো দিকে মাথা হাত পা শরীর

BanglaBook.org

নাড়ানো চলে। তাল মিলে যায়। না মিললেও সমস্যা নেই, কেউ কিছু বলবে না। বরং খুশি হবে। এখন বেতালটাই তাল।

যাইহোক, মাথা নাড়তে নাড়তে মাঝেমধ্যে পাশে ঝুঁকে, আবেগমথিত গলায় ফিসফিসিয়ে বলব, 'আহা, ওহো, অপূর্ব! তা-ই না?'

এই আবেগের কথা কাকে বলব?

পরে বলছি। শুধু এইটুকু বলে রাখছি, বুক ধুকপুকানি ব্যাপার আছে। সঙ্গে হালকা লজ্জা। পয়লা বৈশাখের রোমাঞ্চ এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। সেটা হবে বিকেলে। নজরুল মঞ্চে ফাস্ট রো-তে বসে গান শুনতে যাবার আগে। আমাকে ঢুঁ মারতে হবে মুকুলবীথি উদ্যানে। মুকুলবীথি উদ্যানের যে মাথা খোলা স্টেজ রয়েছে, তার নাম রক্ত গোলাপ মঞ্চ। সেই মঞ্চে উঠে আমি...।

এই রে, আর একটু হলে বলে ফেলছিলাম। এখন বলব না। সাসপেন্স থাকুক। ডবল সাসপেন্স। বুক ধুকপুকানি সাসপেন্স আর রক্ত গোলাপ সাসপেন্স।

এই পর্যন্ত শুনে অনেকেই নিশ্চয় হাসছে। ভাবছে, বেকার সাগরের হলটা কী! পয়লা বৈশাখের তার কীসের ব্যস্ততা! তাকে কে নেমন্তন্ন করবে! কার মাথা খারাপ হয়েছে! সে মুকুলবীথি উদ্যানে গিয়ে রক্ত গোলাপ মঞ্চে উঠবে কেন? মঞ্চে ওর কী কারবার? আর্টিস্টদের চা জল দেবে? প্রধান অতিথিকে পাখার বাতাস করবে? হ্যালো, মাইক টেস্টিং? নজরুল মঞ্চে গানই বা শুনতে যাবে কী করে? টিকিট পাবে কোথায়? তার ওপর আবার একেবারে ফার্স্ট রো-তে বসবে বলছে! ভলান্টিয়াররা কান ধরে তুলে দেবে। ভলান্টিয়ার একটা ভয়ংকর জাত। ওরা বড়লোক ছোটলোকের গন্ধ পায়। তুমি ছোটলোক, কিন্তু সেজেগুজে বড়লোক হতে গেলে, ওরা ঠিক গন্ধ পাবে। ক্যাঁক করে ঘাড় চেপে ধরবে। সাগর, ওদের চোখ এড়ালেও নাক এড়াতে পারবে না। আসল সাগরের সবটাই গুল। হারামজাদা আমাদের বোকা ঠাউরেছে। পয়লা বৈশাখকে পয়লা এপ্রিল ভাবছে।

গুল নয়, ঘটনা সত্যি। বললাম না, শুধু বেকার না হয়ে অলস

BanglaBook.org

বেকার হবার কারণে আমার জীবনে কখনো কখনো ইন্টারেস্টিং ঘটনাও ঘটে।

পয়লা বৈশাখে দোকানে দোকানে পুজো। কাস্টমারদের নেমন্তন্ন করে ক্যালেন্ডার, মিষ্টির বাক্স, ঠান্ডা দেওয়া হয়। যারা ফালতু কাস্টমার তাদের জন্য একরকম, যারা মালদার কাস্টমার তাদের জন্য আর একরকম প্যাকেট। সেই প্যাকেট চোরাগোপ্তাভাবে ব্যাগে ভরে দেওয়া হয়। তাতে মিষ্টির বদলে লাড্ডু পেস্ট্রি প্যাটিস। ক্যালেন্ডারও আলাদা। ফালতু কাস্টমারদের জন্য ঠাকুরের ছবি। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ। মালদারদের ক্যালেন্ডারে মনীষীর ছবি। স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

আজ আমি কোন কাস্টমার? ফালতু? নিয়মমতো তা-ই হওয়ার কথা। ফালতুর ফালতু। আমার চেনা দোকান বলতে একটাই। ডাল-ভাতের হোটেল। সেখানে আমার মান্থলি সিস্টেম। ভাত ডালের হোটেলে নববর্ষ হয় কি? হলেও আমাকে কেন ডাকবে? সিস্টেম ক্র্যাক করেছে। একের জায়গায় দেড়মাসের বিল বাকি। বিল বাকি কাস্টমারকে পয়লা বৈশাখে ডেকে মণ্ডামিঠাই কেউ খাওয়াবে না। কিন্তু চমকে দেবার মতো ঘটনা হল, পয়লা বৈশাখ আমি মালদার কাস্টমার। আমার গলির মোড়ের ভাত ডালের হোটেলে নয়, কলকাতা শহরের অন্তত দশটা জায়গায় আজ আমাকে যেতে হবে বুক ফুলিয়ে! আমাকে নিয়ে তারা খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। ভিড় থেকে সরিয়ে ভেতরের ঘরে নিয়ে বসাবে। বলবে, 'স্যার, কী দেব? ঠান্ডা দিতে বলি?'

আমি একটা অবজ্ঞা ধরনের গলা করে বলব, 'না, আপনি বরং আমার সঙ্গে যে ম্যাডাম এসেছেন তাকে দেখুন। তাড়াতাড়ি করবেন। মুকুলবীথিতে আমার লেকচার আছে।'

ম্যাডাম শুনে কৌতূহল হচ্ছে তো? লেকচার? হবেই। তাহলে এবার ঘটনাটা বলে ফেলি।

বিবেকদা সেদিন আমাকে পার্টি অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি পার্টি অফিসের ধারেকাছে ঘেঁষা মানুষ নই। একশো ইনটু টু হাত দূরে থাকা মানুষ। একশো হাত যাওয়ার সময়, একশো হাত ফেরবার

সময়। শুধু মাঝেমধ্যে বিবেকদা ডাকাডাকি করলে যাই। তার কারণ রাজনীতি নয়, তার কারণ আড্ডানীতি। আমি গেলে বিবেকদা দরজার বাইরের লাল আলো জ্বেলে টেবিলের ওপর পা তুলে আড্ডা মারতে বসে।

'তোকে আমি কেন মাঝেমধ্যে ডাকি জানিস সাগর?'

'জানি বিবেকদা।'

'জানিস! কেন বল তো?'

'সত্যি কথা শোনবার জন্য।'

বিবেকদা অবাক হয়ে বলে, 'কোন সত্যি!'

আমি অল্প হেসে বলি, 'যেসব সত্যি পলিটিক্যাল দাদাদের কেউ বলে না, বলতে সাহস পায় না, সেইসব সত্যি।'

বিবেকদাও হেসে ফেলে। বলে, 'মারব একটা চড়।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বলি, 'অবশ্যই মারবে। শুধু চড় কেন? লাথিও মারবে। পশ্চাদ্দেশে লাথি। চড় এবং লাথির ব্যাপারে নেতাদের নিয়মিত অভ্যেসের মধ্যে থাকা উচিত। নাটকের যেমন রিহার্সাল হয়। তেমন পার্টি অফিসগুলোতেও চড় লাথির মহড়া হবে। গালে চড় এবং পিছনে লাথির খাবার জন্য তোমরা লোক ভাড়া করে আনবে। রুটিন করে প্র্যাকটিস করবে। জেলা ধরে ধরে রোস্টার বানাবে। না হলে বিপদ।'

BanglaBook.org

বিবেকদা কৌতুকভরা চোখে বলে, 'কী বিপদ?'

আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বলি, 'পাবলিককে যখন গালে চড় আর পশ্চাদ্দেশে লাথি মারতে যাবে মিস ফায়ার হয়ে যাবে।'

বিবেকদা হো হো আওয়াজে হেসে ওঠে। তারপর বলে, 'বাজে কথা বলিস না। আমি তোকে মাঝেমধ্যে ডেকে পাঠাই, করে দাও জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি পেতে।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'করে দাও জীবন! সেটা আবার কী!'

বিবেকদা বলল, 'সারাদিন শুধু করে দাও আর করে দাও। দলের লোক থেকে পাবলিক শুধু চাই আর চাই। একমাত্র তোকেই দেখি, কিছু চাস না। উলটে দিতে গেলে ছুটে পালাস।'

আমি গম্ভীর মুখে বলি, 'আজ নেব। খুব খিদে পেয়েছে খাবার

আনাও দেখি। মুড়ি চানাচুর চলবে না। আরো সলিড কিছু দিতে হবে। ধোসা হবে?’

বিবেকদা বলল, ‘শোন, আমার একটা উপকার করে দিতে হবে।’

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, ‘উপকার! নেতার উপকার করবে পাবলিক! আমি তো পাবলিকও নই বিবেকদা, পাবলিকেরও অধম। আমি হলাম খাবলিক।’

‘খাবলিক! সেটা আবার কী!’ বিবেকদা ভুরু কোঁচকাল।

আমি মুচকি হেসে বললাম, ‘যে পাবলিক খালি খাওয়ার ধান্দায় ঘুর ঘুর করেছে।’

বিবেকদা সিরিয়াস মুখ করে বলল, ‘খাওয়াদাওয়ার ভাল বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। কত খেতে পারিস দেখব।’

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, ‘কাঙালি ভোজন? ফ্যানটাস্টিক। একেবারে ফার্স্ট ব্যাচে বসে যাব। খিচুড়ি, লাবড়া গরম পাব।’

‘ফালতু কথা না বলে মন দিয়ে কথা শোন সাগর। পরশু পয়লা বৈশাখ। ওইদিন বিকেল থেকে কোনো কাজ রাখবি না। চারটে টু রাত দশটা। তখন আমার হয়ে প্রক্সি দিবি।’

আমি হাঁ হয়ে গেলাম। বিবেকদা কী বলছে! পয়লা বৈশাখ বিবেকদার হয়ে প্রক্সি দেব! মানে কী?

বিবেকদা টেবিলের ওপর ঝুঁকে গলা নামিয়ে বলল, ‘পয়লা বৈশাখ মোট একশো তেরোটা জায়গা থেকে নেমন্তন্ন পেয়েছি। গত পাঁচবছরে রেকর্ড ব্রেক করেছে। দোকান, বাজার, অফিস, বাড়ি সব জায়গা থেকে নেমন্তন্ন। সঙ্গে আবার নাচ, গান, নাটক, ভাষণের প্রোগ্রাম। কারা যেন পতাকাও উত্তোলন করবে।’

আমি আঁতকে উঠি। বলি, ‘পয়লা বৈশাখে পতাকা! কী পতাকা? কার পতাকা?’

বিবেকদা নিমখাওয়া মতো মুখ করে বলল, ‘দুর, আমি কী ছাই অতসব জানি। শুধু পতাকা নয়, বউবাজারে কোন একটা কুস্তির আখড়াতে যেতে বলেছে। মেয়েদের জন্য দেশপ্রিয় পার্কে ক্যারাটে জুডোর শিবির শুরু হবে ফিতে কেটে।’

BanglaBook.org

আমি আরো অবাক হই। বলি, 'বল কী বিবেকদা! পয়লা বৈশাখে কুস্তি, জুডো ক্যারাটে!' কালে কালে দেশটার হল কী গো!

বিবেকদা বিরক্ত মুখে বলল, 'যতসব পাগলামি। যাইহোক, একশো তেরোটার মধ্যে একশোটা প্রোগ্রাম ফেলে দিয়েছি। তেরোটা ফেলতে পারিনি। এগুলো ভি ভি আই পি রেকমেনডেশন।'

আমি বলি, 'পয়লা বৈশাখে ভি ভি আই পি রেকমেনডেশন! সে আবার কী বিবেকদা? রেকমেনডেশন তো চাকরি, টেন্ডারে হয়। পয়লা বৈশাখেও হয় নাকি।'

'কেন হবে না? ধরা করা ছাড়া কিছু হয় নাকি? পয়লা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ সব ধরা করা। এই তো ক-টা দিন পরেই পঁচিশে বৈশাখ আসছে। রবি ঠাকুরের জন্মদিনে নাচ, গান, আবৃত্তির জন্য পার্টি অফিসে লাইন পড়ে যাবে। এর দিদি, তার পিসি, অমুকের শালী সব অ্যাপ্লিকেশন জমা দেবে।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'কেন? পার্টি অফিসে পঁচিশে বৈশাখ হবে নাকি?'

বিবেকদা বলল, 'না না। অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়বে এখানে ওখানে অর্গানাইজারদের বলে দেবার জন্য। কেউ একটা গান, কেউ দুটো গান। রেকমেনডেশন বুঝে সোলো বা কোরাসের ব্যবস্থা করে দিই। যাকে পঁচিশে পারলাম না, তাকে বাইশে ঠেলে দিই। ক্যান্ডিডেট কার কাছ থেকে আসছে সেটা খেয়াল রাখতে হয়। আমাদের তো আলাদা সেল হয়। পঁচিশ সেল। আলাদা ফাইল। কন্ট্রোলরুম।'

আমার চোখ আবার কপালে ওঠে। বলি, 'বাপ রে। শ্রমিক সেল, কৃষক সেল, পঁচিশ সেল!'

বিবেকদা বলল, 'যাই হোক, এই তেরোটা ফাংশনে আমাকে যেতেই হবে। সবকটাই সেকেন্ড হাফে। মানে বিকেলের পর। চারটের পর শুরু।'

আমি বললাম, 'তা যাবে। এত টেনশনের কী আছে? নেতা বলে কথা। যেতে তো হবেই।'

বিবেকদা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'হবেই, কিন্তু পারব না। কালই পার্টির কাজে দিল্লি চলে যাচ্ছি। হঠাৎ ঠিক হয়েছে।'

BanglaBook.org

আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বললাম, 'তাহলে তো অল ক্লিয়ার। সব ক্যানসেল। নেতা, মন্ত্রীদের এরকম হয়েই থাকে। দুম করে প্রোগ্রাম ক্যানসেল। এই যে তুমি পয়লা বৈশাখের নেমন্তন্ন অ্যাটেন্ড না করে দিল্লি চলে যাচ্ছ, এতে তোমার কদর আরো বাড়বে। আগামীবার একশো তেরোর জায়গায়, দুশো তেরোটা নেমন্তন্ন আসবে। এবার কুস্তির আখড়ায় যেতে হত, আগামীবার কুস্তিও লড়তে হবে। ল্যাঙোট পরে, গায়ে মাটি মেখে প্যাঁচ কষবে। পরদিন খবরের কাগজে ছবি বেরোবে। ছবির তলায় লেখা হবে—পয়লা বৈশাখে পালোয়ান নেতা বিবেক রায়।'

কথাটা বলে আমি হাসতে লাগলাম।

বিবেকদা এবার ফট করে উঠে পড়ল। ঘরের দরজায় লক লাগিয়ে ফিরে এল চেয়ারে। গলা নামিয়ে, ফিসফিস করে বলল, 'আরে দিল্লি ফিল্লি বাজে কথা। ওদিন আমি কলকাতা থেকে কেটে পড়ছি।'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, 'কেটে পড়ছ!'

বিবেকদা টেবিলের ওপর আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বলল, 'হ্যাঁ, কেটে পড়ছি। এবার পয়লা বৈশাখের কোনো প্রোগ্রামে থাকতে চাই না। জগন্নাথ পালের ঘটনার পর আমি যদি শুভ নববর্ষ, শুভ নববর্ষ বলে হইচই করি সেটা খারাপ হবে।'

আমি বললাম, 'জগন্নাথ পাল! সে আবার কে?'

বিবেকদা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সোজা হয়ে বসল। অবাক হয়ে বলল, 'জগন্নাথ পাল কে তুই জানিস না? কাগজ পড়িস না?'

আমি মাথা চুলকে ছেলেমানুষের ঢঙে বললাম, 'অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। কাগজ কেনবার পয়সা কই? ভাত ডালের রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে উলটে দেখি। তবে খবর-টবর দেখি না। যেসব কমিক্স ছাপা হয় সেগুলো পড়ি। খুব মজা পাই। দেখ বিবেকদা, ব্যাপারটা তো সেই এক। হয় তোমাদের পার্টি পলিটিক্সের খবর পড়ে মজা পাও, নয়তো কমিক্স পড়ে মজা পাও। সবটাই তো হাসির। তা-ই না?'

বিবেকদা কড়া চোখে তাকিয়ে বললেন, 'টিভি দেখিস?'

'দেখি। কার্টুন দেখি। ওই একই হল...।'

বিবেকদা হালকা ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর সাগর। ফাজলামি করিস না। যা বলছি শোন।'

বিবেকদা যা বলল সেটা এরকম—

দিন পনেরো আগে বিবেকদার পার্টির সঙ্গে ওদের অপোনেন্ট পার্টির গোলমালে জগন্নাথ পাল নামে এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। নিরীহ, মাঝবয়সি, গরিব মানুষ। ভদ্রলোক কাজকর্ম সেরে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরছিলেন। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে হঠাৎই গোলমালের মাঝখানে পড়ে যান। পুলিশের লাঠি, টিয়ার গ্যাস। ইঁট, পাথর ছোঁড়া হচ্ছিল দেদার। জগন্নাথ পাল আহত হলেন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু বললেন, মৃত। খবরের কাগজ, টিভিতে এই ঘটনা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছে! মোট সাতটা পার্টি দাবি করেছে, জগন্নাথ পাল নাকি তাদের লোক। বিবেকদাও রিপোর্টারদের বলেছে, জগন্নাথ পালকে অনেকদিন ধরে চিনত। একসময়ে একসঙ্গে রাজনীতিও করেছে। এরপরে যদি বিবেকদা ঘুরে ঘুরে পয়লা বৈশাখের মিষ্টি খেয়ে বেড়ায় তাহলে ঝুঁকি হয়ে যাবে। খবরের কাগজে, টিভিতে ছবি দেখাবে। দলের লোক মরেছে আর নেতা ক্যালেন্ডার নিয়ে বেড়াচ্ছে! তা-ই প্রোগ্রাম ক্যানসেল।

এতদূর শোনার পর আমি বললাম, 'এ তো ভাল কাজ। তুমি গোপন করছ কেন? সবাইকে ডেকে জানিয়ে দাও। জগন্নাথ পালের মৃত্যুর কারণে এবার পয়লা বৈশাখের উৎসব থেকে তুমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছ। হাততালি পাবে।'

বিবেকদা হতাশ গলায় বলল, 'সমস্যা আছে। এত কিছুর পর যদি প্রমাণ হয়, জগন্নাথ পাল আমাদের দলের লোক নয়, আমার সঙ্গে তার কোনো পরিচয়ই ছিল না? আজকালকার টিভি, খবরের কাগজওলাদের বিশ্বাস নেই। বেটারা বিরাট হারামজাদা। মাটি খুঁড়ে কাগজপত্র বের করে আনবে। তখন কী হবে? সবাই বলবে, বেশি নাটক করেছে। দলের বাইরে ভেতরে হাসাহাসি হবে। বলা যায় না পার্টি আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশনও নিতে পারে। যারা আমাকে নেমন্তন্ন করেছে তারাও হাতছাড়া হয়ে যাবে। নেমন্তন্নে যাবার জন্য যারা ধরা করা করেছিল তারাও চটবে। লোক দেখাতে গেলে সবদিক থেকে

বিপদ। তা-ই ঠিক করেছি, আমার হয়ে তুই প্রক্সি দিবি। আমার যাওয়াও হল না, আবার যাওয়াও হল। পার্টির কাউকে পাঠাতে পারব না। তাতে ঝামেলা আছে। সবাই বলবে বিবেক গ্রুপবাজি করছে। যাকে পাঠাব সেই শালা পরে মাথায় উঠে ইয়ে করবে। তা-ই তোকে বেছেছি। পার্টি পলিটিক্সের বাইরে। আজকাল অরাজনৈতিক লোকদের দর বাড়ছে।'

'তা বলে আমি!'

বিবেকদা জোর গলায় বলল, 'হ্যাঁ তুই। তেরোটা জায়গা যাবি আমার প্রতিনিধি হয়ে। তারপর রক্ত গোলাপ মঞ্চে গিয়ে বাংলা ভাষা নিয়ে লেকচার দিবি। নজরুল মঞ্চে গিয়ে বাংলা গান শুনবি।'

আমার মাথা ঘুরে উঠল। বিবেকদা এসব কী বলছে! আমি লেকচার দেব। বিড়বিড় করে বললাম, 'আমি! আমি লেকচারের কী বুঝি?'

বিবেকদা বলল, 'বুঝতে হবে না। হাবিজাবি বলবি। আমরা বেশিরভাগ লেকচার হাবিজাবি দিই।'

আমার হাঁটু কাঁপছে। বললাম, 'আমাকে ওরা মানবে কেন?'

বিবেকদা ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার হাতের ওপর রেখে বলল, 'সে-ব্যবস্থা করেছি। আমি সবাইকে ফোনে বলে দেব। তোর সঙ্গে বুলু থাকবে। তুই আর বুলু আমার গাড়ি নিয়ে ঘুরবি।'

'বুলু! সে কে?'

বিবেকদা বলল, 'আমার পিসতুতো শালী। বাইরে থাকে। আমার এখানে এসেছে। বাঙালির নতুন বছরের ফেস্টিভ্যালের ওপর একটা কী পেপার লিখবে। তা-ই দেখতে চায়। ওদিন তোর সঙ্গে ঘুরলেই দেখা হয়ে যাবে। তাছাড়া বললাম তো, সবাইকে আমি বলে রাখব। নেতার শালী যাচ্ছে শুনলে ডবল খাতির পাবি।'

আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, 'আমায় ছেড়ে দাও বিবেকদা। আমি পারব না।'

বিবেকদা মুচকি হেসে বলল, 'ঠিক পারবি। বুলু চমৎকার একটা মেয়ে। যেমন দেখতে, তেমন বুদ্ধি। বিয়ে থা করেনি এখনো। একটা চান্স নিয়ে দেখ না। এই অলস জীবন ছেড়ে যদি বাইরে চ... । ...তে

BanglaBook.org

পারিস...একটা না একটা ভাল কাজে ঢুকে যাবি। বুলু যদি খুশি হয় ঠিক কিছু একটা করে দেবে। আর যদি খুব খুশি হয়...।' হাসল বিবেকদা। বলল, 'একবার বিয়ে করতে পারলে কেল্লাফতে। গ্রিন কার্ড। জীবিকা নিয়ে তোর আর চিন্তা থাকবে না।'

কথা শেষ করে চোখ সরু করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল বিবেকদা।

সেই জীবন ও জীবিকা। বিবেকদা আমাকে লোভ দেখাচ্ছে? তা-ই হবে। নেতা মানুষ জানে কীভাবে মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। বিবেকদা ফিসফিস করে বলল, 'সাগর, ভাল করে ভেবে দেখ, খুব বড় সুযোগ একটা। বুলুকে যদি ঠিকমতো ম্যানেজ করতে পারিস তাহলে আর চিন্তা নেই। বিদেশ থেকে স্কাইপে তো আমার সঙ্গে কথা বলবি। ভেবে দেখ, ভেবে দেখ ভাল করে।'

আমি সেদিন পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর, অনেক ভেবে দেখলাম। বিবেকদা ভুল কিছু বলেনি। জগন্নাথ পাল মরে আমাকে বিরাট সুযোগ করে দিয়ে গেল। জীবন ও জীবিকার সুযোগ। বুলুর সঙ্গে একবার বিদেশে গিয়ে পড়তে পারলে হয়। যত ভাবলাম, তত উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। এক সময়ে সেই উৎসাহ রোমাঞ্চের চেহারা নিয়েছে। নেমন্তন্ন, গান, লেকচার এবং সর্বোপরি বিবেকদার পিসতুতো শালী। বুলু। সুন্দরী বুলু।

পরদিন পার্টি অফিসে গিয়ে দেখা করতে বিবেকদা বলল, 'তুই কি একবার বুলুর সঙ্গে কথা বলে নিবি?'

'না বিবেকদা, সারপ্রাইজ নষ্ট হয়ে যাবে।'

বিবেকদা বলল, 'কীসের সারপ্রাইজ!'

আমি লজ্জা পাওয়া মুখে বললাম, 'প্রথম দেখা, প্রথম কথার সারপ্রাইজ। পয়লা বৈশাখের মতো একটা শুভদিনেই সেটা হওয়া ভাল।'

বিবেকদা ঠোঁটের কোনায় হেসে বলল, 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।'

আমিও সিরিয়াস বললাম, 'গোঁফে নয়, নাকে বিবেকদা। আমি শিওর বাংলা নববর্ষ দেখে তোমার শালী খুব খুশি হবে। আমার

BanglaBook.org

ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ হবে। ব্যস। তারপর আর আমার কোনো চিন্তা থাকবে না। প্লেনে উঠে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। একেবারে সানফ্রানসিস্কো। প্রস্তাবটা শুনে প্রথমে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এখন এক্সাইটেড লাগছে।'

বিবেকদা বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানতাম। ভ্যাগাবন্ডের মতো জীবনযাপন কতদিন সহ্য হয়? তোর জন্য নতুন পায়জামা পাঞ্জাবি এনে রেখেছি। নিয়ে যাস।'

আমি কৃতজ্ঞতা ভরা গলায় বললাম, 'আমার জন্য আর কত করবে বিবেকদা? তুমি আমাকে জগন্নাথ পালের ঠিকানাটা বরং দিয়ো। বিদেশ চলে যাবার আগে বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করে যাব। ফটোতে মালা দিয়ে আসব।'

বিবেকদা খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ওর বাড়িতে আর কে আছে? বুলুর বয়সি একটা মেয়ে আছে শুনেছি। বছর তেইশ বয়স নাকি। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে ঝামেলায় পড়েছে। ছোটখাটো একটা কাজকর্ম জোগাড় করে দেব ভেবেছিলাম। পিছিয়ে এলাম। পরে যদি জানা যায় জগন্নাথ পাল অন্য পার্টির...সবাই হাসবে।'

আমি ফোঁত করে একটা অবজ্ঞার আওয়াজ করে বললাম, 'একেবারে মাথা ঘামিও না বিবেকদা। গরিব মানুষ ঝামেলায় পড়বে না তো কীসে পড়বে? পদ্মবনে? যার যেমন জীবিকা তার তেমন জীবন। নিলুর জীবিকা নেই, তার রোজগেরে বাপ তোমাদের মারপিটে গাধার মতো মরেছে, তার জীবন হবে ঝামেলার। সেটাই নিয়ম। জীবন হল জীবিকা নিয়ন্তা। নিলুকে নিয়ে একদম মাথা ঘামিও না। শুভ নববর্ষে মাথায় হাওয়া বাতাস খেলাও।'

বিবেকদা আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে বলল, 'নিলুটা আবার কে?'

আমি লজ্জা পাওয়া মুখে বললাম, 'জগন্নাথ পালের কন্যা। তুমি বললে না, তোমার ওই বিলুর বয়সি, তাই ফট করে একটা নাম দিয়ে ফেললাম নিলু। বিলু, নিলু। খারাপ হল?'

বিবেকদা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'ফাজলামি করলে চড় খাবি। দেখিস পয়লা বৈশাখ কিন্তু ডোবাস না। তোর বড় পরীক্ষা। একদম

দেরি করবি না। গাড়ি যাওয়ার আগে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমার অত বড় গাড়ি তোদের ওই গলিতে ঢুকবে না।'

আমি দেরি করলাম না। দেরি করল বিলু। সে এল সন্ধের মুখে। আমি বড়রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিলাম। তেরোটা প্রোগ্রাম, বাংলা ভাষা নিয়ে লেকচার, বাংলা গান শোনা—এইটুকু সময়ের মধ্যে এত কাজ করব কী করে! তার ওপর বিলু মেয়েটা গবেষণার জন্য নিশ্চয় নানা ধরনের কায়দা করবে। ফটো তুলবে, নোট নেবে, সঙ্গে ইন্টারভিউ করবে। তাড়া দেওয়া চলবে না। আমার ওপর রেগে গেলে কেলেঙ্কারি। বিদেশ গিয়ে জীবিকা নির্বাহের প্ল্যান চৌপাট হবে। এবার রোমাঞ্চর সঙ্গে টেনশন হচ্ছে। আজ কি তবে আমার টেনশনের পয়লা বৈশাখ?

বিরাট গাড়িতে যখন উঠলাম তখন আকাশ ভরা মেঘ। ঝড়ের মেঘ? কালবৈশাখী নাকি? এই রে!

সত্যি বিবেকদার পিসতুতো শালী সুন্দরী। তবে খুবই কড়া। আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না। না দিক। প্রেম-ট্রেমের ব্যাপারে ধীরে পাত্তাই ভাল। আমার বলে দেওয়া রাস্তায় গাড়ি খানিকটা যাওয়ার পর বিলুর দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বললাম, 'চলুন, বাংলার নতুন বছর অন্যরকমভাবে শুরু করি।'

বিলু বিরক্ত গলায় বলল, 'অন্যরকমভাবে মানে। জামাইবাবু শিডিউল করে দিয়েছেন না?'

আমি নরম গলায় বললাম, 'শিডিউলের বাইরে যাব। নিয়ম মেনে সব বোঝা যায়, উৎসব বোঝা যায় না।'

বিলু কড়া গলায় বলল, 'বোঝাবুঝির ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন সাগরবাবু। আপনি শুধু গাইডের কাজ করলেই মনে হয় ভাল হবে। তা-ই না? আপনি শিডিউল ধরে এগোন।'

আমি এই কথায় পাত্তা না দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'ড্রাইভার ভাই, ওই গলির মুখে গাড়ি রাখবেন। মনে হচ্ছে, এটাই সেই জায়গা...।'

অন্ধকার গলি দেখে বিলু বলল, 'এটা কোথায় এলাম?'

আমি দরজা খুলে বললাম, 'বলছি, আগে নামুন। নোট খাতা আর ক্যামেরাটা নিন। গলি-টলির ভেতর দিয়ে খানিকটা যেতে হবে।'

BanglaBook.org

আকাশ ঘন কালো। আহা! কতদিন পরে ঝড় উঠবে। গরমে পারা যাচ্ছিল না। আকাশ দেখে মনে হচ্ছে ঝড়ের পর তুমুল বৃষ্টি হবে। হোক। ভেসে যাক চারপাশ। সব জ্বালা, কষ্ট, চোখের জল মুছে দিয়ে স্নিগ্ধ, শীতল হোক নতুন বছর।

জগন্নাথ পালের বাড়িতে ঢোকার ঠিক মুখে ঝড় উঠল হাহাকার করে। নিলু কি বাড়িতে আছে? থাকলে ভাল হয়। বিলু নিশ্চয় ওর জীবন ও জীবিকার জন্য একটা কিছু উপায় করে দিতে পারবে।

গল্পটা কেমন? চমৎকার না?

BanglaBook.org

তিরিশ

রাত ন-টা। ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। সঙ্গে গুরুগুরু মেঘের ডাক। আমি আর অভ্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে একটা প্লাস্টিকের ছাউনির তলায় গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছি। গুটিসুটি মেরেও পুরোটা লাভ হচ্ছে না। চারপাশ থেকেই ছাট আসছে। আমরা আধখানা ভিজে গেছি। দারুণ লাগছে! ফুটপাথের কোনায় এই ছাউনি কে বেঁধে রেখেছে? যে-ই বাঁধুক, নিশ্চয় সে জানত, দুই খেপা যুবক আজ শহর বেড়াতে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে পড়বে। তাদের আশ্রয় দরকার। এই ছাউনির তলায় তারা এসে দাঁড়াবে। ভাববে, বৃষ্টির হাত থেকে বেঁচে গেলাম। আসলে বাঁচবে না। খুবই মজা পাবে। ময়দান পেরিয়ে গঙ্গা থেকে আসছে ঝোড়ো বাতাস। আসবার পথে বৃষ্টি মেখে আর এক চোট ভিজে নিচ্ছে। বাতাস আর জলের ঝাপটায় আমাদের মাথার ওপরের সবুজ প্লাস্টিক উঠছে ফুলে ফুলে। ঢেউয়ের মতো। ঝড়বাদলে বিরাট ফুর্তি হয়েছে। ভিক্টোরিয়া দেখা যাচ্ছে। মাথার পরিটাকে মনে হচ্ছে, জল আর অন্ধকারে আঁকা।

আমি বললাম, 'অভ্র, গাইতে পারিস?'

'না পারি না। গলায় একদম সুর নেই। সুর নেই বলেই রূপরেখা আমার সঙ্গে এতদিন রয়ে গেছে।'

আমি হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ছুঁতে ছুঁতে বললাম, 'তা-ই হওয়া উচিত। সুরের সঙ্গে থাকবে অ-সুর। গুণের পাশে মানায় বেগুনকে। দেখ না, মন্মথ আর মালঞ্চমালা দুজন শিল্পী পাশাপাশি থাকতে গিয়ে কী সমস্যায় না পড়েছে! সম্পর্ক একেবারে খুনোখুনি পর্যন্ত গড়াল। এই যদি দুজনের একজন ট্যাড়শ হত তাহলে কোনো সমস্যাই ছিল না। নো খটাখটি।'

অভ্র বলল, 'ভালই তো তুমি একটা ইন্টারেস্টিং কাজের অর্ডার পেলে। খুন বলে কথা।'

আমি বললাম, 'তা ঠিক। কিন্তু এখন ভয় করছে। নিজে খুন না হয়ে যাই। থাক ওসব কথা, বেসুরো গলায় গান করতে পারবি কিনা বল।'

অভ্র হেসে বলল, 'সাগরদা, তুমি দেখছি গান থেকে বেরোতে পারছ না। গোটা সন্ধেটা মন্মথ তালুকদারের সঙ্গে গান নিয়ে কথা বললে, আবার গান!'

মুচকি হেসে বললাম, 'কী করব? মার্ডারের ক্ষেত্রে ওয়েপন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেকোনো হত্যাকাণ্ডে অস্ত্র সবার আগে। কী দিয়ে মারা হবে সেটা ঠিক করতে হয়। মন্মথ তালুকদারের কাছ থেকে যখন তার স্ত্রীকে খুন করবার বরাত পেলাম তখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছি। অস্ত্র হাতড়েছি বলতে পারিস। শেষ পর্যন্ত অস্ত্র পেলাম।'

'এতদিন পরে পেলে!'

আমি বললাম, 'এতদিন পরেই যে পেলাম তা ঠিক নয়। মালঞ্চমালার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম সেদিনই একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। তবে সেটা খুব স্পষ্ট ছিল না। আবছা ধারণা। রিভলভার না ছুরি? নাকি দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস মারব? যতদিন যেতে লাগল অস্ত্রের চেহারাটা স্পষ্ট হতে লাগল। মন্মথর কাছ থেকে যেদিন নতুন জমি কেনবার খবরটা শুনলাম সেদিন অস্ত্রের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম। মোটামুটি ঠিক করে ফেললাম, রণক্ষেত্রর মতো আমার মালঞ্চমালা নিধনক্ষেত্র তার স্বামীর নতুন জমিতেই করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? রূপরেখার কথা শুনে সবটা ক্লিয়ার করে ফেললাম।'

অভ্র বলল, 'তুমি কী ভেবেছিলে? গানের স্কুল বানাবে?'

আমি একটু চুপ করে থেকে ভাবলাম, 'ঠিক স্কুল নয়, রিসার্চ সেন্টার গোছের যদি একটা কিছু...আজকাল গবেষণাকেন্দ্র বিষয়টা খুব চলছে। তবে মন্মথ এবং মালঞ্চমালা কতটা রাজি হয় তার ওপর নির্ভর করছিল।'

অভ্র বলল, 'তারপর কী হত? সেই সংগীত গবেষণাগারে মালঞ্চমালাকে মার্ডার করতে?'

BanglaBook.org

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'কেন নয়? ভালবাসা এবং খুন সর্বত্র চলতে পারে। খুনের জন্য অন্ধকার গলি, ফাঁকা মাঠ, ভাঙা জিনিসে ভরা গোডাউন লাগবে তার কী মানে আছে? সেতার, তানপুরা, হারমোনিয়াম, গিটারের মাঝখানেও রক্ত ঝরতে পারে। কোনো সমস্যা নেই।'

'ওই জায়গায় মালঞ্চমালা যেত কেন? তার ওপর আবার তার স্বামীর জমিতে, স্বামীর পয়সায় তৈরি।'

আমি বললাম, 'মালঞ্চমালাকে থোড়াই বলতাম। সে জানতই না মন্মথ পয়সা ঢেলেছে। এখন যেমন...।'

কথার মাঝখানে আমি থমকে গেলাম। বৃষ্টি ধরে গেছে। ভিক্টোরিয়ার দিক থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছে টুকুস টুকুস করে। আর একটু কাছে আসতে বুঝলাম, গাড়ির চেহারা রাজকীয়। মনে হয় বিয়েবাড়ির বর নিয়ে যাতায়াত করে। গোটা গায়ে কারুকার্য। সোনালি না রুপোলি এখন বোঝা যাচ্ছে না। কলকাতায় এটা একটা খুব বড় মজা। মেট্রোরেলও আছে আবার ঘোড়ায় টানা গাড়িও আছে। সাজানো গোছানো ঘোড়ার গাড়িতে চেপে টহল মারা যায়। এই গাড়ি নিশ্চয় সারাদিনের কাজ সেরে আস্তানায় ফিরছে। হয়তো বৃষ্টিতে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমি অভ্রর হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বললাম, 'অ্যাই, আজ ঘোড়ার গাড়িতে বাড়ি ফিরবি?'

অভ্র লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'ফ্যানটাস্টিক।'

আমাদের রাজকীয় ঘোড়ার গাড়ি টগবগিয়ে ছুটেছে চৌরঙ্গি দিয়ে। চারপাশ ভেজা ভেজা। ফুরফুরিয়ে বাতাস বইছে। থেমে যাওয়া বৃষ্টির জলকণা উড়ছে ইতস্তত। শেষ কবে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চলেছিলাম? সেই যে বাদলের সঙ্গে শিমুলতলায় গিয়েছিলাম। শিমুলতলার কথা মনে পড়তে মনটা খারাপ হয়ে গেল। শিমুলতলার এখনকার অবস্থা নাকি খুব খারাপ। সেদিন অমিতাভ শিমুলতলার অনেক গল্প করছিল। অমিতাভর মামাবাড়ি ছিল শিমুলতলায়। ওর বাল্য, কৈশোর এবং তারুণ্যের অনেকটা জুড়ে রয়েছে শিমুলতলা। বছরে একবার করে যাওয়া ছিল মাস্ট। অমিতাভর মামা দুনিয়া ঘুরেছেন। তিনি বলতেন, শিমুলতলা সুইৎজারল্যান্ডের থেকেও নাকি

তাঁর ভাল লাগে। নদী পেরিয়ে, টিলা ডিঙিয়ে, খেত টপকে নিশ্চিন্তে চলে যাওয়া যেত মাইলের পর মাইল। ট্রেন লাইনের পাশে উঁচু নীচু পথে সাইকেল চালানোর গল্প বলতে বলতে সেদিনও পঞ্চাশ ছোঁয়া অমিতাভর চোখ ঝলমল করছিল। ওর মামাবাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। সুইৎজারল্যান্ডের থেকেও যে জায়গাকে ভদ্রলোক বেশি ভালবেসেছিলেন, সেখানেই ডাকাতরা হাতে ছুরি মারল। মামা আর কোনোদিন শিমুলতলার দিকে পা বাড়াননি। শুধু অমিতাভর মামা কেন, বাঙালিরা প্রায় সকলেই ওখানকার ঘরদোর ছেড়ে দিয়েছে। পর্যটনের ওপর অনেকটা নির্ভর করে থাকা শিমুলতলা, গিরিডি, যশিডি, মধুপুরে মানুষের যাতায়াত এখন প্রায় নেই বললেই চলে। ভাবা যায়! অবাক লাগে। আমাদের দেশের সরকার বাহাদুর একবার ভাবলও না। এই গোটা এলাকাটা জুড়ে একটা পর্যটন কেন্দ্র কি করা যেত না? সেখানকার মানুষদের কি বোঝানো যেত না, এই আকাশ বাতাস জল, নদী, পাহাড় তোমাদের সম্পদ। এসো এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমরা উপার্জন করি। একে সুন্দর, শান্ত রাখলে তোমাদেরই লাভ। আসলে সরকারের এত সময় নেই। তাদের ভোট করতে, সংসদ বিধানসভায় ঝগড়া করতে হয়, দরকার পড়লে চটি জুতো ছোঁড়াছুঁড়িও চলতে পারে। বাইরেও অনেক কাজ। পুলিশ, লাঠি, গুলি। শিমুলতলায় চাঁদনি রাতে, গা ছমছমে মেঠো পথ, বুক কাঁপিয়ে ছুটে যাওয়া গমগমে ট্রেন নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই? নো টাইম।

অভ্র গান ধরতে আমার শিমুলতলার ঘোর কাটল। আশ্চর্যের কথা 'বে-সুরো অভ্র'র গলা হিংসে করবার মতো সুন্দর। রাতের বৃষ্টি ভেজা কলকাতাকে চমকে দিয়ে সে খোলা গলায় গেয়ে উঠল—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে॥
আমার অনেক দিনের আকাশ চাওয়া আসবে ছুটে দক্ষিণ হাওয়া,
হৃদয় আমার আকুল করে সুগন্ধধন লুটবে॥
আমার লজ্জা যাবে যখন পাব দেবার মতো ধন,
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে প্রাণের আরাধন।

BanglaBook.org

আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে পরশ তাঁরে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলো সব চরণে তার লুটবে॥

গান শেষ হতেই আমি অভ্রকে জড়িয়ে ধরলাম। টাঙাচালক বলল, 'বহুৎ বড়িয়া।'

আমি বললাম, 'ভাগ্যিস তোর চাকরি গেছে। নইলে তুই আমার কাছে আসতিস না, তোর গানও শোনা হত না।'

অভ্র হেসে বলল, 'গান তো আমার নয়, গান সাগরের। তুমিই তো বললে ক-দিন সাগর জীবনযাপন করতে। বললে না? তাতেই গান চলে এল।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'তুই কি ভাবনাচিন্তা করে গান গাইলি?'

অভ্র বলল, 'আমি ভাবনাচিন্তা করব কেন? দাড়িওলা ভদ্রলোকই তো সব চিন্তাভাবনা করে দিয়েছেন।'

'আমার কেমন যেন মনে হল, গানটা যেন মালঞ্চমালার। সে গাইছে, আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে/সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।'

অভ্র হেসে বলল, 'বুড়ো ভদ্রলোক সবার জন্য গান লিখে গেছে। তোমার, আমার সবার জন্য।'

আমি সকৌতুকে বললাম, 'বলিস কী! রবি ঠাকুর খুনিদের জন্যও গান লিখেছেন!'

'আলবাত লিখেছেন।'

রাতে শুয়ে শুয়ে মন্মথ তালুকদারের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তাগুলো একবার পুরো ঝালিয়ে নিলাম। আমাদের বললে ভুল হবে। মূল কথা বলেছে অভ্র। সেদিন আমার মুখ থেকে প্রজেক্টের নাম শুনে মন্মথ বলেছিল, 'বিষয়টা কী?'

আমি বললাম, 'স্যার, বিষয়টা তো আমি বলতে পারব না। অভ্র পারবে। প্রজেক্ট তার।'

মন্মথ তালুকদার অভ্রর দিকে তাকাল। অভ্র সামান্য হেসে বলল, 'প্রজেক্টটা শুধু ভাল নয়, একেবারে ইউনিক স্যার। আমরা নানা ধরনের পার্কের কথা জানি। চিলড্রেন্স পার্ক, ইকো পার্ক, ওয়াটার

পার্ক। এটা হবে মিউজিক্যাল গার্ডেন। গান-বাজনার বাগান।'

'মানে! পার্কের ভিতর স্টেজ বেঁধে গান-বাজনা হবে?'

অভ্র বলল, 'না না। ছড়ানো ছিটোনো এই গার্ডেনের একেকটা জায়গায় একেকরকম গান বাজবে। লাইভ প্রোগ্রাম নয়। কন্ট্রোলরুম থেকে বাজানো। গাছের আড়ালে, ফুলের বাগানে, ঝরনার পাশে, নুড়ি পথের গায়ে ছোট ছোট স্পিকার থাকবে। গানের জন্য জোন বা এলাকা ভাগ করা থাকবে। ধরুন কেউ রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে চান, তিনি চলে যাবেন টেগোর জোনে। সেখানে কাঠের বেঞ্চে বসলে, পাশের কামিনী ফুলের ঝোপ থেকে ভেসে আসবে কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাস। অথবা ধরুন, কেউ পুরোনো দিনের গান শুনবেন। তাঁকে যেতে হবে নস্টালজিয়া জোনে। পাড় বাঁধানো দিঘির পাশে বসে তিনি হয়তো শুনলেন, মন দিল না বঁধূ। আবার কেউ শালবনে শুয়ে শুয়ে শুনতে পারেন ক্লাসিকাল, সেমি ক্লাসিকাল। সবটাই খুব লো ভল্যুমে চালানো হবে।'

মন্মথ তালুকদার বলল, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং। মিউজিক্যাল গার্ডেন বলে পৃথিবীতে কিছু আছে বলে তো শুনিনি।'

অভ্র বলল, 'ঠিক পার্ক নেই, তবে কোনো কোনো দেশে পার্কে গান-বাজনা, পুলিশ ব্যান্ড শোনানোর ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে ফোয়ারার সঙ্গে বাজনা বাজানো হয়। তালে তালে জল নাচে। তাতে রংবেরঙের আলো পড়ে। ভাল না? ছেলেমানুষদের মজা। আমার এই প্রজেক্টের মতো গান-বাজনা ধরে ধরে এভাবে ভাগ করা নেই। চীনে শুনেছি, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ফুল ফোটানোর আওয়াজ শোনানোর ব্যবস্থা আছে। নকল নয়, আসল আওয়াজ। শহর থেকে দূরে গিয়ে জলের ধারে বসতে হয়। বাগানে টুপটাপ করে ফুল ফোটে। সেই আওয়াজ শোনা যায়।'

মন্মথ তালুকদারের চোখ মুখ চকচক করছে। ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচারের শিল্পী সত্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মিউজিক্যাল পার্কের কথা সে কখনো কল্পনাও করেনি! আমি নিস্পৃহ ভাবটা বেশি করে ফোটানোর জন্য উসখুস করতে লাগলাম। বললাম, 'আমাকে অনুমতি দিন আমি এখন যাই।'

BanglaBook.org

মন্মথ কঠিন চোখে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'চলে যাবে কেন?'

আমি বোকা বোকা ভাব করে বললাম, 'আমি এখানে থেকে কী করব স্যার? গান-বাজনার আমি কি বুঝি? তাছাড়া এই প্রজেক্ট তো আমার নয়। অভ্রর। সে আমাকে বলায় আমি বলেছিলাম, এসব বাগান, পার্ক সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ নেই। তবে তুমি যদি চাও আমি একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি। তিনি যদি শুনতে চান শুনবেন। এর বেশি আমি নেই। আমার হাতে জরুরি কাজ। তখন অভ্র বলল, থাক সাগরদা, আমি দু-একজন বড় কোম্পানির কাছে আগে অ্যাপ্রোচ করি। চাকরি ছেড়ে যখন এসেছি, তখন ভালভাবেই করব। এমনভাবে করব যাতে সবাই চমকে যায়। অনেকটা জায়গাও লাগবে। তখন আমার আপনার নতুন কেনা জমিটার কথা মনে পড়ে গেল। আমি অভ্রকে বললাম, তুই একবার আমার সঙ্গে গিয়ে দেখ না...।'

মন্মথ ঠান্ডা গলায় বলল, 'তুমি আর কথা না বাড়িয়ে বোসো সাগর। চুপ করে শোনো।' তারপর অভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা আজ একসঙ্গে লাঞ্চ করব। তারপর বলুন।'

অভ্র আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে মন্মথকে বলল, 'স্যার, লাঞ্চ করতে পারি, কিন্তু কাজটা আপনার সঙ্গে করব কিনা সেটা এখনই ফাইনাল করতে পারব না। অনেকটা জায়গা দরকার। নজরুল, অতুলপ্রসাদ থেকে আধুনিক, ফিল্মের গান, বাংলা ব্যান্ড—সব কিছুরই ব্যবস্থা থাকবে। কোনো ধরনের মিউজিক লাভারকে আমরা বঞ্চিত করব না। সকালবেলা ঢুকবে, সারাদিন গান শুনে সন্ধেবেলা ফিরবে। বুঝতেই তো পারছেন কতটা জায়গা লাগবে। টিকিট এবং স্পনসরশিপে ব্যবসা ভাল হবে বলেই আমার আশা। রাতেও ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। ধরুন পূর্ণিমার সময় শুধু চাঁদ বিষয় গান শোনানো হবে। খোলা মাঠে বসে বা জলে বোটিং করতে করতে শোনা যাবে। টিকিটটা বেশি হবে। তেমন আবার বর্ষার সময় বৃষ্টির গান।'

মন্মথ তালুকদার কেমন ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো বলল, 'এই বাগান আমি করব। মিউজিক্যাল গার্ডেন। যত টাকা লাগে আমি করব। কিন্তু গান ঠিক করবে কে?'

আমি দুম করে বলে বসলাম, 'সে আছে।'

মন্মথ তালুকদার আমার এই উত্তেজনায় খানিকটা অবাক হয়ে বলল, 'কে!'

আমি নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে ঠোঁটের পাশে হাসলাম। ম্যানেজ দেওয়া হাসি। তারপর স্মার্ট ভঙ্গিতে বললাম, 'স্যার, অভ্রর হবু গিন্নি গান-বাজনা ফিল্ডের মানুষ। ভারি সুন্দর গলা। অভ্র নিজের মুখে তো আর বউয়ের সুখ্যাতি করবে না, লজ্জা পাবে। তা-ই আমি বলে দিলাম। আপনারা যদি প্রজেক্টটা করেন তাহলে...।'

মন্মথ অভ্রর দিকে এবার যেন অন্যভাবে তাকালেন। নিশ্চয় মালঞ্চমালার কথা মনে পড়ে গেল। এটাই চাইছিলাম।

'আপনার হবু গিন্নির নাম কী?'

অভ্র হালকা লজ্জা পাওয়া ভঙ্গিতে বলল, 'সাগরদা বাড়িয়ে বলছে। অত কিছু নয়। রূপরেখা অল্প একটু গান-টান করে।'

মন্মথ চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'আমরা যদি প্রজেক্টটা করি উনি কি আমাদের সঙ্গে কাজটা করবেন?'

অভ্র আমার দিকে তাকাতেই আমি মাথা নেড়ে ইশারা করলাম। অভ্র বলল, 'মনে হয় না। ভীষণ মুডি। আর গান-বাজনা নিয়ে বিজনেস করব শুনলে বেঁকে বসতে পারে। তাছাড়া ওকে প্রয়োজনই বা কী? গান জানা মানুষের তো অভাব নেই। বিখ্যাত বিখ্যাত সব আর্টিস্ট আছেন। প্রজেক্ট করলে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

মন্মথ চেয়ারে হেলান দিয়ে এবার বলল, 'অভ্র, "বিউটিফুল" এই প্রজেক্ট করবে। গান আর বাগানের এই কম্বিনেশন আমি ছাড়ব না। আমি চোখের সামনে মিউজিক্যাল গার্ডেন দেখতে পাচ্ছি। বাগান জুড়ে মাঝেমধ্যে ছোট ছোট ঘর থাকবে। মাটির ঘর। সেখানে ফুচকা থেকে শুরু করে দামি ব্র্যান্ডের রেস্তোরাঁ থাকবে। ধরুন. আমরা এমন কয়েকটি কাচের ঘর বানালাম। বৃষ্টি আর জ্যোৎস্না দেখবার জন্য।'

আমি অভ্রর মুখের দিকে তাকালাম। ল্যান্ডস্কেপ শিল্পী ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেছে। আমার চোখের ইশারায় অভ্র বলল, 'সে আপনি করতে চাইলে করুন। কাচের ঘর, খড়ের ঘর যেটা আপনার ইচ্ছে

BanglaBook.org

আপনি করতে পারেন। আমি আরো কয়েকটা কোম্পানিকে প্রজেক্টটা বলতে চাই।'

মন্মথ তালুকদার এবার একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল। অভ্রর হাতটা চেপে ধরল। বলল, 'প্লিজ, এটা করবেন না। এই সংগীত উদ্যান আমার নিজস্ব প্রকল্প হবে। এক্সক্লুসিভ। সবাই জানবে "বিউটিফুল" এই জিনিস তৈরি করেছে। এই প্রজেক্টের দায়িত্ব আপনার। আপনি এতদিন কনস্ট্রাকশনের কাজ করে এসেছেন। আপনার কোনো সমস্যাই হবে না। আপনি এখনই আমার সঙ্গে নতুন জমিটা দেখতে চলুন। ফিরে এসে ফিনান্সের সঙ্গে বসব।'

আমি আড়মোড়া ভাঙলাম। কাজ হয়ে গেছে। কায়দা করে যাকে বলে 'ডান'। যেটুকু বাকি রইল সেটা খুব সহজ। একটা খুন। মালঞ্চমালা হত্যা।

আমি মন্মথ তালুকদারের দিকে তাকিয়ে অনুরোধের ঢঙে বললাম, 'এবার আমাকে ছেড়ে দিন। বাগান, সংগীত, জ্যোৎস্না, বৃষ্টি এসবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

মন্মথ তালুকদার কঠিন গলায় বলল, 'সাগর, এতদিন শুধু তোমার কথাই শুনেছি। আজ আমি বলব, তুমি শুনবে।'

সারাটাদিন আমাকে মন্মথ আর অভ্রর সঙ্গে থাকতে হয়েছে। আমি তেমনটাই চেয়েছিলাম। কোনোভাবে যাতে আমার ওপর সন্দেহ না তৈরি হয় তার জন্য বার বার চলে আসবার কথা বলেছি। কাল সকাল থেকে অভ্রকে "বিউটিফুল"-এর অফিসে চলে যেতে হবে। ও খুব খুশি। এত তাড়াতাড়ি একটা কাজ পেয়ে যাবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। মন্মথ তালুকদার প্রফেশনাল লোক। অভ্রকে টাকাপয়সার যা প্রস্তাব দিয়েছে তা ভাবা যায় না। এক সপ্তাহের মধ্যে সাইটের জন্য মেক শিফ্ট অফিস বানিয়ে ফেলা হবে। অভ্র সেখানে বসবে। সবটা শুনে অভ্র খানিকটা আমতা আমতা করেছিল। মন্মথ আর ভাববার সুযোগ দেয়নি। তার কোম্পানিতে করিতকর্মা লোকের অভাব নেই। কিন্তু অভ্রকে হাতছাড়া করতে চাইছে না। আসলে চায় না প্রজেক্ট কোনোভাবে হাতছাড়া হোক।

আমি বললাম, 'একটা জিনিস খেয়াল করেছিস অভ্র?'

BanglaBook.org

তক্তাপোশের ওপর থেকে অভ্র ঘুম ঘুম গলায় বলল, ‘কী?’

‘মন্মথ তালুকদারের তাড়াটা লক্ষ করিসনি!’

অভ্র পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, ‘সে তো প্রজেক্ট যাতে হাতছাড়া না হয় তার চিন্তা। আমি ভাবছি অন্য কথা।’

আমি বললাম, ‘কী কথা?’

‘একদিকে বউকে খুন করবার জন্য লোক লাগাচ্ছে, অন্যদিকে ঠাণ্ডা মাথায় মিউজিক্যাল গার্ডেন বানাচ্ছে। অদ্ভুত ঠেকছে না? কেমন সন্দেহ হচ্ছিল।’

‘এই সন্দেহ আমার গোড়া থেকেই হয়েছে অভ্র। হয়েছে বলেই এতদূর পর্যন্ত আসতে পারলাম। সত্যি কথা বলতে কী, আমি অ্যাসাইনমেন্টটা এমনি নিইনি। যাক এখন ঘুমিয়ে পড়। কাল থেকে তোর নতুন কর্মজীবন।’

অভ্র ফিসফিস করে বলল, ‘থ্যাঙ্কিউ সাগরদা। দুম করে বেকার হয়ে মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলাম। এবার তিনগুণ ইনকাম হয়ে ফিরে এল। মিউজিক্যাল গার্ডেনের প্রজেক্টটা কীভাবে যে তোমার মাথায় এল!’

আমি অন্ধকারেই হেসে বললাম, ‘আমার মাথা নিয়ে ভাবিতে হইবে না, নিজের পেট লইয়া চিন্তা করো। যাও বৎস, আগামীকাল হইতে তোমার সাগর জীবনের সমাপ্তি ঘটিল। গুড নাইট।’

আমি বসে আছি প্রফেসর শিবকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের ড্রয়িং রুমে। বসে আছি বেতের চেয়ারে গুটিসুটি মেরে। আমার মধ্যে কাঁচুমাচু ভাব। এরকম ভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। সাতসকালে আমার মতো গাধাকে যদি কোনো ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের বাড়িতে এসে বসতে হয় তাহলে সে কাঁচুমাচু হয়ে থাকবে না তো হাসিহাসি মুখে থাকবে? আমাকে এখানে আসতে হয়েছে শ্যামলদার অনুরোধে। শ্যামলদার গলায় একটা কাকুতিমিনতি স্টাইল ছিল।

‘একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। কালই যা।’

‘আমি! ইউনিভার্সিটির প্রফেসরের কাছে গিয়ে আমি কী করব শ্যামলদা। এ তুমি আমাকে কী বিপদে ফেলছ?’

BanglaBook.org

'লক্ষ্মী ভাইটি, আমার রিকোয়েস্ট। ভদ্রলোক আমার খুব চেনা। সমস্যায় পড়ে আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি একজন...আমার তোর কথা মনে পড়ল...না করিস না ভাই।'

শ্যামলদা মানুষটা অতিরিক্তরকম ভাল। এই শ্যামলদাই একবার বাড়িতে রান্নার মাসির ছেলের জন্মদিন পালন করেছিল। নম নম করে পালন করেনি, রীতিমতো লোক খাইয়ে, বেলুন ফুলিয়ে পালন করেছিল। 'আমার যা আছে কাহিনি'তে সেই রোমহর্ষক জন্মদিনের কথা আমি ডিটেইলসে বর্ণনা করেছি। অতিরিক্তরকম ভালমানুষদের অনেক সমস্যা। সাধারণ মানুষ এদের পুরোপুরি বুঝতে পারে না। ভুল বিচার করে। ঘাড়ে চেপে বসে। যাকে বলে পেয়ে বসে। ফলে এরা ক্ষণে ক্ষণে বিপদে পড়ে। শুধু নিজেরা বিপদে পড়ে না, অন্যকেও বিপদে ফেলে। যেমন আমাকে ফেলেছে। কিন্তু উপায় নেই। যতই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, আমি জানি, শেষ পর্যন্ত আমাকে মেনে নিতে হবে। শ্যামলদার অনুরোধ ফেলতে পারব না। তবু লড়াই চালিয়েছি।

আমি বললাম, 'উনি একজন কী চেয়েছেন? পণ্ডিত? নাকি গুণ্ডা? আমি তো কোনোটাই নই শ্যামলদা। ক-দিন পরে খুনি হবার একটা চান্স আছে।'

শ্যামলদা ধমক দিয়ে বলল, 'বাজে কথা রাখ। তুই একবার যা। উনি কী চান শোন। পারলে করবি, না হলে করবি না। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অত বড় পণ্ডিতমানুষকে কথা দিয়েছি...ব্যস। আমার কথাও রাখা হবে, আবার তোকে কিছু করতেও হবে না।'

আমি আকাশ থেকে পড়বার মতো গলায় বললাম, 'উনি আমার কাছে কী চাইবেন!'

'জানি না। আমাকে পুরোটা বলেনি। তুই একবার শুনে আয় না বাবা। তাহলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।'

আমি খড়কুটো আঁকড়ে ধরবার মতো করে বললাম, 'অন্য কাউকে পাঠাব? লেখাপড়া জানা কাউকে? কয়েকদিন হল অভ্র নামে একজন আমার কাছে এসে আছে। খুব বড় কাজ পেয়েছে। ওকে পাঠাই?'

শ্যামলদা এবার অভিমানাহত গলায় বলল, 'থাক, তোকে যেতে হবে না। আমি তো তোকে কিছু করে দিতে বলিনি, শুধু দেখা করতে বলেছি।'

এরপর না এসে পারা যায়?

প্রফেসর শিবকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের বয়স ওপরের দিকে। সকালবেলাই ধুতি পাঞ্জাবি পরে ফেলেছেন। আমার উলটো দিকের চেয়ারে বসে পাথরের গেলাসে কী যেন খাচ্ছেন। ছোট ছোট চুমুক। কী খাচ্ছেন? নিমপাতার শরবত? হতে পারে। পণ্ডিত মানুষ। রবিঠাকুরের অভ্যেস ফলো করতেই পারেন। চশমার ওপর দিয়ে প্রফেসর আমাকে দেখলেন। পছন্দ হল বলে মনে হল না। অবশ্য পছন্দ অপছন্দটা নির্ভর করে কী কাজ তার ওপর। অভিনেতা পছন্দ, জামাই পছন্দ, পকেটমার পছন্দ—সব আলাদা আলাদা। গাবদাগোবদা চেহারার ছেলেকে জামাই হিসেবে পছন্দ হতে পারে, সিনেমা থিয়েটারের নায়ক হিসেবে হবে না। আবার চিমসে, পটাস না হলে পকেটমার মানায় না। তবে পছন্দ না হওয়ার বিষয়টা প্রফেসর বুঝতে দিলেন না। লেখাপড়া শেখার এই এক সুবিধে। মন যা বলে মুখ তা বলে না।

পাথরের গেলাসে চুমুক দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'আপনি কি আমার সম্পর্কে কিছু জানেন সাগরবাবু?'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'আপনি একজন পণ্ডিত মানুষ।'

'আমি তা বলিনি। আমার গবেষণার বিষয় নিয়ে কি শ্যামল আপনাকে কিছু বলেছে?'

আমি মাটিতে মিশে যাওয়া টাইপ ভঙ্গি করে বললাম, 'কী যে বলেন স্যার, আমি গবেষণার কী বুঝব?'

চশমার ফাঁক দিয়ে প্রফেসর আর একবার আমাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সাগরবাবু, ঝরাবাদল সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

এই রে! আমার পরীক্ষা নিচ্ছে নাকি? আমি একটু মাথা চুলকে বললাম, 'আপনি বৃষ্টির কথা বলছেন স্যার?'

BanglaBook.org

প্রফেসার বড় করে শ্বাস নিয়ে বললেন, ‘বাঁশফুল সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে?’

এ তো আচ্ছা ঝামেলা! শ্যামলদা আমাকে এ কোথায় পাঠাল?

‘চিন্তা করবেন না। যা মনে হচ্ছে তা-ই বলুন।’

আমি লজ্জা পাওয়া গলায় বললাম, ‘স্যার, একধরনের ফুলই হবে।’

‘গুড। রাঁধুনি পাগল শব্দটা শুনেছেন কখনো?’

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, ‘আমার বড়মামিমা স্যার একজন রাঁধুনি পাগল মহিলা ছিলেন। রান্নাঘর ছাড়া জীবনে আর কিছু জানতেন না। সকালে ঢুকতেন, বেরোতেন সূর্য ডোবার আগে আগে।’

পাথরের গ্লাসের শেষটুকুতে লম্বা চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখলেন শিবকান্তি। মৃদু হাসলেন। মূর্খের প্রতি পণ্ডিতের হাসি? তারপর মুখ তুলে বললেন, ‘সাগরবাবু, ঝরাবাদল, বাঁশফুল, রাঁধুনি-পাগল এগুলো সব একেকটা ধানের নাম।’

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, ‘ধান!’

‘হ্যাঁ ধান। একসময় ছিল, এখন অধিকাংশ হারিয়ে গেছে। রাজভোগ, দুধরাজ, গন্ধরাজ, পক্ষিরাজ নামেও ধান ছিল। রাজভোগ ধানের চাল ছিল চিকন। লম্বা লম্বা। সাদা ভাত হত। পক্ষিরাজ ধানের চাল দিয়ে হত চিঁড়ে মুড়ি। রাঁধুনি-পাগল চালে ভাত রান্না করবার সময় সুগন্ধে রাঁধুনির পাগল পাগল অবস্থা হত।’

আমি চমৎকৃত। বললাম, ‘কী বলছেন স্যার! এমন সুন্দর নাম!’

শিবকান্তিবাবু ‘কেমন দিলাম’ গোছের মাথা নেড়ে বললেন, ‘শুধু নাম সুন্দর নয়, চালও সুন্দর ছিল। সাগরবাবু, বাংলায় প্রায় ১৫ হাজারের বেশি ধান চাষ হত। বেশিটাই আর হয় না।’

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, ‘বলেন কী স্যার!’

প্রফেসর মাথা নেড়ে বললেন, ‘হ্যাঁ। আমি এসব কথা বললাম এই কারণে, আমার গবেষণার বিষয়টাই হল বাংলার হারিয়ে যাওয়া ধান। আমার আপনার কাছে সাহায্য চাই।’

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, ‘স্যার এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কী সাহায্য করব? আমার কী ক্ষমতা?’

BanglaBook.org

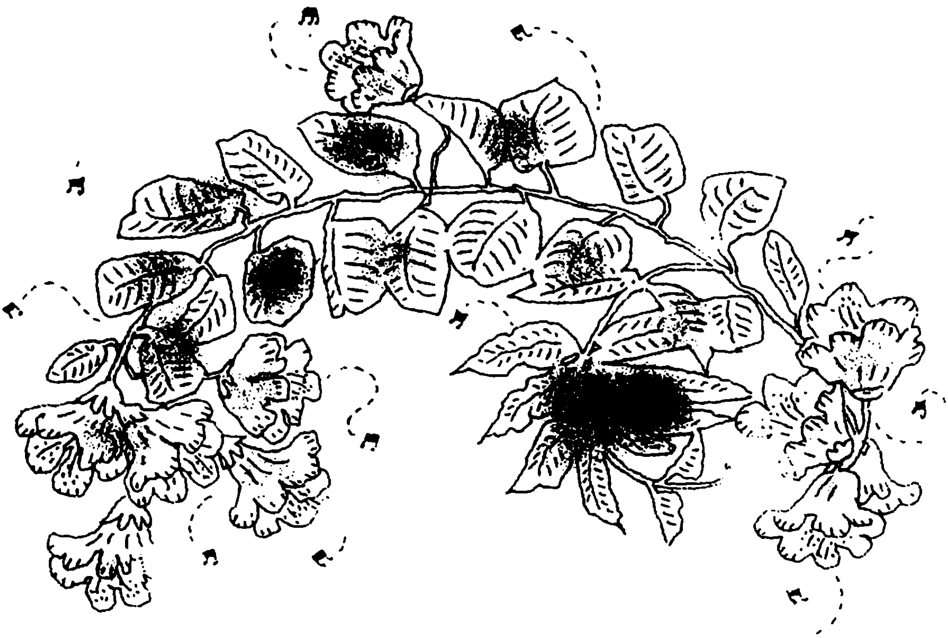

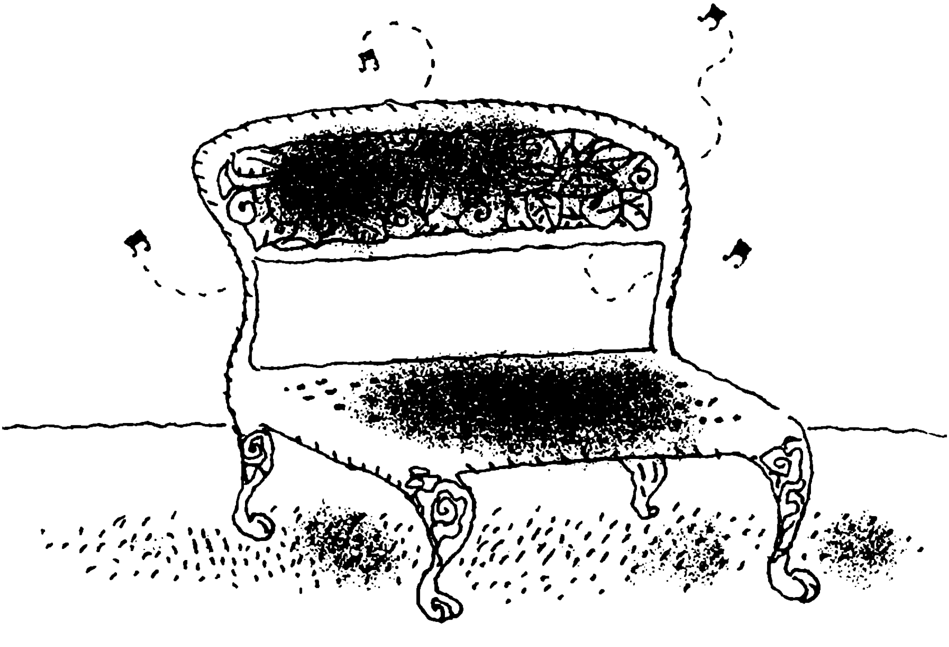

প্রফেসর একটু চুপ করে থেকে শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'যার ক্ষমতা আছে এমন কোনো লোকের কাছে আমাকে আপনি নিয়ে যাবেন।'

'যিনি চাষ করেন? কৃষক?'

'না, কৃষক নয়। যিনি কৃষকদের ওপর মাতব্বরি করেন। নেতা। পাওয়ারফুল পলিটিক্যাল লিডার চাই।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'লিডার!'

এরপর প্রফেসর শিবকান্তি চট্টোপাধ্যায় যা বললেন, তা শুনে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়! বাংলার হারিয়ে যাওয়া ধান নিয়ে সুইডেনের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন ক্লাস নিতে। মোট একমাসের সফর। ডলারে পেমেন্ট। কিন্তু আরো একজন লাইনে আছেন। বর্ধমানে আউসগ্রাম না কোথাকার এক বৃদ্ধ কৃষক। একসময় নিজের হাতে চাষবাস করেছেন। ওঁর বইতে জ্ঞান নয়, হাতেনাতে জ্ঞান। এখন সংশয়, শেষ পর্যন্ত ধান নিয়ে বিদেশে কে পড়াবেন? বই পণ্ডিত না মাঠ পণ্ডিত? সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের দিকে ঝুঁকে আছে। প্রফেসর এই সুযোগ ছাড়তে নারাজ। তিনি চান রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বর্ধমানের কৃষককে ঘ্যাচাং করতে।

আমি দেরি করলাম না। ক্ষমতাবান কারও খোঁজ পেলেই 'খবর দেব' বলে প্রফেসরের গৃহত্যাগ করেছি। এমুখো আর হচ্ছি না। আমি মনে প্রাণে চাই, প্রফেসরের বদলে ওই কৃষক ভদ্রলোক সুইডেন যান। খেটো ধুতি আর ফতুয়া পড়ে ক্লাস নেবেন বাংলায়। দোভাষী বুঝিয়ে দেবে। ছাত্রছাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে আমাদের ধানকাহিনি শুনবে। গর্বের ধানকাহিনি। আর একটা জিনিস ঠিক করে ফেলেছি। অভ্রদের সংগীত উদ্যানের এক কোনায়, একফালি জমিতে রাঁধুনি-পাগল ধানের চাষ হবে। নবান্ন উৎসবের দিন ওখানে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান বাজবে—কাস্তেটাকে দিয়ো জোরে শান/তোমার কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান/কিষাণ ভাই রে...ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান।'

একত্রিশ

ভালবাসা বিষয়টা ঠিক কীরকম?

কঠিন প্রশ্ন। কঠিন এবং জটিল। অনন্তকাল ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা চলছে। উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না এমন নয়। উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। সেই উত্তরের নানাধরনের সাইজ। কখনো ছোট, অবজেকটিভ টাইপ। কখনো বড়, এসে টাইপ। মনে হচ্ছে, এই ব্যাপারে খুব শিগ্‌গিরই এমসিকিউ টাইপও চালু হয়ে যাবে। ভালই হবে। এখন হল 'মালটিপ্‌ল চয়েস'-এর যুগ। সবসময় সামনে গাদাখানেক অপশন। একটা পছন্দ করে টিক মেরে দিলেই চলে। শুধু প্রশ্ন নয়, জীবনযাপনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই মালটিপ্‌ল চয়েসের সুবিধে। বেশি মাথা খাটানোর দরকার নেই। তোমার সামনে আসছে রাস্তা। টক করে বেছে নাও। একটা উদাহরণ দিই। ধরা যাক, কেউ ঝাঁ চকচকে শপিংমলে ঢুকে দেখল সামনে সারি সারি জিনিস সাজানো। বারোরকমের জামাকাপড়। আউচ। কী সুইট! একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে নয়, একেবারে বারোটা অপশন দিয়েছে। এর মধ্যে একটা নিলেই চলবে। এই সুযোগ জীবনে আর আসবে? বারোর মধ্যে বেছে নেওয়ার সুযোগ? ফট করে নেওয়া হয়ে যায়। কে এই সুযোগ হারাবে? মনে থাকে না, ওই সাজানো বারোরকমের জামাকাপড়ের পরেও তেরো নম্বর একটা অপশন ছিল। সেই অপশনটা হল—'একটাও নিয়ো না। তোমার অনেক আছে। তুমি তো জামা কিনতে শপিংমলে আসোনি। যা কিনতে এসেছ সেটুকু নিয়েই মানে মানে কেটে পড় সোনা। নইলে টাকা খসবে।' দুঃখিত, কেটে পড়বার কোনো সুযোগ নেই। শপিংমলের মালটিপ্‌ল চয়েসে এই তেরো নম্বর অপশনটি রাখা হয়নি। আচ্ছা, মালটিপ্‌ল চয়েসের জুতসই বাংলা কী? অনেকরকম পছন্দ? ঠিক হচ্ছে না। পছন্দের সুযোগ থাকে অনেক,

BanglaBook.org

কিন্তু বাছতে হয় মূলত একটাই। তাহলে অনেক পছন্দ কী করে হল? গাদাখানেকের মাঝে একটা পছন্দ। থাক, অত বাংলা বাংলা করবার কিছু নেই। মালটিপ্‌ল চয়েসই চলবে। মানুষ বুঝতে পারলেই হবে। কখনো কখনো মনে হয়, ভাষা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বাড়াবাড়ি ভাল, বড্ড বাড়াবাড়ি ভাল না। সময়ের সঙ্গে সব কিছু বদলায়। আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঙালিকে আন্দামানের জেলে যেতে হত। জেলে গিয়ে দড়ি পাকাতে হত। এখন সেই ব্রিটিশদের দেশে গিয়ে বাঙালিরা দাপটের সঙ্গে কাজকর্ম করে। ইংরেজরা তাদের সামনে হাত কচলায়। সম্মান দিতে বাধ্য হয়। একটা সময় ভাবা যেত? সময়ই বদলে দিয়েছে। ভাষাও সেরকম। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে হয়। ভাষা ভাষা করা ভাল, তবে তার সঙ্গে ভাতের কথাও বলতে হবে। যে ভাষা ভাত দেয় না সে-ভাষা ক্রমশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। গলা ফাটিয়ে লাভ হয় না।

যাইহোক, মূল কথায় ফিরি। জীবন এখন মালটিপ্‌ল চয়েসের মুঠোয়। আসল প্রশ্নটা হল—

প্রশ্ন তুমি কীভাবে খাবে?

উত্তর (১) একা খাব (২) একা একা খাব (৩) একা একা আর একা খাব (৪) একা একা একা এবং একা খাব।

অতি গাধাতেও এবার ঠিক উত্তর খুঁজে নিতে পারবে। আগে সমস্যা ছিল। সামনে এত অপশন ছিল না। ফলে অনেকেই গুলিয়ে ফেলত। মিটিং, মিছিল, লাঠিগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ত। তারা ভাবত, মানুষ কখনো একা খায় নাকি! দুর! সে পশুর কাজ। মানুষ তো আর পশু নয়। তুমি কীভাবে খাবে তার উত্তর হবে তুমি আর আমি মিলে খাব। আরো ভাল উত্তর হল সবাই মিলে খাব। আরো একটা হতে পারে। যদি সবাই না পাই তাহলে কেউ খাব না। গাধার গাধা।

ভালবাসার প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে চলে গেলাম? সাগর হওয়ার এই এক মুশকিল। কাছে দূরে গোলমাল হয়ে যায়। দূরের আকাশকে কাছে মনে হয়। দূরের মানুষকে হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলি। দূরের সুর কান পাতলেই শুনতে পাই। কী জ্বালাতন, যাক, ভালবাসায় আসি। ভালবাসা বিষয়ে বড় বড় মানুষদের অনেক বড় বড় কথা

BanglaBook.org

আছে। আমার বন্ধু বাসুদেবের খুড়তুতো দাদা প্রেম সম্পর্কে যেখানে যা উদ্ধৃতি পেত কাঁচি দিয়ে কেটে খাতায় সেঁটে রাখত। দাদা এই কাজ করত মূলত আমাদের পাড়ার লাইব্রেরি থেকে। প্রেমপত্র লেখবার জন্য যার যখন যেমন দরকার বাসুদেবের দাদাকে গিয়ে ধরত। সেই সময় নেট, মেসেজ এইসব ছিল না। হাতে-লেখা চিঠি-মিঠিই চলত। খুড়তুতো দাদা ছেলের বয়স বুঝে উদ্ধৃতি সরবরাহ করতেন। কম বয়স হলে, 'প্রেমের সমাধিতলে...' ধরনের নিরামিষ, বয়স একটু বেশি হলে একটু আঁশটে। হালকা পলকা ছোঁয়া, একটু চুমু চুমু ভাবও থাকত। সেই দাদার নাম হয়ে গেল 'প্রেম সংগ্রাহক'। যদিও খুব শিগ্‌গিরই, 'প্রেম সংগ্রাহক' লাইব্রেরির লোকজনের হাতে ধরা পড়ে যায়। বিভিন্ন বইতে ব্লেড চালানোর ঘটনা কতদিন গোপন থাকবে? তারপরের ঘটনা কী ঘটেছিল ভাল জানি না। তবে 'প্রেম' শব্দটা শুনলেই দিবাকরের খুড়তুতো দাদার হেঁচকি উঠত। নাম 'প্রেম সংগ্রাহক' থেকে বদলে হল 'প্রেম হেঁচকি'।

তাহলে ভালবাসা মানে কি হেঁচকি?

কে জানে। ভালবাসা সম্পর্কে নানা মত। কোনো মত কঠিন, কোনো মত ন্যাকা ন্যাকা। কঠিন মত বলে, প্রেম এত ইন্টারেস্টিং তার কারণ প্রেমের পিছনে রয়েছে শরীর। ভালবাসা হরমোনের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ বলে ভালবাসায় শরীর নয়, আসল হল মন। মনের হাতে সে বাঁধা। মন যা চায় ভালবাসা তা-ই করে। আমার মত অন্যরকম। ভালবাসা ধরা যায় না বলেই সে এত ইন্টারেস্টিং। সে কখনো শরীরের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলে, 'তুমি কি আমায় চেনো? আমায় ধরতে পারো?' কখনো মনের পাশে গুনগুন করে বলে, 'দেখি আমায় ধরো তো।' মানুষ বার বার চেষ্টা করে তাকে ধরতে। বার বার ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় বলেই হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় ফের। জ্যোৎস্নার মতো, রোদের মতো, কচি লেবুর গন্ধের মতো সে ধরা দেয় এবং দেয় না।

আমি বসে আছি মালঞ্চমালার পাশাপাশি। না, তার ফ্ল্যাটে নয়। বসে আছি অভ্র সংগীত উদ্যানে। গোটা এলাকা জুড়ে হইহই করে কাজ চলছে। কয়েকশো লেবার ছোটাছুটি করছে। কেউ মাটি কাটছে,

কেউ বাগান করছে, কেউ ছোট ছোট কটেজের ছাউনি বানাচ্ছে। একদিকে চলছে ঝরনার কাজ। একদিকে ফোয়ারা। একদিকে গাছ এনে তৈরি হচ্ছে নকল শালবন। ক্রেন, লরি, গাড়ি যাতায়াত করছে ধুলো উড়িয়ে। গোটা জমিটা বড় পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সব কিছু তদারকির জন্য মাথার ওপর আছে আমাদের অভ্র। হারামজাদা খাটছে বটে। রাতদিন এখানে পড়ে আছে। মন্মথ তালুকদার এখন অভ্রকে 'তুমি' করে কথা বলে। বলেছে, 'টাকাপয়সা নিয়ে ভাববে না। বাগানটা যত তাড়াতাড়ি পারো বানিয়ে ফেলতে হবে।' অভ্র যখন কাজের দায়িত্ব নিয়েছে তখন নিজের টাকাপয়সা নিয়ে দরাদরি করেনি। সে শুধু দুটো শর্ত দিয়েছে।

মন্মথ ভুরু কুঁচকে বলেছে, 'শর্ত! কী শর্ত?'

'এক নম্বর হল, যতদিন ধরে কাজটা চলবে আপনি আর আপনার কোম্পানি বিউটিফুল থাকবেন আড়ালে। কেউ যেন জানতে না পারে।'

মন্মথ তালুকদার একটু ভেবে বলল, 'কেন?'

আমরা জানতাম মন্মথ তালুকদার এই প্রশ্ন করবেন। অভ্রকে আমার উত্তর শেখানো ছিল। সে বলল, 'সবার সামনে এটা একটা সারপ্রাইজ হবে।'

মন্মথ তালুকদার বলল, 'তাতে আমার লাভ?'

অভ্র হেসে বলেছিল, 'এই বাগান মানুষকে এমনিতেই বিস্মিত করবে। হঠাৎ জানতে পারলে বিস্ময়টা অনেকগুণ বেশি হবে। সেই কারণে। জীবনের সব কিছুই তাই। মানুষ আসলে যা ভালবাসে তা হল বিস্মিত হতে।'

অভ্র আমাকে রিপোর্ট করেছে, মন্মথ অভ্রর এই ফিলজফি শুনে বিস্মিত হয়। বলে, 'রাজি। নেক্সট?'

'কাজ কীভাবে হবে, কোন কাজ কাকে দিয়ে করাব সে-ব্যাপারে আপনি কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। আপনার কোম্পানির পুরোনো কন্ট্রাক্টরদের নেব না। এই লাইনে আমি অনেকদিন ছিলাম। সুতরাং কাজের লোক পেতে আমার সমস্যা হবে না।'

মন্মথ এটায় বেঁকে বসে। বলে, 'সে কী! আমার এতদিনের

BanglaBook.org

মজুর, মিস্ত্রি, মালি কেউ কাজ করবে না! তারা তো বড় বড় ল্যান্ডস্কেপিং করেছে। নামকরা কোম্পানির কাজ। আমার লোক করলে খরচও কম হবে।'

অভ্র বলেছে, 'আমি মানছি আপনার লোক বড় বড় কাজ করেছে। বাগানে ফুল ফুটিয়েছে, ঝরনা বানিয়েছে, নুড়ি পাথরের পথ করেছে, কিন্তু তারা কখনো গান গেয়ে ওঠেনি। গানের ঝরনা, নুড়িপথ, ফুলের ঝাড় অন্য জিনিস। শুধু গোপনে ছোট ছোট স্পিকার বসিয়ে দিলেই হবে না। কেন বসাচ্ছি সেটাও জানতে হবে।'

'তুমি বলে দেবে। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়র পাঠিয়ে দেব। তারা তোমার অর্ডারে কাজ করবে।'

অভ্র এবার কঠিন গলায় বলল, 'ইঞ্জিনিয়র থেকে সাধারণ মুটে পর্যন্ত—সবাইকে আমি ঠিক করব। সংগীত সম্পর্কে মিনিমাম জ্ঞানগম্যি না থাকলে কাউকে ঢুকতে দেব না। সে ক্লাসিকালই হোক আর দেহাতিই হোক। আপনি শুধু পেমেন্টের সময় হিসেব বুঝে নেবেন। কাজ শেষ হলে কাজ বুঝে নেবেন। স্যার, এতে যদি রাজি থাকেন তবেই আমি আপনার সঙ্গে থাকব। নইলে বিদায়। বড় মাইনের চাকরি থেকে বিদায় নেওয়া আমার পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়।' এরপর মন্মথর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলেছে, 'এটা আমার ড্রিম প্রজেক্ট। স্বপ্নের বাগান। একে নষ্ট করব না। আপনি তো পরিকল্পনাটা জেনেই গেলেন। এবার আপনি আমার মতো করে নেবেন। আমি যদি অন্য কোথাও সুযোগ পাই...না পেলে করব না।'

মন্মথ তালুকদার নিজেও শিল্পী মানুষ। তার ওপর এই বাগান সম্পর্কে নিশ্চয় তার খুব বড় ধরনের কোনো আশা তৈরি হয়েছে। সে মাথা নামিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, তা-ই হবে। আমি আর আমার কোম্পানি আড়ালেই থাকব। তুমি তোমার মতো কাজ করো।'

অভ্র তখন হেসে বলেছিল, 'না স্যার, আমি আমার মতো করব না। গাছপালা, ফুল, বাগানের নকশা তৈরির ব্যাপারে আপনি একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ মানুষ। আপনিই বলতে পারবেন কোন ধরনের ফুলের ঝাড়ের পাশে কোন ধরনের বেঞ্চ পাতা হলে সবথেকে বেশি মানাবে। নুড়িপথের ধারে কোন ধরনের পাথরের ওপর বসে মানুষ

গান শুনতে পছন্দ করবেন। এসব ডিজাইন কেমন হবে আপনার থেকে ভাল কে বলতে পারবে? প্রতিটা অংশ আপনাকে জিগ্যেস করেই আমি চলব। তবে গোপনে। আপনি বলে বলে দেবেন আমি সেটাকে চেহারা দেব। আপনার কথা মানুষ জানতে পারবে কাজ শেষ হলে।'

মন্মথ তালুকদার নাকি আবারও বিস্মিত হয় এবং অস্ফুটে বলে, 'ধন্যবাদ।'

অভ্র সেইমতো কাজ করছে। গাছ বড় হতে সময় লাগবে বলে কিছু কিছু বড় গাছ নার্সারি থেকে এনে সরাসরি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফুল-টুল সুদ্ধু কয়েক হাজার টব এসেছে। জাপানি স্পিকার কোম্পানি গোটা বাগান জুড়ে তার বসাচ্ছে। তার স্পিকার কোনোটাই দেখা যাবে না। গান-বাজনা চালানোর জন্য আধুনিক কন্ট্রোলরুম হচ্ছে। তাতে অনেক চ্যানেল থাকবে। চ্যানেল দিয়ে বাগানময় গান ছড়িয়ে পড়বে। কখন কোথায় কী গান বাজানো হবে তার পরিকল্পনা করবার জন্য রূপরেখার সঙ্গে অভ্র কথা বলেছিল। সংগীতবাগানের এটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গান-বাজনার ওপরেই এই বাগানের সবটা নির্ভর করছে। কিন্তু কাজ শুরুর মুখে মুখে রূপরেখা জানায়—কাজ সে করবে না। তবে বিকল্প একজনের কথা বলতে পারে। তিনি যদি রাজি হন সবথেকে ভাল হবে। এই মানুষটির নাকি ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন এবং গান দুটোর ওপরই দখল আছে। অভ্র যদি ইচ্ছে করে কথা বলতে পারে।

অভ্র মালঞ্চমালাকে রাজি করিয়েছে। মিউজিক্যাল গার্ডেনের পরিকল্পনা শুনে সে লাফিয়ে উঠেছে।

'কারা করছে?'

অভ্র অবাক হওয়ার ভান করে বলে, 'কারা মানে? ম্যাডাম, আপনি ঠিক কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

মালঞ্চমালা বলে, 'টাকা ইনভেস্ট করছে কে?'

অভ্র হেসে বলেছে, 'ম্যাডাম, আপনার পেমেন্টে কোনো অসুবিধে হবে না। আমাকে দেখে কি আপনার ভরসা হচ্ছে না?'

মালঞ্চমালা আর কথা বাড়ায়নি। প্রবল উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে

পড়েছে। অত বড় বাগান ঘুরে ঘুরে গানের জন্য আলাদা আলাদা জায়গা ভাগ করছে। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, বাউল থেকে ব্যান্ড, বাংলা রক—সবই থাকবে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ তো থাকছেই। এ সবই আমার অভ্রর মুখে শোনা। সে রোজ আমাকে রিপোর্ট দেয়। আজ প্রথম এখানে এসেছি। বসে আছি যে জায়গাটায় তার সামনে একটা দিঘি। জমিতে আগেই ছিল। সেখানে লাল সিমেন্টের ঘাট হচ্ছে। ঘাটের আড়ালে আবডালে রাখা হচ্ছে গান-বাজানোর স্পিকার। জিন্‌স, সবুজ টপ আর মাথায় বড় টুপি পরে কাজের তদারকি করছে মালঞ্চমালা। আমায় পাশে বসতে দিয়েছে।

'আপনি এ জায়গার খোঁজ পেলেন কোথা থেকে?'

আমি অল্প হাসলাম, 'ম্যাডাম, আপনি আমার শিকার। শিকারের খোঁজ পেতে কি শিকারির কখনো অসুবিধে হয়?'

'বাজে কথা রাখুন। আপনার খুনের কী হল?'

আমি নীচু গলায় বললাম, 'মোটামুটি ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এবারে আপনি রাজি হলেই হয়ে যায়।'

মালঞ্চমালা বলল, 'আমি তো আপনাকে বলেই দিয়েছি, আমি রাজি। শুধু কয়েকটা দিন...।'

মালঞ্চমালা চুপ করে গেলে আমি বললাম, 'কয়েকটা দিন কী?'

'এই কাজটা শেষ করতে চাই।'

আমি চারপাশে তাকিয়ে বললাম, 'এখানে কী হচ্ছে?'

মালঞ্চমালা নিষ্ঠুর হেসে বলল, 'বিউটিফুল কোম্পানির কবরে পেরেক পোঁতা হচ্ছে। এই জিনিস শেষ হলে আপনার বসের কোম্পানিকে আর এখানে করে খেতে হবে না। পাততাড়ি গুটোতে হবে। আমি ঠিক করেছি, ভবিষ্যতে অভ্র ছেলেটিকে আমার ব্যবসায় নিয়ে নেব। ওর কল্পনা শুধু আমাকে মুগ্ধ করেনি, আমার স্বপ্নকে...আমার স্বপ্নকে...।'

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, 'ম্যাডাম, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। অভ্র কে? এখানেই বা কী হচ্ছে!'

মালঞ্চমালা উঠে দাঁড়িয়ে হাসল। বলল, 'আসুন সাগরবাবু আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাই। সব বুঝিয়ে বলি। যদিও বাইরের কাউকে

BanglaBook.org

কিছু জানানো হচ্ছে না। তবু আপনাকে বললে মনে হয় অসুবিধে নেই। আপনি আলাদা মানুষ। একজন খুনি। হয়তো খুনের জন্য এই জায়গাটা আপনার পছন্দ হয়ে যাবে। গানের মধ্যে মরতে আমার ভালই লাগবে।'

এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছি। মালঞ্চমালাকে আজ যেন বেশি সুন্দর লাগছে। এই সৌন্দর্য শরীরের নয়। স্বপ্নের। স্বপ্ন সত্যি হওয়ার।

BanglaBook.org

বত্রিশ

কোন শেষটা ভাল? রয়েসয়ে শেষ? নাকি হঠাৎ শেষ?

জানি না। তবে দেখেছি, বহু ভাল জিনিস হঠাৎই শেষ হয়। কোনো কোনোদিন ঝপ করে দিন ফুরোয়। কাউকে খবর না দিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় অচেনা পাখি। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ কোথা থেকে ফুলের গন্ধ নিয়ে উড়ে আসে বাতাস। ফুল চেনার আগে সেই বাতাস মিলিয়েও যায়। কখনো বিকেলে পূর্বাভাস ছাড়া হঠাৎ মেঘে মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ। অঝোরে বৃষ্টি নামে বিনা নোটিশে। বেশি রাতে দুম করে মস্তবড় চাঁদ ওঠে। সে তো হঠাৎই। জ্যোৎস্নায় হইচই পড়ে যায়। আমরা আগে কিছুই জানতে পারি না। হঠাৎ আসা ভালবাসার মতো সুন্দর জিনিস এই পৃথিবীতে আর ক-টা আছে?

মন্মথ, মালঞ্চমালার গল্পও হঠাৎই শেষ হল। আমি জানতাম শেষ হবে, কিন্তু এভাবে শেষ হবে বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, নিজে হাতে শেষ করব। ওরা দুজন আমাকে সেই সুযোগ দিল না। দুনিয়ার এটাই নিয়ম। শুরু, শেষ কারো হাতেই থাকে না।

সংগীত উদ্যান যেদিন উদ্‌বোধন হবে তার আগের দিন আমি মন্মথ তালুকদারকে ফোন করি।

'স্যার, ভাল আছেন? আমি সাগর।'

'কী ব্যাপার সাগর! এতদিন কোথায় ছিলে? তোমাকে তো টেলিফোনে ধরতেই পারছি না। তমালবাবুকেও খবর দিলাম। তিনি কিছু বলেননি?'

আমি বিনয়ের হেসে বললাম, 'দুঃখিত স্যার। আমার সঙ্গে আর মোবাইল ফোনটা নেই। নন্দ দেশের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে, তাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছি। আমি স্যার বুথ থেকে ফোন করছি। ঠিক বুথ নয়, গঙ্গার ঘাটে টুলের ওপর একজন ফোন নিয়ে বসে।'

BanglaBook.org

মন্মথ অবাক এবং বিরক্ত গলায় বলে, 'নন্দ! সে কে? তুমি তাকে তোমার ফোন দেবেই বা কেন?'

'স্যার, নন্দ আমার বন্ধু। পেশায় ভিক্ষুক। ফোনে ভিক্ষার স্পট ঠিক করে। দেশে যাবার আগে তার ফোনটা আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। এই ক-দিন স্যার ওর ঝুপড়ি নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। তমালের ওখানেও যেতে পারিনি। পুলিশ নন্দদের ঝুপড়ি ভেঙে দিয়েছিল। ওরা মোমবাতি মিছিল-টিছিল করে ক-দিন খুব হইচই করল। কাগজে বেরোল, টিভিতে দেখাল। ওদের আবার গঙ্গার ধারেই খানিকটা নতুন জায়গা দিয়েছে। আমি সেই ঝুপড়ি বানানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ক-দিন ভদ্রলোকদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।'

আমার ঝুপড়ি বানানোর কথা শুনে মন্মথর মনে হয় কথা আটকে গিয়েছিল। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'তুমি ঝুপড়ি বানাচ্ছিলে! অভ্র কী অপূর্ব একটা কাজ শেষ করে ফেলেছে সে-খবর কি তুমি জানো? খবর রাখ?'

আমি হেসে বললাম, 'না, রাখি না। তবে ও যে কাজটা খুব ভালভাবে করতে পারবে সেটা জানতাম। স্যার, এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম। কেউ ভিখিরিদের জন্য ঘর বানাবে, কেউ সংগীত উদ্যান তৈরি করবে। প্রকৃতিতে ব্যালান্স রক্ষা করতে গেলে দুটোরই দরকার আছে। তাই না?'

BanglaBook.org

মন্মথ তালুকদার কড়া গলায় বলল, 'সাগর, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। এখনই একবার তোমাকে আমার এখানে আসতে হবে।'

'সম্ভব নয় স্যার। আজ নন্দদের নতুন ঝুপড়ির ফিতে কাটা।'

'ঝুপড়ির ফিতে কাটা!'

আমি লজ্জা লজ্জা গলায় বললাম, 'হ্যাঁ স্যার। আমাকে খুব করে ধরেছে। আমার এক বান্ধবীকে বলেছি। মেঘলা। মেঘলা একজন স্বপ্ন গবেষক। আরো লেখাপড়া করতে কালই বিদেশে চলে যাচ্ছে। আপনি শুনলে খুশি হবেন, লেখাপড়া জানা এই মেয়ে ঝুপড়ি উদ্‌বোধনে রাজি হয়েছে। নন্দদের মতো মানুষদের কাছে মাথা গোঁজার এই ঠাঁইটুকু আসলে স্বপ্নের মতোই।'

মন্মথ বিরক্ত গলায় বলল, 'এটাই তোমার জরুরি কথা?'

আমি সামান্য চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বললাম, 'না স্যার এটা নয়। জরুরি কথা অন্য। একটা ইনফরমেশন চাই। মালঞ্চমালা-দেবীকে খুন করবার জন্য এই ইনফরমেশনটা জরুরি। আপনি...আপনি স্যার... কোন গান শুনে ওঁর প্রেমে পড়েছিলেন? গানটা কি আপনার মনে পড়েছে?'

মন্মথ তালুকদার ওপাশে চুপ করে রইল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু...।'

আমি চাপা গলায় দ্রুত বললাম, 'কোনো কিন্তু নয় স্যার, আপনি বলে ফেলুন। হত্যাকাণ্ডের যাবতীয় পরিকল্পনা শেষ। শুধু ওই গানটা পেলেই...।'

মন্মথ গাঢ় স্বরে বলল, 'গানটা পেলে তোমার কী হবে জানি না, তবে যতদূর মনে করতে পারছি, গানটা ছিল আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ।'

আমি হেসে বললাম, 'মায়ার খেলা। ব্যস আর লাগবে না। অনেক ধন্যবাদ। স্যার সবদিক ঠিকঠাক থাকলে কালই কাজ হয়ে যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আজ ছাড়ি।'

মন্মথ আবার খানিকটা বিরতি নিল। বলল, 'সাগর, তোমার কথা শুনলাম, কিন্তু তুমি তো আমার জরুরি কথাটা শুনলে না! জীবনে এই প্রথম যাকে কাজ দিয়েছি, তার হুকুম মতো চলতে হচ্ছে!'

আমি বিনয়ের সঙ্গে হেসে বললাম, 'হুকুম কেন বলছেন, কন্ডিশন বলুন। বিজনেসে এরকম হয়। আপনার সঙ্গে আমার তো একটা বিজনেস ডিলই হয়েছে। আপনি টাকা দেবেন, আমি খুন করব।'

মন্মথ তালুকদার এবার দ্বিধা জড়িত গলায় বলল, 'সাগর, তোমাকে আমি যে কারণে খুঁজছিলাম সেটা হচ্ছে...যে কাজটা তোমাকে দিয়েছিলাম সেটা আপাতত থাক।'

'থাক মানে! হত্যাকাণ্ড বাদ?' আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

মন্মথ বেশ দৃঢ় গলায় বলল, 'আপাতত তোমায় কিছু করতে হবে না। মিউজিক্যাল পার্কটা নিয়ে আমি কিছুদিন ব্যস্ত থাকতে চাই। আমার ধারণা "বিউটিফুল" কোম্পানি যতগুলো কাজ করেছে, এটা তার মধ্যে সেরা হতে চলেছে। আমি দেশে এবং দেশের বাইরে এই

BanglaBook.org

বাগান করবার জন্য বহু অর্ডার পাব। আমার ব্যবসার এটা একটা বড় টার্নিং পয়েন্ট হতে চলেছে। এইসময় অন্য কোনো ঝামেলার মধ্যে ঢুকতে চাইছি না।'

আমি থমকে থেকে বললাম, 'প্রজেক্টটা সাকসেসফুল হবে, এই বিষয়ে আপনি এত নিশ্চিন্ত হচ্ছেন কী করে? হয়তো দেখবেন, অভ্র কাজটা ঠিকমতো করতে পারেনি। ফুলগুলো ভাল নয়, গানগুলো মানাচ্ছে না। আপনি তো এখনো দেখেননি।'

মন্মথ একটু হাসল মনে হয়। বলল, 'না দেখিনি, তবে আমি জানি। সাগর...।'

বাকিটা শুনতে পেলাম না। ফোনটাও কেটে গেল। ফুটপাথের ফোন। এরকম তো হবেই। সে সব কথা শুনতে দেবে না।

আমার কাজ কি শেষ? না, শেষ নয়। সাগরের কাজ শেষ হলে চলবে কী করে? পরের ফোনটা করলাম অভ্রকে। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল গানটার কথা ওকে জানালাম। কাল সংগীত উদ্যান উদ্‌বোধনের পরে সবাই মিলে যখন বাগান ঘুরে দেখবে তখন গানটা বাজাতে হবে না?

গঙ্গার ঘাটে অনেকদিন বসা হয়নি। লম্বা লম্বা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম জল পর্যন্ত। আজ নদী খুব শান্ত, চুপচাপ। পাড়ে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলে যেন ফিসফিসিয়ে বলছে, আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ। সত্যি কি কেউ কাউকে হৃদয়ের কথা জিগ্যেস করে না? করে না। হৃদয় সারাটা জীবন ব্যাকুল হয়ে থাকে। ভাবে, সময় ফুরিয়ে এল। যা বলার তা তো বলা হল না।

মনফোনে রেবাকে ধরলাম।

'রেবা, একটা খুব জরুরি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।'

'কী?'

'রেবা, তুমি কি আমার হৃদয়ের কথা শুনতে চাও?'

'না, চাই না।'

'কিন্তু রেবা আমি যে বলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকি।'

'যত ব্যাকুল হয়ে থাকবে তত তুমি আমায় ভালবাসবে। বলা হয়ে গেলে ভালবাসাও ফুরিয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমি পেরেছি।'

রেবা হেসে বলল, 'কী পেরেছ? জেলে যেতে?'

আমি হেসে বললাম, 'না খুন করতে।'

রেবা আগ্রহ নিয়ে বলল, 'সত্যি?'

আমি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, সত্যি। তবে খুনটা অন্য জায়গায় করে ফেললাম। মানুষের বদলে একটা ভেঙে যাওয়া সম্পর্ককে খুন করলাম।'

রেবা খুশি খুশি গলায় বলল, 'ভাঙা সম্পর্ক জুড়েছে?'

'আগামীকাল জুড়বে। গান জুড়বে বাগানের সঙ্গে।'

রেবা অবাক হয়ে বলল, 'মানে? সে আবার কী?'

আমি বললাম, 'আছে। পরে সব বলব। এখন রাখলাম।'

ভালবাসা চিরকালই ইন্টারেস্টিং। যাবতীয় ভাবনা, চিন্তা, পরিকল্পনা উড়িয়ে দিতে পারে ফুৎকারে। সে যেমন চলে যায় নিজের মতো, ফিরে আসেও নিজের ইচ্ছেতে। মানুষ বোকার মতো ভাবে 'আমি করেছি'। আসলে ভালবাসা নিজেই সবটুকু করে নেয়। মালঞ্চমালা- মন্মথর বেলাতেও তা-ই ঘটল। ঘটল পরদিন।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেছি। অভ্রদের সংগীত উদ্যান উদ্‌বোধন হয়ে গেছে বিকেলে। উদ্যানের নাম হয়েছে 'স্বপ্ন'। মালঞ্চমালার দেওয়া নাম। অভ্র রাজি হয়েছে। অভ্র আমাকে খুব করে যেতে বলেছিল। 'যাব' বলেও যাইনি। ওখানে আমার কী কাজ? আমি যাব এয়ারপোর্ট। মেঘলা আজ বাইরে চলে যাচ্ছে। ওকে বিদায় জানাতে যাব। ভাত ডালের হোটেল থেকে একটা কাগজের টুকরো দিয়ে গেল। তমালের চিঠি। জড়ানো হাতের লেখায় বেশ কয়েক লাইন লিখেছে। গাধাটা এতটা বাংলা লিখতে পারে—

'তুই কোথায়? পাগলের মতো খুঁজছি। মন্মথ বলল, তুই নাকি ভিখিরিদের কোন ঝুপড়িতে পড়ে আছিস? এই সব পাগলামি এবার তোর বন্ধ হবে। যাইহোক, তোকে অভিনন্দন। ধন্যবাদও। আমার মুখ রেখেছিস। আমি জানতাম কাজটা তুই পারবি। ঠিক মাথা খাটিয়ে একটা কিছু বের করবি। বউ রাগ করে চলে যাওয়ার পর মন্মথ কিছুতেই তাকে ম্যানেজ করতে পারছিল না। কী করলে মালঞ্চমালার মন ফিরে পাওয়া যাবে ভেবে বেচারির রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছিল।

গানের ফাংশন, সিডি কোনো কিছুকেই মালঞ্চমালা পাত্তা দিচ্ছিল না। বলছিল, এতবছর আমার স্বপ্ন নিয়ে ভাবোনি, এবার আমি আমার নিজেরটা বুঝে নেব। মন্মথ কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার কাছে আসে। আমি তখন তোর নাম বলি। বলি, এই ছেলে ঠিক একটা পথ বের করে দেবে। তবে ওকে সরাসরি বললে হবে না। ও সরাসরি চলবার মানুষ নয়, ওকে অন্যভাবে বলতে হবে। বানিয়ে। সেইসব ভেবে তোকে মালঞ্চমালাকে খুনের গল্পটা বলা হয়। অন্য কেউ হলে পাগল আর ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দিত। তুই নিজে পাগল আর ছেলেমানুষ বলে রাজি হয়েছিস। আমরা জানি, সেদিন থেকেই তুই দুজনের ভালবাসা ফিরিয়ে আনবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলি। তুই কি জানিস, আজ বিকেলে সংগীত উদ্যানে মন্মথ আর মালঞ্চমালা পাশাপাশি হেঁটেছে। বোকা বোকা শোনাচ্ছে? ভালবাসা ব্যাপারটাই তো বোকা বোকা। তা-ই না? মালঞ্চমালা যখন অভ্রর মুখে জানতে পারে এই প্রজেক্টের পিছনে তার স্বামী রয়েছে সে নাকি বেশ খানিকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। যাইহোক, তোর রেমুনারেশন মন্মথ রেডি করে রেখেছে। অতগুলো টাকা ফেলে রাখিস না। যদিও আমি জানি তুই টাকা নিতে কোনোদিনই আসবি না। আমি তোকে চিনি। তবু বলব...থাক বলব না।'

আমি এয়ারপোর্টের বাইরে। মেঘলা এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তার এক হাতে চাকা লাগানো ঢাউস সুটকেস। অন্য হাতে একটা ঝলমলে প্যাকেট। প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন ধরুন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এটা কী মেঘলা?'

মেঘলা হেসে বলল, 'আপনার স্বপ্নযন্ত্র।'

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ।' তবে আমার আর যন্ত্র লাগবে না মেঘলা। এখন আমার মনে হচ্ছে, স্বপ্ন ধরে রাখবার যন্ত্র সকলের মধ্যেই থাকে। কেউ জানতে পারে, কেউ পারে না। আমি যেমন এখন জানতে পেরেছি। বাইরে থেকে যন্ত্র নিয়ে লাভ কী?

ভেবেছিলাম মেঘলা আমার কথা শুনে দুঃখ পাবে। বেচারি এত কষ্ট করে স্বপ্নযন্ত্রটা বানিয়েছে, তবু আমি নিলাম না। কষ্ট পাওয়ারই কথা।

BanglaBook.org

কষ্ট পাওয়ার বদলে মেঘলা আরো সুন্দর করে হাসল। বলল, 'আমি জানতাম সাগরদা। আমি জানতাম স্বপ্ন দেখতে আপনার যন্ত্র লাগবে না। আপনি তো শুধু নিজে স্বপ্ন দেখেন না, অন্যকেও দেখান, হাজার চেষ্টা করলেও কোনো বিজ্ঞানী স্বপ্নযন্ত্র বানাতে পারবে না। সেইজন্যই তো স্বপ্ন এত সুন্দর। তা-ই না? আমি কোনো যন্ত্র বানাইওনি, এই প্যাকেটে আপনার জন্য একটা উপহার এনেছি।'

আমি এক মুখ হেসে বললাম, 'খুব খুশি হলাম।'

মেঘলা হাসিমুখেই চোখ মুছল। মেয়েদের নিয়ে এই এক সমস্যা। তারা আনন্দের সময়েও চোখ মোছে। আমি বললাম, 'কী হয়েছে মেঘলা? তুমি কাঁদছ কেন?'

'কিচ্ছু হয়নি। আমার একটা শর্ত কিন্তু মানতে হবে সাগরদা।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'কী শর্ত?'

মেঘলা আমার হাত স্পর্শ করে গাঢ় স্বরে বলল, 'আমি যাওয়ার আগে এই প্যাকেট খুলবেন না। প্লিজ। এটা আমার খুব গোপন উপহার।' একটু থামল মেঘলা। তারপর আমার দিকে এক পা এগিয়ে এসে গাঢ় স্বরে বলল, 'এবার যাই? বাবা-মা অপেক্ষা করছেন।'

মেঘলার উপহার নিয়ে আমি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। এই প্যাকেট আমি কোনোদিনই খুলব না। মাঝেমধ্যে শুধু কল্পনা করব কী আছে। গোপন উপহার গোপন থাকাই ভাল। তা-ই না?

সমাপ্ত

এই কাহিনী লেখার সময় যেসব বইয়ের সাহায্য পেয়েছি—

স্বপ্ন—গিরিন্দ্রশেখর বসু

পাভলভ পরিচিত—ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি

গীতবিতান, সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎস মানুষ

The Small Garden—John Brookes (Cavendish house)

Society, Crime and Criminal Carees—Don. C. Gibbons.

সাগর একজন অলস, বেকার যুবক। তবু সমস্যায় পড়লে সবাই তাকে খোঁজে। অদ্ভুত সমস্যা সমাধানে তার জুড়ি নেই। কিন্তু এবার সাগর পড়েছে মহাবিপদে। খুন আর প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়েছে। কিভাবে উদ্ধার পাবে?